এডওয়ার্ড স্নোডেন
পার্মানেন্ট রেকর্ড
The New York Times
BESTSELLERS
রূপান্তর
মাহজাবিন খান

এডওয়ার্ড স্নোডেনের জন্ম নর্থ ক্যারোলিনার এলিজাবেথ শহরে। তিনি বেড়ে ওঠেন ফোর্টমিডে। সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সিআইএ'র অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এনএসএ'তে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। জনসেবায় রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড, জার্মান হুইসেলব্লোয়ার প্রাইজ, সত্যবাদিতার জন্য রাইডেন আওয়ার প্রাইজ ও ইন্টারন্যাশনাল লিগ অভ হিউম্যান রাইটস থেকে কার্ল ভন ওসিয়েজকি মেডেলসহ অনেক সম্মাননা অর্জন করছেন। বর্তমানে তিনি ফ্রিডম অব দ্য প্রেস ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন।

এডওয়ার্ড স্নোডেনের

পার্মানেন্ট রেকর্ড

রূপান্তর : মাহজাবিন খান

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

এডওয়ার্ড স্নোডেনের

পার্মানেন্ট রেকর্ড

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০২০

২য় সংস্করণ : বইমেলা ২০২১

প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com/projonmo

amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Permanent Record by Edward Snowden, Translated by Mahjabin Khan,
Published by Projonmo Publication

Price : 350 Taka
International Price : $21.00 USD
ISBN: 978-984-94393-0-1

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়

২য় অধ্যায়

৩য় অধ্যায়

ভূমিকা

আমার নাম এডওয়ার্ড জোসেফ স্নোডেন। আমি এক সময় সরকারের জন্য কাজ করতাম। কিন্তু এখন জনগণের জন্য কাজ করি। আমার প্রায় তিন দশক সময় লেগে যায় একটি পার্থক্যকে স্বীকার করতে। যখন তা বুঝতে পারলাম তখন এটি কর্মজীবনে আমাকে কিছুটা বিপাকে ফেলে দেয়। আমি এখন আমার সময়টুকু জনসাধারণকে রক্ষা করার কাজে ব্যয় করছি তাদের হাত থেকে যা একসময় আমার পরিচয় ছিল–সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (এনএসএ)'র একজন গুপ্তচর ও তরুণ প্রযুক্তিবিদ, যে সুন্দর একটি পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে বলে একসময় আমি ভাবতাম।

আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি (আইসি)-তে আমার ক্যারিয়ার মাত্র সাত বছর স্থায়ী হয়েছিল। আমি ভেবে অবাক হই যে, এই সময়টা একটি দেশে আমার নির্বাসন জীবনের চেয়ে মাত্র এক বছর বেশি। যে নির্বাসিত জীবন আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিনি। এই সাত বছরের সময়কালে আমি আমেরিকান গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে অংশ নিয়েছি। যে পরিবর্তন ছিল নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি করা থেকে সমগ্র জনতার ওপর গণনজরদারি। আমি বিশ্বের সমস্ত ডিজিটাল যোগাযোগ সংগ্রহ করা, যুগের পর যুগ সেগুলো সংরক্ষণ করা এবং ইচ্ছামতো সেগুলোর মাধ্যমে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করাকে প্রযুক্তিগতভাবে সহজ করার জন্য সরকারকে সহায়তা করেছি।

৯/১১ এর পর আমেরিকার সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় আইসি'র মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছিল। পার্ল হারবারের ঘটনার পর ৯/১১ এর ঘটনা ছিল আমেরিকাতে হওয়া সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ঘটনা। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমেরিকার নেতৃবর্গ এমন একটি ব্যবস্থা তৈরির চেষ্টা করছিল, যা পুনরায় তাদের নিরাপত্তার ওপর আঘাত আসা থেকে রক্ষা করবে। এর ভিত্তি হবে প্রযুক্তি। যা তাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মেজর ও ব্যবসায় প্রশাসনে মাস্টার্স করা সেনাবাহিনীর জন্য ছিল ব্যতিক্রম এক বিষয়। সবচেয়ে গোপনীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর দরজা আমার মতো তরুণ প্রযুক্তিবিদদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। কম্পিউটারে অভিজ্ঞরা পৃথিবীকে তাদের অধিকারে নিয়ে নিল।

তখন আমাকে যদি কোনো বিষয়ে পারদর্শী বলা হয় তবে তা ছিল কম্পিউটার। তাই আমি দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছি। ২২ বছর বয়সে এনএসএ'র সাংগঠনিক তালিকার সর্বনিম্ন একটি পদের জন্য আমার প্রথম

গোয়েন্দা ছাড়পত্র পাই। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সিআইএ-তে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগ দিই। এর ফলে পৃথিবীর সবচেয়ে সংবেদনশীল নেটওয়ার্কে ব্যাপক প্রবেশাধিকার পেয়ে যাই। সেখানে আমার সহকর্মী একমাত্র বয়স্ক কর্মকর্তা ব্যক্তিটি তার কাজের সময়টা ব্যয় করতেন রবার্ট লডলাম ও টম ক্লান্সির বই পড়ে।

প্রযুক্তিগত মেধার খোঁজ করতে গিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের নিজস্ব নিয়ম ভঙ্গ করেছিল। তারা সাধারণত স্নাতক ডিগ্রি ব্যতীত কাউকে নিয়োগ দিত না। কমপক্ষে তাদের সাথে সম্পৃক্ততা থাকতে হতো। আমার এসবের কোনোটাই ছিল না। সে অনুযায়ী, আমার সেই বিল্ডিং-এ প্রবেশ করতে পারারই কথা না।

২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত আমি জেনেভায় মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত ছিলাম। সেখানে আমাকে মার্কিন কূটনৈতিক কার্যক্রমের আড়ালে বিশেষ প্রযুক্তিবিদ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আমার দায়িত্ব ছিল ভবিষ্যতে সিআইএ এবং এর ইউরোপিয়ান ঘাঁটিগুলোকে কম্পিউটারের মাধ্যমে একটি যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসা এবং নেটওয়ার্ককে ডিজিটালাইজড ও স্বয়ংক্রিয় করা। এর মাধ্যমে মার্কিন সরকার নজরদারি চালাত। আমাদের দল গোয়েন্দা নজরদারিতে নতুনত্ব আনার চেয়েও বেশি কিছু করেছে। আমরা নজরদারির ধারণাকেই সম্পূর্ণভাবে পাল্টে ফেললাম। আমাদের জন্য এটি গোপন সভা বা ডেড ড্রপ ছিল না। আমাদের কাজ ছিল তথ্য নিয়ে।

ছাব্বিশ বছর বয়সে আমি ডেল-এর নামমাত্র কর্মচারী হিসেবে যোগ দিই। তবে পুনরায় এনএসএ'র সাথে কাজ করা শুরু করি। চুক্তির আড়ালে কাজ করতাম। আমার মতো প্রায় সব প্রযুক্তিপ্রবণ গুপ্তচররা এভাবেই চুক্তির আড়ালে কাজ করত।

সংস্থাটির গ্লোবাল ব্যাকআপ-এর নকশা তৈরি করতে সাহায্য করার জন্য আমাকে জাপানে পাঠানো হয়। এটি একটি বিশাল গোপনীয় নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কটি নিশ্চিত করে, এনএসএ'র সদর দপ্তর পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে ভস্ম হয়ে গেলেও কোনো তথ্য এ থেকে হারাবে না। তখনও আমি বুঝতে পারিনি যে, সবার ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য চিরকাল সংগ্রহে রাখে বা পার্মানেন্ট রেকর্ড রাখে এমন একটি সিস্টেম চালু করা ছিল দুঃখজনক এক ভুল।

আঠাশ বছর বয়সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসি। সিআইএ ও ডেল-এর সম্পর্ক পরিচালনার জন্য ডেল-এর প্রযুক্তিগত যোগাযোগ দলের একটি শাখায় পদোন্নতি লাভ করি। আমার কাজ ছিল সিআইএ কল্পনাও করতে পারে না এমন সব সমস্যার সমাধান ডিজাইন করা ও বিক্রয় করার জন্য সিআইএ'র প্রযুক্তি বিভাগের প্রধানদের সাথে আলোচনা করা। আমার দল সংস্থাটিকে নতুন ধরনের কম্পিউটিং আর্কিটেকচার-'ক্লাউড' তৈরি করতে সহায়তা করেছিল।

এটি হলো প্রথম এমন প্রযুক্তি যার ফলে প্রত্যেক গোয়েন্দা শারীরিকভাবে যেখানেই বা যে দূরত্বেই থাকুক না কেন প্রয়োজনীয় যেকোনো ডাটা একসেস করতে এবং অনুসন্ধান করতে সক্ষম ছিল।

সংক্ষেপে যদি বলি, চলমান গোয়েন্দা নজরদারি পরিচালনা ও যুক্ত করার কাজ চিরকাল সেই নজরদারি কীভাবে বজায় রাখা যায় তার উপায় বাতলে দেয়। এটি ফলস্বরূপ, এমন কাজের দিকে নিয়ে যায় যা নিশ্চিত করে এটি সবার জন্য সহজলভ্য ও অনুসন্ধানযোগ্য। এসব প্রজেক্ট হাওয়াইতে আমার নজরে আসে। তখন উনত্রিশ বছর বয়সি আমি এনএসএ'র সাথে নতুন চুক্তি অনুযায়ী কাজ করতে সেখানে যাই। ততদিন পর্যন্ত আমাকে দেয়া বিশেষ, পৃথক কাজের পেছনের অতিরিক্ত উদ্দেশ্য জানার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

ভাগ্যে লেখা ছিল বলে আমি অবশেষে আমার সমস্ত কাজ কীভাবে একত্রিত হয় তা দেখতে পেলাম। এক বিশাল মেশিনের গিয়ার এর মতো সমন্বিত হয়ে তা বিশ্বব্যাপী গণনজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলল।

আনারস বাগানের নিচে একটি সুড়ঙ্গের গভীরে–'পার্ল হারবার' যুগের একটি পুরনো ভূগর্ভস্থ বিমান কারখানার টার্মিনাল। সত্যিই আমি যেখানে বসে পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ, নারী, শিশু যারা কখনো না কখনো ফোন ডায়াল করেছে বা কম্পিউটার ব্যবহার করেছে, তাদের আদানপ্রদানকৃত অগণিত তথ্যে প্রবেশ করতে পারতাম। এর মধ্যে ৩২০ মিলিয়ন (৩২ কোটি) আমেরিকান নাগরিক ছিল, যারা তাদের প্রতিদিনের জীবনে সমানতালে নজরদারির মধ্যে ছিল। এটি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনই নয় বরং যেকোনো স্বাধীন সমাজের মূল্যবোধেরও লঙ্ঘন।

আপনারা এই বইটি পড়ছেন কারণ আমি এমন একটি কাজ করেছিলাম যা আমার জায়গায় থাকা কেউ ভাবতে পারত না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সত্য বলার। আমি আইসি (IC)'র গোপন কিছু ডকুমেন্ট সংগ্রহ করি যা মার্কিন সরকার কর্তৃক আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ বহন করে। আমি সেসব ডকুমেন্টস সাংবাদিকদের হাতে তুলে দিই। তারা এসব তদন্ত করে এই সত্য বিশ্বের কাছে প্রকাশ করে।

যেসব বিষয়, যেসব নৈতিক, আদর্শিক মূল্যবোধ আমাকে এ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল এবং এর পরিণামে কী হয়েছিল সেসব কথা নিয়েই এ বই। অর্থাৎ বইটি আমার জীবনের কথাও বলবে।

কী নিয়ে গড়ে ওঠে এই জীবন? জীবন হলো আমরা যা বলি, যা করি তার চেয়েও বেশি কিছু। আমরা যা ভালোবাসি, যা বিশ্বাস করি সেটা নিয়েও এই জীবন। আমি যা ভালোবাসি এবং যা বিশ্বাস করি তা হলো যোগাযোগ। মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক যোগাযোগ। আমি ভালোবাসি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে

যোগাযোগ গড়ে ওঠে। বই অবশ্যই এরকম একটি প্রযুক্তি। কিন্তু আমার প্রজন্মের কাছে যোগাযোগ মানেই ইন্টারনেট।

যে বিষাক্ত উন্মাদনা আমাদের সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা আপনারা উন্মোচন করার আগেই বলে রাখি, যখন থেকে আমি বুঝতে শিখি তখন থেকেই আমার জন্য ইন্টারনেট ছিল একেবারেই ভিন্ন কিছু। এটি ছিল আমার বন্ধু, আমার অভিভাবক। এটি একটি সীমানাবিহীন, এক বা বহু ভাষা, বহু জাতি নিয়ে গঠিত সাধারণ একটি সমাজ যা বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠেছিল। সবাই নিজেদের পরিচয়, ইতিহাস, রীতিনীতির ব্যাপারে ছিল স্বাধীন। প্রত্যেকেই ছিল মুখোশের অন্তরালে। তবু এই গোপন ও ছদ্মনামের সংস্কৃতি মিথ্যার চেয়েও বেশি সত্য জন্ম দিয়েছিল। কারণ এটি বাণিজ্যিক ও প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। এটি ছিল সৃজনশীল ও সহযোগিতামূলক। দ্বন্দ্ব অবশ্যই ছিল তবে তা পরাজিত হয়েছিল সদিচ্ছা, সততা ও সঠিক দিক-নির্দেশনার চেতনার মাধ্যমে।

আমি যদি বলি আজকের ইন্টারনেট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তখন আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন। লক্ষ্য করলে দেখবেন, এ পরিবর্তন সুবিধাপ্রাপ্ত কিছু মানুষের সচেতন পছন্দ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টার ফল। বাণিজ্যকে ই-বাণিজ্যে রূপান্তর করার তাড়াহুড়ো একটি শূন্যতার দিকে নিয়ে যায়। এই সহস্রাব্দে এসে তাতে ধস নামে। তারপর কোম্পানিগুলো বুঝতে পারে অনলাইনে সময় কাটানো মানুষজন অর্থব্যয় করার চেয়ে কোনো কিছু শেয়ার করায় বেশি আগ্রহী। তারা বুঝতে পারে ইন্টারনেট মানুষের মধ্যে যে সংযোগ তৈরি করেছে তা অর্থমূল্যে পরিণত করা যেতে পারে। মানুষ অনলাইনে যা করতে চায় সে তথ্য যদি তাদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, অপরিচিতদের জানায় এবং তাদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, অপরিচিতরা কী করছে তা জানতে পারে তাহলে এই তথ্য বিনিময় থেকে কীভাবে মুনাফা অর্জন করা যায় কোম্পানিগুলোকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

এটা ছিল নজরদারি পুঁজিবাদের শুরু এবং সেই ইন্টারনেটের সমাপ্তি যে ইন্টারনেটকে আমি জানতাম। ক্রিয়েটিভ ওয়েভ ভেঙে পড়েছিল যেহেতু অসংখ্য সুন্দর, জটিল ও ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট বন্ধ ছিল। বিভিন্ন সুবিধার প্রতিশ্রুতি পেয়ে লোকজন তাদের ব্যক্তিগত সাইটগুলো বিক্রয় করা শুরু করে যেগুলোর জন্য দরকার ছিল ফেসবুক পেইজ ও জিমেইল একাউন্টের নিয়মিত এবং নিরাপদ সংরক্ষণ। মালিকানার ব্যাপারটা বাস্তবতার চেয়ে ভিন্ন যা আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই বুঝতে পেরেছে। আমরা যা কিছুই শেয়ার করব তা আর আমাদের কাছে থাকবে না। যেসব ই-কমার্স কোম্পানি কেনাকাটায় আমাদের অনাগ্রহের কারণে ব্যর্থ হয়েছিল, তারা এখন বিক্রয়ের জন্য নতুন পণ্য খুঁজে পেল।

সেই পণ্য ছিলাম 'আমরা'।

আমাদের চাহিদা, কাজ, অবস্থান, ইচ্ছা–সবকিছু যা আমরা জেনে কিংবা না জেনে প্রকাশ করেছি তা গোপনে নজরদারি ও বিক্রি করা হচ্ছিল। যাতে তারা আমাদের কোনো অন্যায় অগ্রাহ্য করার অনিবার্য চিন্তাকে রুখে দিতে পারে। যা আমাদের জন্য সামনে অপেক্ষা করছিল। এ নজরদারি সক্রিয়ভাবে সরকারের লোভী বাহিনী দ্বারা উৎসাহিত ও অর্থায়ন করা হয় যাতে তারা প্রচুর পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

বিশ শতকের প্রথমদিকে লগইন ও আর্থিক লেনদেন ছাড়া এমন অনলাইন যোগাযোগ খুব কমই ছিল যা থেকে তথ্য নেয়া হতো না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোম্পানির গ্রাহকদের তথ্য জানার জন্য সরকার কোম্পানির কাছে যাওয়ারও প্রয়োজন মনে করত না। তারা কাউকে না জানিয়েই নজরদারি করত।

আমেরিকান সরকার তাদের সংবিধানকে উপেক্ষা করে স্পষ্টতই এ প্রলোভনে অংশ নেয়। তারা এ বিষাক্ত গাছের ফল খাওয়া শুরু করার পর খুব বাজেরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়।

গোপনে গণনজরদারির ক্ষমতা ব্যবহার করতে থাকে এমন এক কর্তৃপক্ষ যারা মূলত অপরাধীর চেয়ে নির্দোষকেই বিপদে ফেলে দিত। তখনই আমি এ নজরদারির ক্ষতিকর দিক বুঝতে পারলাম। আমরা একটি দেশ বা পৃথিবীর মানুষ এই প্রক্রিয়ার সমর্থনে কোনো ভোট বা কোনো মতামত দেয়ার সুযোগ পাইনি এই বিষয়টি ভাবতেই ভয় হলো। প্রায় সার্বজনীন নজরদারির এই ব্যবস্থাটি শুধু আমাদের মতামত ছাড়াই তৈরি হয়নি বরং এটি জেনেশুনে আমাদের থেকে এমনকি আইন প্রণেতাদের থেকেও এর প্রতিটি কাজ গোপন করেছিল।

আমি কার কাছে যাব? কাকে বলব? সত্যটা চুপিচুপি বলতে গেলে, এমনকি একজন আইনজীবী, একজন বিচারক বা কংগ্রেসের কাছে সঠিক তথ্য দেয়াও গুরুতর অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। যার কারণে কেন্দ্রীয় কারাগারে আজীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

আমার বিবেকের সাথে লড়াই করতে গিয়ে আমি হারিয়ে গেলাম গভীর অন্ধকারে। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এবং জনগণের সেবায় বিশ্বাস করি। আমার পরিবার, আমার বংশে সেসব নারী-পুরুষ ছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী যারা দেশ ও নাগরিকের সেবা করেছেন।

আমি কোনো সংস্থা, কোনো সরকারকে সেবা দেয়ার শপথ করিনি। আমি সংবিধানের প্রতি সমর্থন ও এর প্রতিরক্ষার জন্য জনগণকে সেবা দেয়ার শপথ করেছি যাদের নাগরিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম সেই স্বাধীনতা অবমাননার সাথে জড়িত অবস্থায়। এতটা বছর আমি কার জন্য তাহলে এত কাজ করলাম? যেসব সংস্থা আমাকে নিয়োগ দিয়েছিল তাদের সাথে করা গোপন চুক্তি এবং দেশের সংবিধানের

প্রতি আমার শপথের মধ্যে আমি কীভাবে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারি? কার বা কিসের প্রতি আমার অধিক আনুগত্য থাকা উচিত? কোন ক্ষেত্রে আমি নৈতিকভাবে আইন অমান্য করতে বাধ্য?

এই নীতিগুলো নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে আমি আমার উত্তর খুঁজে পাই। আমি বুঝতে পারলাম সাংবাদিকদের কাছে আমার দেশের সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা ফাঁস করা সরকার বা আইসি'র জন্য ধ্বংসাত্মক কোনো কিছু ডেকে আনবে না। এটি সরকার ও আইসিকে তাদের নিজের আদর্শের দিকে ফিরিয়ে আনবে।

একটি দেশের স্বাধীনতা কেবল তার নাগরিকদের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতেই পরিমাপ করা যেতে পারে। আমার বিশ্বাস এই অধিকারসমূহ আসলে রাষ্ট্রক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে দেয় যে ঠিক কোথায় এবং কখন কোনো সরকার কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আমেরিকান রিভল্যুশনে এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে 'স্বাধীনতা' বলা হয়েছে। ইন্টারনেট বিপ্লবের সময় একে বলা হয় 'গোপনীয়তা'।

ছয় বছর হয়ে গেছে আমি সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি। কারণ আমি বিশ্বজুড়ে তথাকথিত উন্নত সরকারদের জনগণের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করতে দেখেছি। এই গোপনীয়তাকে আমি এবং জাতিসংঘ মৌলিক মানবাধিকার বলে বিবেচনা করি। বিগত এই কয়েক বছরে যেহেতু গণতন্ত্র কর্তৃত্ববাদী অপশাসনে ফিরে যাচ্ছে তাই এই অধঃপতন অব্যাহত রয়েছে। গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের আচরণের চেয়ে আর কোথাও এই নিপীড়ন প্রকটভাবে দেখা যায় না।

জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সাংবাদিকতাকে বেআইনি করার যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তা সত্যের আদর্শের ওপর পূর্ণ আক্রমণে সহায়তা করেছে জেনেশুনে সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে সেসব প্রযুক্তির মাধ্যমে যা পৃথিবীব্যাপী নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

আমি এ বিষয়টিকে খুব কাছে থেকেই জানি। কারণ অবাস্তব বিষয়ের অবতারণা করা Intelligence Comnunity (IC) এর এক গোপন প্রতিভা। আমার পুরো কর্মজীবনে দেখেছি এই সংস্থাগুলো কীভাবে গোয়েন্দাগিরিকে ব্যবহার করে যুদ্ধ উস্কে দিত এবং অবৈধ নীতিমালা ব্যবহার করত। তারা ছায়া বিচারবিভাগ তৈরি করে কিডন্যাপিং করাকে 'বিশেষ হস্তান্তর', নির্যাতনকে 'অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ', গণনজরদারিকে 'জরুরি তথ্য সংগ্রহ' নাম দিয়ে অনুমোদন দেয়। তারা আমাকে বলত চাইনিজ ডাবল এজেন্ট, রাশিয়ান ট্রিপল এজেন্ট। তারা আমাকে বলত মিলেনিয়াল। মিলেনিয়াল বলতে জেনারেশন 'Y' কে বোঝায়। এই জেনারেশনের জন্ম ১৯৮১-১৯৯১ এর মধ্যে। যারা ব্যক্তিগত কম্পিউটার, ভিডিও গেমস, সেল ফোনের সাথে বেড়ে উঠেছে।

এত নির্দ্বিধায় এতকিছু আমাকে বলতে পেরেছিল কারণ আমি নিজের পক্ষে কোনো কথা বলিনি। যে মুহূর্তে আমি বর্তমান অবস্থার দিকে এগিয়ে এসেছি, আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি কথা প্রকাশ না করার ব্যাপারে অটল থেকেছি। যা হয়তো আমার পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য ঝামেলা তৈরি করতে পারে। তারা ইতোমধ্যে আমার নীতির জন্য ভোগান্তির শিকার।

সেই দুর্ভোগ বাড়তে পারে এই চিন্তায় আমি বইটি লিখতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। সরকারের অন্যায়ের প্রমাণসহ সামনে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত, এ বইয়ে নিজের জীবনের বর্ণনা দেওয়ার সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশি সহজ ছিল। আমি যেসব অন্যায় প্রত্যক্ষ করেছি সেগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কেউই বিবেককে এড়িয়ে নিজের জীবনের স্মৃতিচারণা লেখে না। এ কারণেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য, বন্ধু এবং সহকর্মীর অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করেছি যাদের নাম এ বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি।

আমি অন্যের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করি। আমার দেশের গোপনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে কোনটি জনসাধারণকে জানানো উচিত এবং কোনটি উচিত নয় তা আমি একা সিদ্ধান্ত নিতে চাইনি। সে কারণেই আমি সরকারের ডকুমেন্টস কেবল সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করেছি। মূলত, সরাসরি জনগণের কাছে আমার প্রকাশিত ডকুমেন্টের সংখ্যা শূন্য।

সাংবাদিকদের মতো আমিও বিশ্বাস করি, একটি সরকার কিছু তথ্য গোপন রাখতে পারে। এমনকি বিশ্বের সর্বাধিক স্বচ্ছ গণতন্ত্রও কিছু বিষয় গোপন রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের ছদ্মবেশী গোয়েন্দাদের পরিচয় এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের সেনাবাহিনীর গতিবিধি। এ বইটিতে এমন কোনো গোপন বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।

আমার জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমার প্রিয়জনের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং বৈধ সরকারি গোপনীয়তা প্রকাশ না করা সহজ কোনো কাজ নয়। কিন্তু এ কাজটি আমি করেছি। এ দুই দায়িত্বের মধ্যেই আপনারা আমাকে খুঁজে পাবেন।

জানালার ওপাশে

আমি জীবনে প্রথম যে জিনিস হ্যাক করি সেটা হলো–ঘুমের সময়। আমার বাবা-মা নিজেরা ঘুমানোর আগে, এমনকি আমার বোন ঘুমানোর আগে আমাকে জোর করে ঘুমাতে পাঠাতেন। আমার চোখে ঘুম আসত না। আমার কাছে তা খুব অন্যায় মনে হতো। জীবনের প্রথম ছোট্ট অন্যায়। কান্নাকাটি, কাতর আবেদন, জেদ এসব অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে আমার জীবনের প্রথম দুই হাজার রাত কেটেছে। ২,১৯৩তম রাতে আমি ছয় বছর বয়সে প্রবেশ করলাম। আমি যেন নিজের ইচ্ছামতো চলার সুযোগ পেয়ে গেলাম। বড়রা আমাকে বাধা দিল না বা বুঝানোর দরকারও মনে করল না। উৎসব, বন্ধু, উপহার এসবের ভিড়ে সেটি ছিল আমার ছোট্টবেলার সবচেয়ে সেরা দিন। সবাই নিজেদের বাসায় ফিরে গিয়ে আমার সেই আনন্দ মাটি করে দিক সেটা আমার ইচ্ছে ছিল না। তাই গোপনে বাসার সব ঘড়ির সময় বদলে দিলাম।

বিষয়টা কেউ খেয়াল করেনি। হুট করে এতো স্বাধীনতা পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ঘোড়ার মতো লিভিং রুমের চারদিকে দৌড়াচ্ছিলাম। আমি যেন মুক্ত, স্বাধীন। আমি যেন সময়ের রাজা। যাকে কেউ আর তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পাঠাবে না। অবশেষে মধ্যগ্রীষ্মের সবচেয়ে দীর্ঘতম দিন ২১ জুনের সূর্যাস্ত দেখে কখন যেন মেঝেতে ঘুমিয়ে গেলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন বাসার ঘড়িগুলো আবারও বাবার ঘড়ির সময়ের সাথে চলছিল।

***

যদি আজকাল কেউ ঘড়িতে সময় সেট করতে চায় তাহলে সে কীভাবে সেট করবে? আপনি স্বাভাবিকভাবেই বেশিরভাগ মানুষের মতোই আপনার স্মার্টফোনে সময় সেট করবেন। কিন্তু আপনি নিজের ফোনের দিকে তাকান। সত্যিই তাকান। গভীরভাবে এর সেটিংস দেখুন। দেখবেন তা নিজে নিজেই সেট হয়ে আছে। নীরবে আপনার ফোনটি আপনাকে সেবাদানকারী নেটওয়ার্ককে জিজ্ঞেস করে, 'এই, এখন কটা বাজে?' সেই নেটওয়ার্ক একটি বড় নেটওয়ার্ককে জিজ্ঞেস করে। সেটা আরো বড় নেটওয়ার্ককে জিজ্ঞেস করে। তারপর টাওয়ার এবং বৈদ্যুতিক তার হয়ে সেই প্রশ্ন সময়ের প্রকৃত নিয়ন্ত্রকদের কাছে পৌঁছে। একটি নেটওয়ার্ক টাইম সার্ভার পরিচালিত হয় পারমাণবিক ঘড়ি দ্বারা যা আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস

এন্ড টেকনোলজি', সুইজারল্যান্ডের 'দ্য ফেডারেল অব মেটেরলজি এন্ড ক্লাইমেটোলজি' এবং জাপানের 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন্স টেকনোলজি'তে রাখা আছে। মুহূর্তের মধ্যেই এই দীর্ঘ অদৃশ্য যাত্রা ঘটে। তাই কখনোই আপনার ফোনের স্ক্রিনে এই সূক্ষ্ম কাজগুলো আপনার চোখে পড়ে না।

আমার জন্ম ১৯৮৩ সালে। সেই সময়টায় আমার জন্ম যখন মানুষ সময়কে নিজের অধিকারে নিয়ে নেয়। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ নিজেদের কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাকে দুইভাগে ভাগ করে নেয়। একটি হলো মিলনেট। এটি তাদের প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য। অন্যটি সাধারণ মানুষের জন্য। যার নাম ইন্টারনেট। ওই বছর শেষ হওয়ার আগেই নতুন নিয়ম করে ভার্চুয়াল জগতের সীমানা নির্ধারণ করা হয়। নতুন ডোমেইন সিস্টেম গড়ে ওঠে- the.gov, .mil, .edu, .com যা আমরা আজও ব্যবহার করি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কোড তৈরি করা হয়- .uk, .de, .fr, .cn, .ru এছাড়াও আছে আরো অনেক দেশ। আমি, আমার দেশ জোরেসোরে এই সুবিধা ভোগ করছিলাম। www উদ্ভাবিত হয় ছয় বছর পরে। আর আমার পরিবারে মডেমসহ কম্পিউটার আসে নয় বছর পরে।

অবশ্যই ইন্টারনেট কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গড়ে ওঠেনি। প্রযুক্তিগত বাস্তবতা হলো, প্রতিদিনই নিত্যনতুন অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক বিশ্বে জালের মতো গড়ে উঠছে। আপনি এবং আপনার মতো ৩০০ কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত এই নেটওয়ার্কগুলো ব্যবহার করছেন। যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪২%। ব্যাপকভাবে, বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক পৃথিবীর অধিকাংশ কম্পিউটারকে একটি আরেকটির সাথে কিছু প্রটোকল দ্বারা সংযুক্ত করে রেখেছে।

অনেকেরই প্রটোকলের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। কিন্তু আসলে আমরা এসব অনেক ব্যবহার করেছি। প্রটোকলকে মেশিনের ভাষা হিসেবে চিন্তা করুন। কিছু সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে তারা একে অপরকে বুঝতে পারে। আপনি যদি প্রায় আমার বয়সি হন তাহলে নিশ্চয় জানেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে কোনো এড্রেস লিখার শুরুতে 'http' টাইপ করতে হতো। এটিকে বলা হয় হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রটোকল। এটি হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এবং গুগল, ইউটিউব, ফেসবুকের মতো টেক্সট ও অডিও-ভিডিও সম্বলিত সাইটগুলোতে একসেস করার জন্য ব্যবহৃত ভাষা। আপনি যতবার আপনার ইমেইল চেক করেন ততবার আপনি IMAP (Internet Message Access Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) অথবা POP3 (Post Office Protocol)–এই ভাষাগুলো ব্যবহার করেন। FTP (File Transfer Protocol) এর মাধ্যমে ইন্টারনেটে ফাইল ট্রান্সফারের কাজ হয়। আপনার ফোনে সময় নির্ধারণ

প্রক্রিয়ার জন্য দরকারি আপডেট নেয়া হয় NTP (Network Time Protocol) থেকে।

এসব প্রটোকলকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন প্রটোকল। এসব প্রটোকলের উৎস হলো অগণিত অনলাইন প্রটোকলের মধ্যে একটি মাত্র প্রটোকল পরিবার। উদাহরণস্বরূপ, এসব অ্যাপ্লিকেশন প্রটোকল থেকে তথ্য ইন্টারনেট হয়ে আপনার ডেস্কটপ, ল্যাপটপ বা ফোনে আসার আগে তা একটি ট্রান্সপোর্ট প্রটোকলে তৈরি হয়। ঠিক যেভাবে পোস্ট অফিসগুলো চায় আপনি আপনার চিঠি বা পার্সেল খামে বা বক্সে করে তাদের কাছে দিবেন। TCP (Transmission Control Protocol) বিভিন্ন ওয়েব পেইজ, ইমেইল এবং আরো অনেক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে যোগাযোগ সরবরাহর কাজ করে।

UDP (User Datagram Protocol) ইন্টারনেটে টেলিযোগাযোগ এবং সরাসরি সম্প্রচার সরবরাহ করে। বহুমুখী কাজের জন্য ছিল cyberspace, the Net, the Infobahn এবং the Information Superhighway। এগুলো ছাড়া আমার শৈশব ছিল অসম্পূর্ণ। এই আধুনিক প্রটোকলগুলো পৃথিবীর যত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে, যা আমরা খাই না, পান করি না, পরিধান করি না তা অনলাইনে দেয়ার সুযোগ করে দিল। ইন্টারনেট অক্সিজেনের মতোই আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেল যার মাধ্যমে যোগাযোগ প্রবাহিত হতো। আমাদের নিশ্চয় মনে আছে, প্রতিবার আমাদের সামাজিক মিডিয়া ফিডগুলো আমাদেরকে এমন পোস্টের ব্যাপারে সতর্ক করত যা সন্দেহজনক কোনোকিছুতে আমাদেরকে ট্যাগ করে। এমন কোনো কিছু যা তথ্যকে রূপান্তর করে এমনভাবে সংরক্ষণ করে যা চিরকাল স্থায়ী হয়।

আমি আমার শৈশবের ইন্টারনেটবিহীন প্রথম নয় বছরের কথা চিন্তা করে বেশ মুগ্ধ হই। তখন জীবনের সবকিছু জমা রাখার মতো কিছুই ছিল না, নিজের স্মৃতিটুকু ছাড়া। প্রযুক্তিভিত্তিক তথ্যের কোনো অস্তিত্ব ছিল না তখন।

যখন আমি শিশু ছিলাম, তখন আমার প্রথম কথা, প্রথম পদক্ষেপ, প্রথম হারানো দাঁত, প্রথমবার সাইকেল চালানোর মতো অবিস্মরণীয় স্মৃতিগুলোর প্রযুক্তিগত কোনো বিবরণ ছিল না। বরং ছিল আবেগমাখা গভীর অনুভূতি।

আমার প্রজন্ম আমেরিকার বা হয়তো পৃথিবীর শেষ অ-আধুনিক প্রজন্ম যাদের শৈশব শুধু ইন্টারনেটকে ঘিরে ছিল না। আমাদের শৈশবকে ঘিরে ছিল হাতে লিখা ডায়েরি, পোলারয়েড ক্যামেরা, ভিএইচএস ক্যাসেট, পুরনো মূল্যবান জিনিস, যা আমরা যত্ন করে সংগ্রহ করতাম। আমার স্কুলের কাজ করতাম কাগজ, পেন্সিল, ইরেজার দিয়ে। এখনকার মতো ট্যাব দিয়ে নয়। আমি যে বাসায় বেড়ে উঠি সেই বাসার কাঠের দরজায় ছুরি দিয়ে খাঁজ কাটতাম স্মার্টফোন প্রযুক্তির মধ্যে আমার মানসিক বিকাশ থেমে ছিল না।

***

ছোট্ট এক টুকরো জমিতে ডগউড গাছের ছায়াযুক্ত লাল ইটের বিশাল বাড়িটিতে আমরা থাকতাম। গ্রীষ্মকালে সাদা ম্যাগনোলিয়া ফুল দিয়ে বাড়িটি আচ্ছাদিত থাকত। প্লাস্টিকের যে সৈন্যটার সাথে আমি গড়াগড়ি দিতাম সেটাকে এই ফুল দিয়ে লুকিয়ে রাখতাম। বাড়ির নকশাটি বেশ জটিল। এর প্রধান প্রবেশপথটি ছিল দ্বিতীয় তলায়। একটি বিশাল ইটের সিঁড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হতো। এই তলাতেই ছিল লিভিংরুম, রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং শোবার ঘর। এর উপরে ছিল ধুলোবালি, মাকড়সার জালে ভরপুর চিলেকোঠা। আমার মা আমাকে বলতেন ওখানে অনেক কাঠবিড়ালী থাকে। আর বাবা ভয় দেখিয়ে বলতেন সেখানে রক্তখেকো নেকড়েমানব আছে। কোনো ছোট বাচ্চা বোকার মতো সেখানে গেলেই তারা খেয়ে ফেলবে।

নিচতলায় ছিল একটি বেজমেন্ট যা নর্থ ক্যারোলিনার জন্য, বিশেষ করে উপকূলীয় জায়গার জন্য ছিল অস্বাভাবিক। কারণ বেজমেন্টগুলোতে পানি ঢুকে যেত। আমরা আর্দ্র রাখার মেশিন আর পাম্প ব্যাবহার করা সত্ত্বেও আমাদের বেজমেন্ট ছিল স্যাঁতসেঁতে।

আমাদের পরিবার সেই বাসায় যাওয়া পরে মূল ঘরের পিছনের অংশে লন্ড্রি রুম, একটি বাথরুম, আমার শোবার ঘর করা হয়। আর টিভি ও একটা সোফা দিয়ে বসার ঘরও বাড়ানো হয়। আমার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে সেই বসার ঘর দেখা যেত। সেই জানালা মূলত বাড়ির বাইরের দেয়ালের সাথে ছিল। যে জানালা দিয়ে একসময় বাইরে দেখা যেত, এখন ভেতরটা দেখা যায়।

এলিজাবেথ সিটির ওই বাসায় যতদিন আমার পরিবার ছিল ততদিন সেই শোবার ঘর আমারই ছিল, আর সেই জানালাও। সেই জানালায় পর্দা দেয়া ছিল কিন্তু তাতে জানালার ওপাশে কোনো গোপনীয়তা রক্ষা হতো না। আমার যতদূর মনে পড়ে আমার প্রিয় কাজ ছিল পর্দা সরিয়ে জানালা দিয়ে বসার ঘরে উঁকিঝুঁকি দেয়া। আমার প্রিয় কাজ ছিল গোয়েন্দাগিরি করা।

আমি আমার বোন জেসিকার ওপর গোয়েন্দা নজরদারি করতাম। সে আমার চেয়ে বেশি রাত জেগে থেকে কার্টুন দেখত। আমার মা ওয়েন্ডি, তিনি সোফায় বসে কাপড় ভাঁজ করতেন আর রাতের খবর দেখতেন। আমি সবচেয়ে বেশি যার ওপর নজরদারি করেছি তিনি আমার বাবা লন। সাউদার্ন স্টাইলে তাকে লনিও বলা হতো। তিনি সেই বসার ঘরকে গভীর রাতে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিতেন।

আমার বাবা কোস্ট গার্ড ছিলেন। আমি এত বুঝতাম না। তিনি কখনো ইউনিফর্ম পরতেন আবার কখনো পরতেন না। বাসা থেকে জলদি বের হতেন আর দেরি করে ফিরতেন। তিনি TI-30 সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর, ক্যাসিও স্টপওয়াচ, বাসার জন্য সিংগেল স্পিকারের টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসতেন। কিছু জিনিস আমাকে দেখাতেন আবার কিছু জিনিস লুকোতেন। আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন আমি কোন জিনিসের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলাম।

আমি যে যন্ত্রের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম সেটা এক রাতে আমি ঘুমাতে যাবার পর বাসায় আসে। আমি বিছানায় ছিলাম। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছিল। বসার ঘরের দিকে বাবা আসার শব্দ শুনলাম। বিছানার উপর দাঁড়িয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে তাকালাম। জুতার বাক্সের মতো সাইজের একটি রহস্যময় বাক্স। ওটা থেকে চারকোণা ছাইরঙা একটি ব্লক বের করলেন। সেটার ভেতর থেকে কালো ক্যাবল বের হলো। ক্যাবলগুলো দেখতে আমার স্বপ্নে দেখা ভয়ানক সামুদ্রিক কোনো জীবের শুঁড়ের মতো ছিল।

বাবা খুব সাবধানে ক্যাবলের প্যাঁচ খুললেন। তারপর বক্সের পেছন থেকে একটি ক্যাবল কার্পেটের উপর দিয়ে টেনে টিভির সাথে জুড়ে দিলেন। আর অন্য ক্যাবলটি প্লাগ দিয়ে সোফার পেছনে দেয়ালে সংযুক্ত করে দিলেন।

টিভিটি হুট করে জ্বলে উঠল। আমার বাবার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। অন্য সময় দেখা যেত, সন্ধ্যায় সোফায় বসে বাবা সানড্রপ সোডাতে চুমুক দিতেন আর টিভি দেখতেন। কিন্তু এই টিভিটা একবারে ভিন্ন ছিল। আমি আমার সেই ছোট্ট জীবনে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম নতুন টিভিতে কী হবে না হবে সেটা আমার বাবা নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করছেন।

এটি ছিল কমোডোর-৬৪। বাজারে আসা প্রথম হোম কম্পিউটার সিস্টেম। আমি তখন বুঝতামও না কম্পিউটার কী জিনিস। এটাও বুঝতাম না বাবা কী সেটাতে গেইম খেলছেন না কাজ করছেন। দেখে মনে হতো তিনি খুব মজা পাচ্ছেন। বাসায় যন্ত্রপাতি নিয়ে যেভাবে তিনি গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করতেন এটার ক্ষেত্রেও সেই একই মনোযোগ ছিল। বাবা যা করছিলেন, আমিও সেটাই করতে চাইতাম।

এরপর যখনই তিনি বসার ঘরে আসতেন, আমি আমার বিছানা থেকে উঠে আস্তে করে পর্দা সরিয়ে তার কাজ দেখতাম। এক রাতে দেখলাম, সেই স্ক্রিনে একটি বল উপর থেকে নিচে লাফাচ্ছিল, আর নিচের দিকে একটি বারে সেই বলকে আঘাত করার জন্য তিনি বারবার সেই বারটিকে এদিকে থেকে ওদিকে সরিয়ে নিচ্ছিলেন। সেই বল বারে আঘাত করে আবার উপরে উঠত আর বিভিন্ন রঙের ইটে আঘাত করে সেটা ভেঙে ফেলত (Arkanoid)। আরেক রাতে দেখলাম, বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন মাপের কতগুলো ইট যখনই পড়ে যেত তিনি তখন একই রঙের ইটগুলোকে একত্রিত করে সাজিয়ে দিতেন আর সাথে সাথে সেগুলো গায়েব হয়ে যেত (Tetris)। একদিন জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি বাবা স্ক্রিনের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন। আমি বুঝতে পারলাম না, বাবা যা করছেন তা কী বিনোদন ছিল৷ নাকি তার কাজ ছিল৷

কোস্ট গার্ড বিমান ঘাঁটি থেকে যখনই কোনো হেলিকপ্টার আমাদের বাসার উপর দিয়ে উড়ে যেত, বাবা আমাকে সেটা দেখাতেন। আমার খুব খুশি লাগত।

আর
চালাচ্ছিলেন।
ঘাঁটি থেকে
পরেই সেটি
আমিও বাবা
হেলিকপ্টার
এই
আমাদের
মানুষদের
আর হেলিক
ভাবতাম, আ
ছোট্ট
নিরাপদে
করে উঠলেন
জানালা দিয়
আগেই আমি
পড়লাম। বা
সময়। কিন্তু
আমার
রুমে চলে
উড়িয়ে বসা
পাইলট হয়ে

আর এখন বসার ঘরে আমার সামনে তিনি নিজের হেলিকপ্টার চালাচ্ছিলেন। আমেরিকার পতাকা নাড়ানোর সাথে সাথেই হেলিকপ্টারটি বিমান ঘাঁটি থেকে মিটিমিটি তারায় ভরপুর রাতের আকাশে উড়ে চলল। কিন্তু একটু পরেই সেটি বিধ্বস্ত হয়ে গেল। সেই টানটান উত্তেজনায় ভাটা পড়ার কারণে আমিও বাবার মতো বিমর্ষ হয়ে গেলাম। বাবা আরো কয়েকবার তার হেলিকপ্টার আকাশে উড়ালেন।

এই রোমাঞ্চকর গেইমের নাম ছিল Choplifter। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের বসার ঘরের এই গল্পগুলোর সাক্ষী হতাম। আর আমার বাবা মানুষদের বাঁচানোর জন্য মরুভূমিতে শত্রুর বিমান ও ট্যাংকে গুলি করছেন, আর হেলিকপ্টারটি উপর থেকে নিচে দ্রুতগতিতে উড়িয়ে নিয়ে চলছেন। আমি ভাবতাম, আমার বাবা একজন হিরো বটে।

ছোট্ট হেলিকপ্টারটি স্ক্রিনের ছোট্ট ছোট্ট মানুষগুলো নিয়ে যখন প্রথমবার নিরাপদে অবতরণ করল, আমার বাবা তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তার চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল কি না সেটা দেখার জন্য জানালা দিয়ে তাকাতেই তিনি আমাকে দেখে ফেললেন। আমার বাবা আসার আগেই আমি এক দৌড়ে আমার বিছানায় গিয়ে কম্বল দিয়ে মাথা ঢেকে শুয়ে পড়লাম। বাবা জানালা দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তোমার ঘুমের সময়। কিন্তু তুমি কী এখনো জেগে আছো?

আমার নিঃশ্বাস যেন থেমে গেল। বাবা হঠাৎ করেই জানালা খুলে আমার রুমে চলে আসলেন। আচমকা টানে আমার কম্বল সরিয়ে আমাকে শূন্যে উড়িয়ে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। কিছু বুঝে উঠার আগেই আমি বাবার কো-পাইলট হয়ে গেলাম। মহাআনন্দে আমি বাবার সাথে উড়ছিলাম।

অদৃশ্য দেয়াল

এলিজাবেথ শহরটি মনোরম এবং ঐতিহাসিক একটি উপকূলীয় শহর। অন্যান্য আমেরিকান শহরের মতো এটিও নদী তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। পাস্কুওট্যাংক নদীর তীরে। এটি ইংরেজী Algonquin শব্দের বিকৃতি। যার অর্থ যেখান থেকে স্রোত দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। নদীটি চেসাপিক উপসাগরের থেকে নর্থ ক্যারোলিনা-ভার্জিনিয়া সীমান্তের জলাভূমির সীমানা অতিক্রম করে চোয়ান, পারকুইম্যানস ও অন্যান্য নদীর সাথে আলবেমারলে মোহনায় মিশেছে। আমার নিজের জীবনের গন্তব্য নিয়ে চিন্তা করলে আমি নদীর কথা চিন্তা করি। নদী যে পথই অতিক্রম করুক না কেন তা সাগরেই মিশে।

আমার পরিবারের বরাবরই সাগরের সাথে গভীর মিতালি। বিশেষ করে আমার মায়ের দিক। আমার মায়ের পূর্বসূরীরা সাগর ভ্রমণকারী ছিল। মায়ের প্রথম পূর্বপুরুষ জন এল্ডেন। তিনি কাঠের বড় গামলা নির্মাতা। তিনি জাহাজে তার সহযাত্রী প্রিসিলা মুলিঙ্গকে বিয়ে করেন। প্রিসিলা জাহাজের এবং প্লাইমাউথ কলোনির একমাত্র অবিবাহিতা নারী ছিলেন। কিন্তু প্লাইমাউথ কলোনির কমান্ডার মাইলস স্টান্ডিস এর জন্য জন ও প্রিসিলার মিলন প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রিসিলার জন্য মাইলসের ভালোবাসা, প্রিসিলার তাকে প্রত্যাখান করে জনকে বিয়ে করা এ সবকিছু হেনরি ওয়েডসওয়ার্থ লংফেলো'র বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম 'The Courtship of Miles Standish'এর জন্ম দেয়। হেনরি এল্ডেন-মুলিঙ্গ এর বংশধর ছিলেন।

Nothing was heard in the room but the hurrying pen of the stripling,
Busily writing epistles important, to go by the Mayflower,
Ready to sail on the morrow, or next day at latest, God willing!
Homeward bound with the tidings of all that terrible winter,
Letters writtenby Alden, and full of the name of Priscilla,
Full of the name and the fame of the Puritan maiden Priscilla!

জন ও প্রিসিলার মেয়ে এলিজাবেথ নিউ ইংল্যান্ডের প্রথম পর্যটকশিশু ছিল। আমার মা তার সরাসরি বংশধর। আমার মায়ের নামও এলিজাবেথ।

আমাদের বংশটি প্রায় একচেটিয়াভাবে একজন নারী থেকে এসেছে। তাই বংশীয় উপাধি প্রায় প্রতিটি প্রজন্মের সাথে পরিবর্তিত হয়েছিল। অলডেন বিয়ে করেছেন পাবডিকে, পাবডি গ্রিনেলকে, গ্রিনেল স্টিফেনসকে আর স্টিফেনসরা জোসেলিনকে বিয়ে করেছিলেন। আমার এই পূর্বপুরুষরা জলদস্যুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সমুদ্রপথে ম্যাসাচুসেটস থেকে কানেকটিকাট এবং নিউ জার্সির উদ্দেশ্যে উপকূলের পথে ঔপনিবেশিক ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করেছিল। বৈপ্লবিক যুদ্ধের পর জোসেলিনরা নর্থ ক্যারোলিনাতে বসবাস করতে শুরু করে।

আমাজিয়াহ জোসেলিন, যাকে আমেশিয়াহ জোসেলিনও বলা হয়। তিনি ছিলেন একজন বীরযোদ্ধা, দশটি গোলাসমৃদ্ধ জাহাজ 'ফায়ারব্যান্ড' এর নাবিক। ক্যাপ ফিয়ার অন্তরীপের নিরাপত্তায় তার অবদানকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়। আমেরিকার স্বাধীনতার পর তিনি পোর্ট উইলমিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর গোয়েন্দা বা সাপ্লাই অফিসার হিসেবে কাজ করেন। এখানেই তিনি বাণিজ্য কার্যালয় গড়ে তোলেন। এটাকে গোয়েন্দা অফিসও বলা হতো। আমার মায়ের পূর্বপুরুষ এই জোসেলিন ও তার উত্তরসূরীগণ–মুর, হল, মেইল্যান্ড, হওয়েল, স্টিভেন, রেস্টন, স্টকলিরা ইতিহাসের প্রতিটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। বিপ্লব থেকে শুরু করে গৃহযুদ্ধ (এতে ক্যারোলিনিয়ান পূর্বপুরুষরা তাদের নিউ ইংল্যান্ড জ্ঞাতিজনদের সাথে কনফেডারেসির জন্য যুদ্ধ করেন) এবং দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই তারা অংশগ্রহণ করেছেন। আমি এমন এক বংশ ও পরিবার থেকে এসেছি যারা সবসময়ই তাদের দায়িত্বের প্রতি অনুগত ছিল।

আমার নানা এডওয়ার্ড. জে. ব্যারেট যাকে আমি পপ বলি, তিনি একজন রিয়ার এডমিরাল ছিলেন। আমার জন্মের সময় তিনি ওয়াশিংটন ডিসির কোস্ট গার্ড সদরদপ্তরে অ্যারোনোটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সহকারী প্রধান ছিলেন।

তিনি নিউইয়র্কের গভর্নর আইসল্যান্ড ও ফ্লোরিডার কি ওয়েস্ট শহরে গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং ও অপারেশনাল দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি সেখানে জয়েন্ট ইন্টারএজেন্সি টাস্ক ফোর্স ইস্ট (ক্যারিবীয় অঞ্চলে মাদক পাচারের প্রতিরোধের জন্য নিবেদিত ইউএস কোস্ট গার্ড-নেতৃত্বাধীন একটি বহুমুখী, বহুজাতিক বাহিনী)'তে প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পদমর্যাদা কিছুই আমি যদিও বুঝতাম না। তবে এটা বুঝতাম যে পপের সম্মানে প্রতিটি অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য এবং কেক প্রতিবারই অন্যবারের চেয়ে বড় থাকত। কামানবাহিনীর সেই সম্মাননার কথা আমার এখনও মনে আছে। উত্তপ্ত এবং গন্ধযুক্ত 40mm রাউন্ড গুলি পপের সম্মানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

আমার জন্মের সময় আমার বাবা লন এলিজাবেথ শহরের কোস্ট গার্ডস এভিয়েশন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের অন্যতম প্রধান ছিলেন এবং কারিকুলাম ডিজাইনার ও ইলেক্ট্রনিক ইন্সট্রাকটর ছিলেন।

তিনি প্রায়ই বাসার বাইরে থাকতেন। আমার মাকে একাই আমি ও আমার বোনকে দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করতে হতো। দায়িত্ব শেখানোর জন্য মা আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ দিতেন। পড়তে শেখানোর জন্য কাপড়ের ড্রয়ারে-মোজা, আন্ডারওয়্যার এভাবে লিখে রাখতেন। তিনি আমাদের রেড ফ্লাইয়ার ওয়াগনে করে লোকাল লাইব্রেরিতে নিয়ে যেতেন। সেখানে আমি আমার প্রিয় সেকশনের নাম দিলাম বড় মেশিন। মা আমার প্রিয় কোনো মেশিনের কথা জিজ্ঞেস করলেই অনর্গল বলতে থাকতাম ডাম্পট্রাক আর স্টিমরোলার আর ফর্কলিফট আর ক্রেন আর...

শুধু এগুলোই?

আমি উত্তর দিতাম, "ওহ হ্যাঁ, সিমেন্ট মিক্সচার আর বুলডোজার আর..."

মা আমাকে গণিত চ্যালেঞ্জ দিতে পছন্দ করতেন। কে-মার্ট বা ওইন-ডিক্সিতে গেলে তিনি আমাকে বই, গাড়ি, ট্রাক পছন্দ করতে বলতেন। যদি আমি সেগুলোর দাম যোগ করতে পারতাম তাহলে সেগুলো কিনে দিতেন মায়ের দেওয়া এই পরীক্ষা দিন দিন কঠিন হতে শুরু করল। প্রথমে ডলারে হিসেব করতে বলতেন তারপর নির্দিষ্ট ডলার ও শতকরা পরিমাণ বের করতে বলতেন। তারপর সেই পরিমাণের ৩% কে মোট দামের সাথে যোগ করতে বলতেন।

আমি প্রশ্ন করতাম, '৩% কেনো?'

'এটাকে বলে ট্যাক্স। আমরা যা কিছু কিনবো তার হিসেবের ৩% সরকারকে দিতে হবে।'

'এই টাকা দিয়ে তারা কী করে?'

'উম! তুমি কী রাস্তা পছন্দ করো, ব্রিজ পছন্দ করো? সরকার সেই টাকা দিয়ে এসব রাস্তা, ব্রীজ মেরামত করে। সেই টাকা দিয়ে লাইব্রেরির জন্য বই কিনে।'

যখন ক্যাশ রেজিস্টারের ডিসপ্লের সাথে আমার হিসেব মিলতো না তখন নিজের গাণিতিক জ্ঞান নিয়ে চিন্তায় পড়ে যেতাম। মা আবার বুঝিয়ে বলতেন, 'এখানে বিক্রয় ট্যাক্সও আছে। তাই ৪% যোগ করতে হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'তাহলে এখন সরকার লাইব্রেরিতে আরো নতুন বই দিবে?'

'আশা করা যায়,' মা বলতেন।

আমাদের কয়েক রাস্তা পরেই ক্যারোলিনার সবুজ মাঠ, সার কারখানা আর বাদাম গাছে সমৃদ্ধ এলাকাটায় আমার নানি থাকতেন। নানির বাসায় যাবার সময় আমার শার্টকে পুটলি বানিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা বাদামগুলো সেই পুটলিতে নিয়ে নিতাম। তারপর নানির বাসায় একটা নিচু বইয়ের তাকের পাশে কার্পেটে শুয়ে থাকতাম। তখন আমার সাথী হতো ঈশপের গল্প এবং আমার প্রিয় 'Bulfinch's Mythology'। খুব মন দিয়ে বই পড়তাম। বাদাম

খেতে খেতে উড়ন্ত ঘোড়া, গোলকধাঁধা, সাপের মতো চুলের ডাইনীর মধ্যে হারিয়ে যেতাম।

দেবতাদের মধ্যে ওডিসিয়াস'কে ভালো লাগত না। পছন্দ করতাম জিউস, এপোলো, হারমিস আর দেবী এথেনাকে। দেবতা হেফাইস্টস ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। সে ছিল আগুন, আগ্নেয়গিরি, লোহার দেবতা। তার গ্রিক নাম বানান করতে পারা আমার জন্য ছিল গর্বের বিষয়। আমি এটাও জানতাম যে স্টার ট্রেক সিরিজের চরিত্র স্পকের গ্রহের নাম আর হেফাইস্টসের রোমান নাম একই–ভলকান।

গ্রিক -রোমান দেবতারা আমাকে সবসময় মোহাবিষ্ট করে। পর্বতের চূড়ায় অমর দেব-দেবীরা বাস করে। তারা একে অন্যের সাথে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মানুষের কর্মকাণ্ডে নজর রাখে। মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখলে তারা সিংহ, ভেড়া, রাজহাঁসের ছদ্মবেশ ধরে মর্ত্যে নেমে আসে আর অলিম্পাস পর্বতের চূড়ায় বসে মানুষের কাজে হস্তক্ষেপ করে। এ কারণে তাদের ওপর অভিশাপ নেমে আসে। কেউবা ডুবে যায়, কারো ওপর বজ্রপাত ঘটে আর কেউবা অভিশাপে গাছ হয়ে যায়।

'King Arthur and His Knights' রূপকথার বইটির কথা বলি। ওয়েলস এর এক পাহাড়ে রিটা গর নামে এক হিংস্র দৈত্য থাকত। সে জানতে পারল যে, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মানব শাসকদের শাসন থাকবে। সুতরাং পৃথিবীতে তার শাসনের সমাপ্তি হয়েছে। তুচ্ছ ও দুর্বল মানুষদের কাছে সে তার শাসন কখনোই দিবে না। তাই সে পর্বত থেকে নেমে এসে রাজ্যের পর রাজ্য ধ্বংস করে দিল। সে ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ডের সব রাজাকে হত্যা করে তাদের দাড়ি দিয়ে কোট তৈরি করল। সেই কোটকে বিজয়চিহ্ন হিসেবে পরিধান করত।

তারপর সে ব্রিটেনের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা আর্থারের মুখোমুখি হলো। আর্থারকে হয় তার দাড়ি শেভ করে আত্মসমর্পণ করতে হবে নয়তো রিটা গর আর্থারের দাড়ি শেভ করবে ও তার শিরশ্ছেদ করবে।

এমন ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হয়ে আর্থার রিটা গরের পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। দিনের পর দিন আর্থার দৈত্যের সাথে লড়াই করলেন ও মারাত্মকভাবে জখম হলেন। দৈত্য যখন আর্থারের শিরশ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন আর্থার তার সর্বশক্তি দিয়ে দৈত্যের চোখের ভেতর তার তরবারি ঢুকিয়ে দিলেন। দৈত্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আর্থার ও তার সৈন্যরা রিটা গরের দেহ সরিয়ে ফেলার আগেই তুষারপাত শুরু হলো। দৈত্যের রক্তাক্ত লাল কোটটি একেবারে শুভ্রসফেদ হয়ে গেল। এই পর্বতকে বলা হয় স্নোডান বা তুষারপর্বত। বর্তমানে এই পর্বতের নাম মাউন্ট স্নোডান। ৩,৫৬০ ফুট উঁচু ওয়েলস এর সর্বোচ্চ পর্বতটি একটি মৃত আগ্নেয়গিরি।

এ পর্বতের সাথে আমার নামের সাদৃশ্য পেয়ে শিহরিত হলাম। আরেকটা ব্যাপার বুঝতে পারলাম যে, পৃথিবীটা আমার চেয়েও এমনকি আমার মা-বাবার চেয়েও পুরনো। আর্থার, ল্যান্সলট, গাওয়াইন, পার্সিভাল এবং ট্রিস্টান ও অন্যান্য বীরদের এই দুঃসাহসিক কাজে খুব গর্ববোধ করতাম।

অনেক বছর পর মায়ের সাথে লাইব্রেরিতে গিয়ে জানতে পারলাম, আর্থারের ইংল্যান্ড জয়ের পর সম্মান জানিয়ে স্কটল্যান্ডের স্টার্লিং দুর্গের নাম রাখা হয় স্নোডান দুর্গ। তার মানে আমি যা জানতাম তা ছিল রূপকথা, বাস্তব নয়। বাস্তবতা, কল্পকথার মতো অতিরঞ্জিত হয় না, তবে তা কল্পকথার চাইতেও অধিক গৌরবসমৃদ্ধ থাকে।

আর্থারের গল্পের পর আমি নতুন এক ধরনের গল্পে আসক্ত হয়ে গেলাম। ক্রিসমাস ১৯৮৯, বাসায় নিন্টেন্ডো গেইম আনা হয়। আমি এই গেইমে এতটাই মজে গেলাম যে, মাকে একটি নতুন নিয়ম তৈরি করতে হলো। যেটা ছিল আমি যদি একটি বই পড়ে শেষ করতে পারি তাহলেই নতুন গেম খেলতে পারব।

গেইমগুলো ব্যয়বহুল ছিল। তবু আমি সুপার মারিও, ডাক হান্ট শেষ করে আরো নতুন গেইম চ্যালেঞ্জের অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সমস্যা হলো ছয় বছর বয়সি সেই আমি যত দ্রুত গেইম খেলতে পারতাম, তত দ্রুত পড়তে পারতাম না। আমি নতুন একটা বিষয় হ্যাক করলাম। লাইব্রেরি থেকে ছবিসম্বলিত ছোট ছোট বই আনলাম। বইগুলোতে বাইসাইকেল, বিমানসহ বিভিন্ন নতুন আবিষ্কারের ছবি ছিল। কমিকস বইগুলো জুলস ভার্ন ও এইচ. জি. ওয়েলসের ছোটদের সংস্করণের সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল।

NES-এই ৮ বিটের নিন্টেন্ডো গেইম সিস্টেম থেকেই আমি প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছি। 'দ্য লিজেন্ড অফ জেল্ডা' থেকে বিশ্বকে জানার, অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা জানলাম। মেগা ম্যান থেকে বুঝতে পারলাম শত্রু থেকেও কিছু শেখার আছে। ডাক হান্ট থেকে জানলাম কেউ আমার পরাজয়ে হাসার মানে এই না যে তাদের সাথে বাজে ব্যবহার করতে হবে। আর সুপার মারিও ব্রোস থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পেয়েছিলাম। এর ১.০ এডিশনটিতে মারিও স্ক্রিনের বাম দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। সে শুধু একটি পথেই এগিয়ে যেতে পারবে। সে ডানদিকে যেতে পারবে যদি তার শত্রুরা সেই পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। সব বাধা উপেক্ষা করে সে বত্রিশটি ধাপই অতিক্রম করে দুষ্টু 'বওজার' এর কাছে পৌঁছে বন্দি 'টোডস্টোল'কে মুক্ত করে।

এই ৩২টি ধাপেই মারিও এমন একটা অবস্থানে ছিল যেখান থেকে সে পেছনে ফিরতে পারবে না। যাকে গেইম এর ভাষায় বলে, অদৃশ্য দেয়াল। মারিও, লুইজি, আমাকে ও আপনাকে শুধু সামনেই এগিয়ে যেতে হবে।

জীবন এরকমই। সময় আমাদেরকে শুধু সামনের দিকে নিয়ে যায়। অদৃশ্য এক দেয়ালের জন্য আমরা কখনোই অতীতে ফিরে যেতে পারি না। নর্থ

ক্যারোলিনার ছোট্ট শহরের ছোট্ট একটি শিশু মারিও ব্রাদারদের থেকে নৈতিকতা শিখে নিল।

একদিন আমার সুপার মারিও ব্রোস ভিডিও গেইমটি কোনোভাবেই চালু হচ্ছিল না। তাই গেইম বক্সটিকে খুলে ধুলোবালি পরিষ্কার করলাম। কিন্তু বক্সে আর টিভি স্ক্রিনে মাকড়শার জাল পেলাম।

অন্যদিকে, নিন্টেনডোতে পিন ঠিকমতো না লাগানোয় সেটাও চালু হচ্ছিল না। সাত বছরের আমি জানতাম না পিন কীভাবে লাগাতে হয়। হতাশ হয়ে গেলাম। অন্যদিকে বাবাও দুই সপ্তাহের জন্য কোস্ট গার্ড ট্রিপে চলে যাওয়ায় কোনো সাহায্যের আশা রইল না। আমি নিজেই তাই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নেমে গেলাম। ভাবলাম এতে বাবাও খুব খুশি হবেন। গ্যারেজ থেকে বাবার মেরামতের জিনিসপাতি নিয়ে এলাম।

বাবা যেভাবে ভিসিআর ও ক্যাসেট মেরামত করতেন ঠিক সেভাবেই চেষ্টা করলাম। এক ঘণ্টার চেষ্টায় বাক্সটি খুলতে পারলাম। কিন্তু আমার ছোট্ট হাত দিয়ে স্ক্রুড্রাইভারকে ঘুরাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে সফল হলাম।

বাক্সের বাইরের দিকটা ধূসর বর্ণের হলেও ভেতরের দিকটা রঙিন। সবুজ সার্কিট বোর্ডের উপর সোনালি, রুপালি ও রংধনুর মতো হরেক রকমের তার ছিল। মেরামত করার পর সার্কিট বোর্ডটা পরিষ্কার করে নিলাম। পরিষ্কার ও মেরামতের কাজ শেষ হলে বাক্স আবার একত্র করতে গিয়ে দেখলাম স্ক্রু খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো কার্পেট বা সোফার নিচে হারিয়ে গিয়েছিল। এক দিকের স্ক্রু খুঁজে পেয়ে লাগানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু অন্যদিক খোলা রয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বাক্সের সাথে প্লাগ জুড়ে দিয়ে তা অন করলাম। কিন্তু পাওয়ার বাটন, রিসেট বাটন কোনোটাই আর কাজ করছিল না। নিজেকে অপরাধী মনে হলো। বেশ ভয় পাচ্ছিলাম। বাবা ফিরে এসে খুশিতো হবেনই না উল্টো রাগ করবেন। যদিও আমার চিন্তা বাবার রাগ নিয়ে ছিলনা। আমাকে নিয়ে তিনি গর্ব করতে পারবেন না। এটা ভেবেই হতাশ হয়ে গেলাম।

বড়দের কাছে আমার বাবা একজন দক্ষ ইলেক্ট্রনিকস সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার আর আমার কাছে একজন পাগলাটে বিজ্ঞানী যিনি বাসার এসি, হিটার, ডিশওয়াশার এবং ইলেক্ট্রনিক্সের জিনিসপাতি মেরামত করতে পারতেন। আমি তার সহকারী হিসেবে কাজ করে জানতে পারলাম মেকানিক্যাল এই কাজগুলো বেশ আনন্দদায়ক। আমি ভোল্টেজ-কারেন্ট, পাওয়ার-রেসিস্ট্যান্সের পার্থক্য ধরতে পারলাম। সবসময় আমরা সফল না হলেও আমার বাবার প্রচেষ্টাকে আমি সবসময় গুরুত্বের সাথেই দেখতাম।

বাসায় ফিরে NES এর অবস্থা দেখে বাবা রাগও করেননি আবার খুশিও হননি। তিনি আমাকে বোঝালেন কেন ও কীভাবে ভুল হলো। এই ভুলগুলো ভবিষ্যতে যাতে না হয় তাই আমাকে কী করতে হবে। বাক্সের প্রতিটা অংশ কোনটা কী, কীভাবে কাজ করে, একটার সাথে অন্যটা কীভাবে এক হয়ে

সঠিকভাবে কাজ করে তা একটা একটা করে বুঝিয়ে বললেন। শুধু এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাজ দেখে ওই যন্ত্রের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা তুমি বুঝতে পারবে না। যদি ওই নির্দিষ্ট অংশে সমস্যা থাকে তাহলে এটা ঠিক করলেই হয়ে যাবে, নয়তো তোমাকে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাকেই উন্নত করতে হবে। আমার বাবার মতে, মেরামতের ক্ষেত্রে এটাই যথাযথ নিয়ম। কোনো কিছুই ফেলনা নয়। সবকিছুকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। প্রযুক্তির প্রতি এটাই আমাদের মূলদায়িত্ব।

আমার বাবার এই শিক্ষাটি স্বনির্ভর হওয়ার শিক্ষা। বাবার মতে, তার শৈশব থেকে আমার শৈশবের এই সময়টায় আমেরিকা তা ভুলে গিয়েছিল। নিজে কোনো যন্ত্র ঠিক করার চিন্তা করার চেয়ে তা মেকানিক দিয়ে ঠিক করা ভালো। আবার এর চেয়ে ভালো নতুন মডেল দিয়ে পুরনো মডেল প্রতিস্থাপন করা। আর ব্যয়ও তুলনামূলক কম। প্রযুক্তির অপব্যবহার হচ্ছিল শুধু প্রযুক্তির কারণেই নয় বরং আমরা যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করছি তাদের অজ্ঞতার কারণেও। প্রযুক্তির ব্যবহার ও তার কাজ তদারক না করার ফলে প্রযুক্তি আমাদের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। যখন যন্ত্র কাজ করে আমরাও করি, যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন আমরাও হতাশ হয়ে বসে থাকি। সৃষ্টিই স্রষ্টাকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে দেয়।

আমি সেই গেইম বক্স মেরামত করতে গিয়ে একটা সোল্ডার পয়েন্ট ভেঙে ফেলেছিলাম। কোনটা ভেঙেছি তা জানার জন্য বাবা কোস্ট গার্ড ঘাঁটির ল্যাবরেটরির কিছু বিশেষ যন্ত্রাংশ ব্যবহার করলেন। সেসব যন্ত্রপাতি বাসায় না এনে আমাকেই সেই ল্যাবে নিয়ে গেলেন। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে আমি এত অবাক আর খুশি হলাম যে, লিনহাভেন মলের রেডিও রুমে বা লাইব্রেরিতে গিয়েও আমি এত খুশি হইনি। ল্যাবের ভেতরটা আলোআঁধারি ছিল। আর অনেকগুলো টিভি ছিল। ইলেক্ট্রিক গ্রিন রঙের আতিশয্যে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। আমার মাথায় প্রথম যে ভাবনা এলো তা হলো, এই রুমে এত টিভি কেন? সব টিভিতে একই চ্যানেল কেন?

বাবা বললেন, "এগুলো টিভি নয়, কম্পিউটার।"

বাবা সবগুলো একটা একটা করে দেখিয়ে এদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এটা রাডার সিগন্যাল দেয়, এটা রেডিও থেকে তথ্য পাঠায়, এটা এয়ারক্রাফটের ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম চেক করে ইত্যাদি।

আমি বাবাকে বুঝতে দিলাম না যে, আমি তার কথার অর্ধেকও বুঝিনি। এই কম্পিউটারগুলো তখনকার সময়ে ব্যবহৃত ব্যক্তিগত কম্পিউটারের চেয়েও বহুগুণ উন্নত ছিল।

আমি ভাবলাম, এই কম্পিউটারে কোনো সাউন্ড সিস্টেম নেই, এর ডিসপ্লেতে একটিমাত্র রঙ আছে, এটি বুট করতে পাঁচ মিনিট সময় নেয়। সুতরাং এগুলো কোনো সাধারণ কম্পিউটার নয়। বাবা আমাকে একটি

চেয়ারের উপর বসিয়ে দিলেন। সেটি উপরের দিকে টেবিল পর্যন্ত উঠতে থাকল। আমি জীবনে এই প্রথমবার কীবোর্ড দেখতে পেলাম। বাবা কখনো তার কমোডোর-৬৪ এর কীবোর্ড আমাকে ধরতে দেননি। আমি সেটিতে শুধু কন্ট্রোলারের সাহায্যে গেইম খেলতে পারতাম। কিন্তু এই কম্পিউটারগুলো খেলার জন্য নয়। এদের বিশেষ কাজ ছিল। আমি বুঝলাম না এগুলো কীভাবে কাজ করে। এখানে কোনো কন্ট্রোলার ছিল না, শুধু ছিল বর্ণ আর সংখ্যা লেখা আয়তাকার প্লাস্টিক কীবোর্ড। বর্ণগুলোও ওভাবে সাজানো না যেভাবে আমি স্কুলে শিখেছি। প্রথম বর্ণ A ছিল না, ছিল Q। এরপর W, E, R, T। শুধু সংখ্যাগুলো সেভাবে ছিল, যেভাবে আমি শিখেছি।

বাবা বললেন, প্রতিটা বর্ণ, সংখ্যা ও প্রতিটা কী'র নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। কন্ট্রোলারের মতো এটি দিয়েও চমৎকারভাবে কাজ করা যায়। আমাকে বোঝানোর জন্য বাবা কমান্ড টাইপ করলেন, এন্টার চাপলেন। তারপর স্ক্রিনে কিছু একটা এলো যা এখন টেক্সট এডিটর বলে জানি। বাবা সেখানে কিছু বর্ণ আর সংখ্যা লিখলেন। ঠিক সেগুলোই টাইপ করতে বলে আমার ভাঙা নিনটেন্ডো মেরামত করতে চলে গেলেন। আমি কীবোর্ড থেকে খুঁজে খুঁজে টাইপ করা শুরু করলাম। আবিষ্কার করলাম বামহাতি শিশুটি ডানহাতে লেখা শুরু করেছে।

```
10    INPUT   "WHAT IS     YOUR   NAME?";     NAME$
20    PRINT   "HELLO,      "+     NAME$ +     "!"
```

এটা হয়তো খুব সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু আমি তখন শিশু ছিলাম। কোটেশন চিহ্ন কী তাও জানতাম না। জানতাম না যে এটা টাইপ করতে গেলে শিফট বাটন ধরে রাখতে হয়। অনেক চেষ্টা আর ভুলের পর লিখতে সফল হলাম। তখন কম্পিউটার জিজ্ঞেস করল, WHAT IS YOUR NAME?

আমি খুব খুশি হয়ে উত্তর দিয়ে আবার এন্টার চাপলাম। উজ্জ্বল সবুজ স্ক্রিনে কোথা থেকে কালো অক্ষরে ভেসে উঠল, HELLO, EDDIE!

প্রোগ্রামিং আর গণনার সাথে ঐদিন আমার পরিচয় ঘটে। বুঝতে পারলাম একটি যন্ত্র কাজ করে কারণ তাকে কাজ করতে বলা হয়। এমনকি একটি সাত বছরের শিশুও এই নির্দেশনা দিতে পারে।

শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম গেমিং সিস্টেমগুলো নির্দিষ্ট কাজ করে। নিন্টেনডো, আটারি, স্যাগাতে বিভিন্ন ধাপ থাকে যাতে আপনি সামনে যেতে পারবেন বা জিততে পারবেন কিন্তু তা বদলাতে পারবেন না।

নিন্টেনডো মেরামতের পর আমি আর বাবা একসাথে মারিও কার্ট, ডাবল ড্রাগন এবং স্ট্রিট ফাইটার খেলতাম। এই একটি কাজেই আমি বাবার চেয়ে

বেশি পারদর্শী ছিলাম। মাঝেমধ্যে আমি তাকে জিততে দিতাম। যাতে তিনি আমাকে অকৃতজ্ঞ না ভাবেন।

আমি ন্যাচারাল প্রোগ্রামার নই। আমি এতে খুব ভালোও নই। তবে জীবনের পুরো একটি দশক মারাত্মক কিছু কাজ করার মতো মোটামুটি ভালো হয়েছি। এ বিষয়টি আমার কাছে এখনো জাদুকরি মনে হয়। কোনো কমান্ড টাইপ করার পর প্রসেসর তা ট্রান্সলেট করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। একজন প্রোগ্রামার আইনের আওতাহীন সার্বজনীন কোনো কিছুকে কোড করতে পারে।

ইনপুট ও আউটপুটের মাঝে সম্পর্ক আছে। ইনপুট ভুল হলে আউটপুটও ভুল আসবে। ইনপুট সঠিক তো আউটপুটও সঠিক। সহজ হিসেব। একটি কম্পিউটার সারা জীবন আমার কমান্ডের অপেক্ষা করবে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তা সেই কমান্ড বাস্তবায়ন করবে। একজন শিক্ষকের চেয়েও এটি বেশি ধৈর্যশীল ও দ্রুত উত্তর দেয়। কিছু লিখিত কমান্ড নির্ভুলভাবে সময়মতো কাজ করে সেটা উপস্থাপন করবে। স্কুল বা বাসায় কোথাও আমি এত নিয়মতান্ত্রিকতা দেখিনি। সহস্রাব্দের প্রযুক্তিপ্রবণ, স্মার্ট শিশুদের জন্য এ এক অপরিবর্তনীয় সত্য।

বেল্টওয়ে বয়

আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমার পরিবার নর্থ ক্যারোলিনা থেকে ম্যারিল্যান্ড চলে এলো। অ্যানে আরান্ডেল প্রদেশ যেখানে আমার পরিবার স্থানান্তরিত হয়েছিল সেখানে প্রায় সব জায়গায় আমার স্নোডেন নাম পাওয়া যেত। লর্ড বাল্টিমোর যখন ক্যাথলিক, প্রোটেস্টেন্ট ও কোয়াকার (জর্জ ফক্স প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সমাজ)দের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন ১৬৫৮ সালে ম্যারিল্যান্ড প্রদেশে রিচার্ড স্নোডেন নামে এক ব্রিটিশ মেজর আসেন। ১৬৭৪ সালে স্নোডেনের ভাই জন কোয়াকার ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করায় তাকে ইয়র্কশায়ার ছেড়ে চলে আসতে হয় কারাদণ্ড থেকে বাঁচার জন্য। ১৬৮২ সালে উইলিয়াম পেন এর "দ্য ওয়েলকাম" জাহাজটি ডেলাওয়ারে আসলে জন এই জাহাজকে স্বাগত জানানো অন্যতম ইউরোপীয় ছিলেন।

জনের তিনজন পৌত্র বিপ্লবের সময় কন্টিনেন্টাল আর্মিতে যোগ দেন। কোয়াকাররা শান্তিকামী ছিল বিধায় স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হয়। নিউইয়র্কের ফোর্ট ওয়াশিংটনের যুদ্ধে আমার পূর্বপুরুষ ক্যাপ্টেন উইলিয়াম স্নোডেন ব্রিটিশদের হাতে বন্দি হন এবং ম্যানহাটনের অন্যতম জঘন্য চিনির কল কয়েদখানায় বন্দি অবস্থায় মারা যান। বলা হয় যে ব্রিটিশরা তাদের যুদ্ধবন্দিদের খাবারের সাথে কাঁচ খাইয়ে বাধ্য করে হত্যা করত। তার স্ত্রী এলিজাবেথ নি মুর ছিলেন জেনারেল ওয়াশিংটন এর এডভাইজার। তিনি ছিলেন পেনসিলভানিয়ার রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, পত্রিকা প্রকাশক জন স্নোডেনের মা। তার পূর্বপুরুষরা দক্ষিণ দিকে তাদের জ্ঞাতিভাই স্নোডেনদের বসতি ম্যারিল্যান্ড চলে আসে। ১৬৮৬ সালে রিচার্ড স্নোডেনের পরিবারকে সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস ১,৯৭৬ একর বনভূমি দান করেন। অ্যানে আরান্ডেল প্রদেশটিকে এই বনভূমি ঘিরে আছে। স্নোডেনের সম্পত্তির মাঝে আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোহা কারখানা এবং অস্ত্র ও কামানের রপ্তানিকারক পাটুক্সেন্ট লোহা কারখানা, এবং রিচার্ড স্নোডেন এর নাতিদের দ্বারা পরিচালিত স্নোডেন গার্ডেন অন্যতম। ম্যারিল্যান্ডের কন্টিনেন্টাল আর্মিতে দায়িত্বপালন শেষে স্নোডেনের নাতিরা স্নোডেন গার্ডেনে কাজ করা শুরু করে।

তারা গৃহযুদ্ধের আগে তাদের দুইশত আফ্রিকান দাসদের মুক্ত করে দেয়। বর্তমানে স্নোডেনের জমি স্নোডেন নদীর পার্কওয়ে, রেস্টুরেন্ট ও গাড়ির ব্যবসায় সমৃদ্ধ চার লেনের বাণিজ্যিক এলাকায় বিভক্ত। কাছেই ৩২/পাটুক্সেন্ট সড়কটি ফোর্ট জর্জ জি মিডের সাথে গিয়ে মিশেছে। আমেরিকার ২য় বৃহৎ সেনাঘাঁটি এবং NSA'র সদর দপ্তর এখানেই অবস্থিত। ফোর্ট মিড স্নোডেনদের ছিল। এটি হয়তো তাদের থেকে কিনে নেয়া হয়েছে বা সরকার জনস্বার্থে তাদের থেকে বাজেয়াপ্ত করেছে। আমার বাবা-মা প্রায়ই এটা নিয়ে ঠাট্টা

করতেন কারণ নতুন কেউ এলাকায় আসলেই ম্যারিল্যান্ড নিজের নাম বদল করত। আমার কাছে এটা খুব আজব লাগত। অ্যানে আরান্ডেল প্রদেশটি এলিজাবেথ শহরের I-95 হাইওয়ে পথে ২৫০ মাইলের অল্প কিছু দূরে অবস্থিত। তবু এই জায়গাটিকে ভিন্ন এক জগৎ মনে হতো।

পাতাঝরা নদীর পারের পথ ছেড়ে কংক্রিটের ফুটপাতের পথে চলে এলাম। এলিজাবেথ শহরের স্কুলে আমি বেশ বিখ্যাত ছিলাম। আর এই নতুন শহরের নতুন স্কুলে আমার চশমা, খেলাধুলার প্রতি অনীহা ও বিশেষ করে আমার উচ্চারণ নিয়ে ঠাট্টা করা হতো। আমার দক্ষিণাঞ্চলের ধীরগতি উচ্চারণের জন্য আমাকে নির্বোধ ভাবা হতো। উচ্চারণ নিয়ে এতটাই লজ্জিত ছিলাম যে, ক্লাসে কথা বলাই বন্ধ করে দিলাম। বাসায় একা একা কথা বলা প্র্যাকটিস করতাম। যাতে অন্তত ইংলিশ ক্লাসকে Anglish clay-iss অর ফিংগারকে Fanger না বলতে হয়। এর মধ্যে কথার জড়তার কারণে আমার রেজাল্টের ধস নামল। আমার মানসিক সমস্যা আছে ভেবে শিক্ষকরা আমার IQ টেস্ট নিলেন। যখন টেস্টের ফলাফল আসে তখন আমার মনে পড়ে না কেউ আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিল বলে। বরং অতিরিক্ত কতগুলো অ্যাসাইনমেন্ট ধরিয়ে দেয়া হলো।

আমার বাসা ছিল 'বেল্টওয়ে'তে। বেল্টওয়ে বলতে Interstate 495কে বোঝায়। এটা ওয়াশিংটন ডিসিকে বৃত্তের মতো ঘিরে থাকা একটি হাইওয়ে। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির চারদিকে উত্তরে ম্যারিল্যান্ডের বাল্টিমোর থেকে দক্ষিণে ভার্জিনিয়ার কোয়ান্টিকো পর্যন্ত 'বেডরুম কমিউনিটি'র বাস। তারা হলো সেসব মানুষ যারা কাজের জন্য কোনো শহরে থাকে। এই শহরতলীর মানুষজন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে এমন কোম্পানিতে কর্মরত।

আমরা থাকতাম ম্যারিল্যান্ডের ক্রফটনে। এটি আনাপোলিস ও ওয়াশিংটন ডিসির মাঝে অবস্থিত। অ্যানে আরান্ডেল প্রদেশের পশ্চিমপ্রান্তে এখানকার আবাসিক এলাকাগুলো পুরনো স্টাইলে গড়ে উঠেছে। আর নামগুলোও পুরনো ধাঁচের। যেমন- Crofton Town, Crofton Mews, The Preserve, The Ridings। ক্রফটন বেশ পরিকল্পিত শহর। মানচিত্রে এর রাস্তগুলোর বাঁক অনেকটা সেরেব্রাল কর্টেক্সের শিরার মতো দেখতে। আমাদের রাস্তাটি ছিল নাইট ব্রিজের মোড়ে। এটি বড় হাউজিং, রাস্তা, গ্যারেজসমৃদ্ধ একটা এলাকা। আমাদের বাসাটা ছিল একেবারে মাঝামাঝিতে। আমি হাফি দশ গতির বাইসাইকেল পেলাম আর সাথে পেলাম আনাপোলিস থেকে প্রকাশিত 'Capital' পত্রিকার রুট। শীতকালে ক্রফটন পার্কওয়ে আর রুট ৪৫০ এর মাঝে এই পত্রিকা বিলি করা ছিল বিরক্তিকর। আমাদের এলাকায় এই রুটকে বলা হতো ডিফেন্স হাইওয়ে।

আমার বাবা-মার জন্য এই সময়টা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুব ভালো ছিল। রাস্তার পাশে সারি সারি গাছ, ক্রাইম ফ্রি পরিবেশ, বহুজাতি, বহুভাষা, বহু বর্ণের মানুষে ভরপুর একটি জায়গা। এই ভিন্নতা ছিল বেল্টওয়ের শিক্ষিত ও অবস্থাসম্পন্ন কূটনীতিক এবং গোয়েন্দা সমাজের বসবাসের কারণে। আমাদের ব্যাকইয়ার্ডে গল্ফ মাঠ, টেনিস কোর্ট আর একটি সুইমিংপুল ছিল। ক্রফটন ছিল আদর্শ একটি জায়গা। আমার বাবা ছিলেন দক্ষিণ ওয়াশিংটন ডিসির কেন্দ্রে ফোর্ট লেসলি জে ম্যাকনায়ারের সাথে অবস্থিত কোস্টগার্ড হেডকোয়ার্টারের চিফ ওয়ারেন্ট অফিসার। ওখানে যেতে তার মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় লাগত।

এনএসএতে মায়ের নতুন চাকরিস্থলে যেতে লাগত ২০ মিনিট। ফোর্ট মিডের কেন্দ্রে অবস্থিত এনএসএ হেডকোয়ার্টার থেকে তথ্য ও সংকেতকে পর্যবেক্ষণ করা হতো। আমাদের বাম দিকের প্রতিবেশীরা ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করত। ডানদিকের প্রতিবেশীরা কাজ করত 'ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি' ও 'ডিপার্টমেন্ট অফ কমার্স' এ। স্কুলে যতটা মেয়েকে আমি পছন্দ করতাম তাদের প্রায় সবার বাবা ছিল এফবিআই-এ কর্মরত।

ফোর্ট মিডে মায়ের সাথে আরো এক লক্ষ পঁচিশ হাজার কর্মী কাজ করতেন। প্রায় চল্লিশ হাজার কর্মী তাদের পরিবার নিয়ে থাকত। সামরিক বাহিনীর পাঁচটি শাখার ও ১১৫টি সরকারি সংস্থার সদর দপ্তর ছিল ওখানে। অ্যানে আরান্ডেলে ছিল পাঁচ লক্ষ মানুষের বাস। প্রতি ৮০০ জনে ১ জন পোস্ট অফিসে, প্রতি ১৩ জনে একজন সরকারি স্কুলে, প্রতি ৪ জনে ১ জন ফোর্ট মিডের কোনো বাণিজ্য সংস্থায় কাজ করত। ফোর্ট মিডের সেনাঘাঁটিতে তাদের নিজস্ব স্কুল, পুলিশ, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ছিল। সামরিক বাহিনীর সদস্য, শিশুকিশোর, সাধারণ মানুষজন প্রতিদিন ঘাঁটিতে গলফ, টেনিস খেলতো, সুইমিংপুলে সাঁতারের জন্য যেত। আমরা ঘাঁটির বাইরে থাকলেও মা ওখানকার মুদির দোকান থেকে জিনিসপাতি কিনতেন।

তিনি সেনাঘাঁটির পিএস বা পোস্ট এক্সচেঞ্জ সুবিধা পেতেন। আর আমার এবং বোনের জন্য শুল্কমুক্ত পোশাক কিনতে পারতেন। ফোর্ট মিডের পরিবেশে যে পাঠকরা বেড়ে ওঠেননি আশা করি তারা এর পরিবেশকে বুঝতে পারছেন যে, এটা একটা বাণিজ্যিক শহর। এর এই একচেটিয়া সংস্কৃতির সাথে সিলিকন ভ্যালির মিল আছে। পার্থক্য শুধু একটাই। বেল্টওয়ের পণ্য হচ্ছে সরকার, প্রযুক্তি নয়।

আমার বাবা-মা দুজনেরই গোয়েন্দা ছাড়পত্র ছিল। সামরিক বাহিনীর কাউকে পরীক্ষা করার জন্য পলিগ্রাফ টেস্টের দরকার হয় না। মাকে এই উচ্চ পর্যায়ের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। মজার বিষয় হলো, আমার মা গোয়েন্দা সদস্য ছিলেন না। তিনি এনএসএ'র অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের অবসর পরিকল্পনা সম্পর্কিত একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করতেন। তবু

তাকে এত চেক করা হতো। মনে হতো যেন তিনি কোনো জংগলে প্যারাসুট দিয়ে নেমে অতর্কিত আক্রমণ করে ফেলবেন।

আমার বাবার কাজ তখন আমার কাছে ঝাপসা ছিল। আমি যে পরিবেশে বড় হয়েছি সেখানে বড়রা তাদের কাজ সম্পর্কে তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলাও আইনত নিষিদ্ধ ছিল। আমি মনে করি এর পেছনে আছে তাদের কাজের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ। প্রযুক্তির সাথে যাদের কাজ তারা খুব কমই তাদের উপর দেয়া দায়িত্বের বৃহত্তর বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা রাখে।

আমেরিকান অনলাইন

আমরা ক্রফটনে থাকার সময় প্রথম ডেস্কটপ কম্পিউটার Compaq Presario 425 নিয়ে আসা হয়। এটার মূল দাম ১,৩৯৯$ ইউএস ডলার। সামরিক সদস্য হিসেবে বাবা এটি ডিসকাউন্টে নিয়ে আসলেন। আমি প্রতিটা সময় এই কম্পিউটারের সাথেই লেগে থাকতাম। আগেও আমার বাইরে গিয়ে বল খেলতে ভালো লাগত না। আর এখন তো সেই চিন্তাই হাস্যকর মনে হলো। ২৫ মেগাহার্টজ ইনটেল ৪৮৬ সিপিইউ আর ২০০ মেগাবাইট হার্ডডিস্কের একটা পিসির মধ্যে আমি যা পাচ্ছিলাম তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কোথাও ছিল না। এর ছিল ৮ বিট কালার মনিটর অর্থাৎ এতে ২৫৬ টিরও বেশি কালার ডিসপ্লে করত (বর্তমানে হয়তো আপনার ডিভাইস লক্ষাধিক কালার ডিসপ্লে করতে পারে)। এই Compaqটি ছিল আমার বন্ধু, আমার ভাই, আমার প্রথম ভালোবাসা। এটি আমার জীবনে সেই বয়সে আসে যখন আমি নিজেকে একটু একটু করে আবিষ্কার করছিলাম। আমার সব চিন্তার দুনিয়াকে এর মধ্যেই জড়ো করে রাখলাম। এ আবিষ্কার এত রোমাঞ্চকর ছিল যে আমি আমার পরিবার, আমার পূর্বের জীবনকে উপেক্ষা করা শুরু করলাম। তখন পরিবর্তনের সময়টা পার করছিলাম। আর এটি ছিল প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তন শুধু আমার মাঝেই না বরং সবখানে, সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ছিল

আমার বাবা-মা যখন আমাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য বলতেন কিংবা রাতের খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতেন আমি তখন শুনতাম না। আর শুনলেও না শোনার ভান করতাম। আমাকে মনে করিয়ে দেয়া হতো এটা আমার একার কম্পিউটার নয় বরং সবার। তখন মন খারাপ করে চেয়ার ছেড়ে উঠতাম। বাবা, মা, বোন কম্পিউটারে তাদের কাজ করতে আসলে আমাকে রুম ছেড়ে চলে যেতে বলতেন। তাও দেখা যেত তাদের ঘাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতাম। বোনের রিসার্চ পেপার লিখার সময় তাকে ওয়ার্ড প্রসেসিং, শর্টকাট আর বাবা-মাকে ট্যাক্সের হিসাব রাখার জন্য স্প্রেডশিটের ব্যবহার নিয়ে উপদেশ দিতাম।

তাদের কাজ শেষ করার জন্য তাড়াহুড়া করতাম। যাতে আমি লুম গেইম খেলতে পারি। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে কমোডর কম্পিউটার বাজার হারিয়ে ফেলল। পং প্যাডেলস, হেলিকপ্টার গেমসগুলো বিদায় নিলো। তখন অবশ্য এই কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা একেকজন বই পড়ুয়াও ছিল। নিন্টেনডো, আতারি, স্যাগা গেইম বা এরকম বিভিন্ন গেইমের গল্পগুলো শৈশবে নানির বাড়িতে কার্পেটে শুয়ে পড়া রুপকথার গল্পগুলোর স্মৃতিটুকু কেড়ে নিল। এর মধ্যে ছিল নিনজাদের থেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বাঁচানোর গল্প।

লুম গেইমটির গল্প তাঁতিদের একটি সমাজ সম্পর্কে ছিল যাদের গুরু-(গ্রীক নাম ক্লোথো, লাচিসিস এবং অ্যাট্রোপস) একটি গোপন তাঁত তৈরি করে

যা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন একটি ছোট ছেলে তাঁতের ক্ষমতা বুঝতে পারে তখন তাকে নির্বাসনে বাধ্য করা হয়। বিশ্বে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে মানুষ বুঝতে পারে গোপন ভাগ্য যন্ত্রটি তৈরি করা মোটেও ভালো বুদ্ধি ছিল না। আমার মনে আছে গেইমটির মেশিন অনেকটা কম্পিউটারের মতো ছিল। এর রংধনু রঙের তারগুলো কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ রংধনু তারের মতো ছিল।

কম্পিউটারের ধূসর রঙা তারটি বিশ্বের সাথে আমাদেরকে সংযুক্ত করত। আমার কাছে সত্যিকারের জাদু ছিল কেবল এই তার, কমপ্যাকের এক্সপেনশন কার্ড এবং মডেম আর একটি ফোন যা দিয়ে ডায়াল করে ইন্টারনেট নামে নতুন কিছুর সাথে সংযোগ করতে পারতাম।

একবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী পাঠকরা হয়তো বুঝতে পারছেন না। তবে বিশ্বাস করুন, এটি ছিল এক আশ্চর্য। আজকাল স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ডেস্কটপে সবসময় সংযোগ দেয়া থাকে। কিসের সাথে? কীভাবে? এটা কোনো ব্যাপার না। আপনি শুধু ইন্টারনেটে বাটন চেপে আপনার আত্মীয়দেরকে কল করতে পারছেন। আপনি জানতে পারছেন বিশ্বের খবর, পিৎজা অর্ডার করতে পারছেন, মিউজিক শুনছেন, ভিডিও দেখছেন। অথচ তখন বারো বছরের সেই আমি নিজেই সেই মডেমকে সরাসরি দেয়ালে লাগিয়ে দিতাম।

আমি বলছি না যে আমি ইন্টারনেট নিয়ে বেশি জানি। তখনকার সময়ে আমরা এর গুরুত্ব বুঝতে পারতাম। যখন ইন্টারনেট সংযোগ দিতাম দেখা যেত সাপের মতো আওয়াজ করছে কিংবা বেশ সময় নিচ্ছে। কাউকে ফোন করতে গেলে দেখা যেত কীসব উদ্ভট আওয়াজ আসছে। ওগুলো মেশিনের ভাষা, যা প্রতি সেকেন্ডে ১৪ হাজার সংকেত পাঠাত।

ইন্টারনেট একসেস আমাদের জেনারেশনের জন্য এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো ছিল। যা সবার জীবন পরিবর্তন করে দিলো। বারো বছর বয়স থেকে আমি অনলাইনে প্রচুর সময় কাটাতে থাকলাম। ইন্টারনেট, ওয়েব হয়ে গেল আমার বাসস্থান, আমার দুর্গ, আমার স্কুল। একটা সময় আমি রাতে না ঘুমিয়ে দিনের বেলা স্কুলে ঘুমাতাম। আমার গ্রেডের ক্রমশ অবনতি হতে থাকল। আমি এতে মোটেও চিন্তিত ছিলাম না। এমনকি বাবা-মাও না। আমি তাদেরকে বুঝতাম যে, স্কুলে আমাকে যা শিখানো হয় অনলাইনে আমি এর চেয়ে বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জন করতে পারছি, যা আমার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে কাজ দিবে।

দিন দিন ইন্টারনেট নিয়ে আমার আগ্রহ বাড়তেই থাকল। প্রতিদিন, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি ঘণ্টায় বিভিন্ন নতুন ওয়েব পেইজের সাথে যুক্ত হতাম যেসব বিষয়ে আমি জানতামও না, কখনো নামটাও শুনিনি তা ভালো করে জানার জন্য ওসব ওয়েব পেইজে যুক্ত হতাম। খাওয়া, বিশ্রাম আর টয়লেটের জন্য কিছুটা সময় অবশ্য ছিল। আমার আগ্রহ শুধু CD-ROM নিয়েই ছিল না।

গড মোড গেইম এর ডুম এবং কোয়েকের জন্য চিট কোড খুঁজতাম গেইমিং সাইটে।

এত এত তথ্যের সমাহার আমার জন্য খুব আনন্দদায়ক ছিল। কীভাবে নিজের কম্পিউটার তৈরি করা যায় থেকে শুরু করে প্রসেসর আর্কিটেকচারের উপরেও ইন্টারনেটে স্বল্পমেয়াদি কোর্স করলাম। আমার সবকিছু জানতে ইচ্ছে করত। আমার বয়সি অন্য ছেলেরা কে কার চেয়ে বেশি লম্বা, কার দাড়ি উঠেছে এসব নিয়ে যেখানে পড়ে থাকত সেখানে আমি প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগিতা শুরু করলাম।

স্কুলে আমার সাথে যেসব ছেলেমেয়েদের ভালো সম্পর্ক ছিল তাদের মধ্যে কিছু ছিল বিভিন্ন দেশের। যারা এই ভিন্ন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছিল। স্কুলে কোনো শাস্তি পেলে বা আমার রিপোর্ট কার্ড দেখলে বাবা-মা আমার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার বন্ধ করে দিতেন। এতে বিভিন্ন সাইটের তথ্য আর টিউটোরিয়াল মিস হয়ে যেত। অনলাইনে না থাকা সময়গুলো আমার জন্য অসহ্য হয়ে উঠল।

বাবা-মা ঘুমোতে না যাওয়া পর্যন্ত আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতাম। তারপর দরজাটা সাবধানে খুলে অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নেমে আসতাম। আমি লাইটটি বন্ধ রাখতাম এবং স্ক্রিনের বাতিটা জ্বলে উঠলেই বালিশ দিয়ে মেশিন চেপে রাখতাম যাতে মডেমের সাথে কম্পিউটারের সংযোগে যে আওয়াজ হয় সেটা রুমের বাইরে না যায়। তারপর অনলাইনে প্রবেশ করতাম।

আমার তরুণ পাঠকরা হয়তো ভাবছে তখন ইন্টারনেট খুব ধীর আর প্রাণহীন ছিল। কিন্তু তখন অনলাইনে থাকা মানে ছিল ভিন্ন এক জগতে থাকা। বাস্তবতার চেয়ে ভিন্ন এক জগৎ। তখনো মানুষ ভার্চুয়াল এবং প্রকৃত জগৎকে পৃথক রাখত। প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যবহারকারী নিজেরাই নির্ধারণ করত কোথায় কোনটি শেষ করবে আর কোনটি শুরু করবে।

সম্পূর্ণ নতুন কিছু নিয়ে চিন্তা করার, কাজ করার স্বাধীনতা খুব অনুপ্রেরণামূলক ছিল। 1.0 ওয়েবটি এর ব্যবহারকারীর প্রতি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না এবং ডিজাইনও যথেষ্ট কাঁচা ছিল। তবু তা ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও মৌলিকতার উপর জোর দিত। উদাহরণস্বরূপ, GeoCities site এর কথা বলা যায়। এসব অনন্য কাজগুলোর পেছনে আছে মানুষের অনন্য সৃজনশীলতা।

কম্পিউটার সায়েন্সের প্রফেসর, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, পলিটিক্যাল ইকোনোমিস্টরা কোনো অর্থের জন্য নয় বরং তাদের কাজকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাদের রিসার্চ, তাদের চিন্তাকে মানুষের সাথে ভাগ করেই বেশ খুশি ছিল। Pc বা Mac কিংবা ম্যাক্রোবায়োটিক ডায়েট, মৃত্যুদণ্ডের বাতিলকরণ এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে তাদের থেকে জানতে খুব ভালো লাগত কারণ তারা জানাতে আগ্রহী ছিল। তাদের সাইটে দেয়া ইমেইল এড্রেস

(@usenix.org, @frontier.net) ও ("click this hyperlink or copy and paste it into your browser") এসবের মাধ্যমে এরকম অনেক মেধাবী মানুষের সাথে যোগাযোগ করা যেত ও তারা খুশিমনে উত্তর দিত।

সরকার ও বাণিজ্যিক হস্তক্ষেপের কারণে সময় যত এগিয়ে চলল অনলাইন তত কেন্দ্রীভূত ও সংকুচিত হয়ে এলো। কিন্তু আমার কৈশোরকালে ইন্টারনেট ছিল মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য। এটার উদ্দেশ্য ছিল আলোকিত করা, ব্যবসা নয়। এটি পরিচালিত হতো প্রতিনিয়ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিবর্তিত কিছু নিয়ম এর মাধ্যমে। জোর করে চাপিয়ে দেয়া কোনো চুক্তি বা শোষণের মাধ্যমে নয়। এখন পর্যন্ত নব্বই দশকের পরিবর্তনই আমার চোখে সবচেয়ে সফল পরিবর্তন।

Web-based bulletin-board systems বা BBSes-এর সাথে আমি জড়িত ছিলাম। এতে আপনি পোস্ট করার জন্য নতুন বা পুরনো অথবা যেকোনো মেসেজ বা ইউজার নেইম বাছাই করতে পারতেন। পোস্টের উত্তরে যে মেসেজ আসত তা থ্রেড দিয়ে অর্গানাইজড ছিল। চ্যাট অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ইন্টারনেট রিলে চ্যাট ছিল। এতেও সাথে সাথে মেসেজ আদানপ্রদান করা যেত এবং লাইভ রেডিও, টিভিতে লাইভ সংবাদ ও টেলিফোন কলের মতোই এতে যেকোনো বিষয় আলোচনা করা যেত। আমার নিজের কম্পিউটার কীভাবে তৈরি করা যায় এ নিয়েই আমি বেশিরভাগ মেসেজ আদানপ্রদান করতাম। এর উত্তরগুলো ছিল খুবই উদার, যা আজকাল ভাবাই যায় না।

আমার খরচ বাঁচিয়ে যে চিপসেট কিনেছিলাম সেটা মাদারবোর্ডের সাথে কাজ করছিল না। তাই খুব চিন্তিত হয়ে উত্তর খুঁজলাম। দেশের অন্যপ্রান্তের এক কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট প্রায় দুই হাজার শব্দের এক উত্তরে আমাকে সব বুঝিয়ে দিলেন। এগুলো কোনো বই এর উত্তর ছিল না। এই উত্তরগুলো আমার সমস্যা সমাধান করার জন্য উদারভাবে আমাকে দেয়া হয়েছিল। বহু দূর থেকে বারো বছর বয়সি আমাকে উত্তরদাতা সেই ব্যক্তিটি একজন বয়স্ক অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ আমি প্রযুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়েছি।

বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার চেয়ে তখনকার সোশ্যাল মিডিয়া ছিল সুসভ্য কারণ যে কাজে যে দক্ষ সে সেই কাজেই ছিল। ১৯৯০ এর ইন্টারনেটে এক ক্লিকেই প্রবেশ করা যেত না। ইন্টারনেটে প্রবেশ করা ছিল সময়সাপেক্ষ BBS-এর সাথে আমি যুক্ত ছিলাম তা আগেই বলেছি। একবার নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসিসহ সারাদেশের BBS সদস্যদের মিটিং করার কথা ছিল লাস ভেগাসের কনজ্যুমার ইলেক্ট্রনিক শোতে। তারা আমাকে খুব জোর করল সন্ধ্যায় তাদের সাথে যোগ দিতে। বাধ্য হয়ে তাদেরকে আমার প্রকৃত বয়স বলতে হলো। আমি ভয় পাচ্ছিলাম তারা হয়তো আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিবে। কিন্তু উল্টো তারা আমাকে আরো উৎসাহ দিলো। ইলেক্ট্রনিক শোর

খবরাখবর আমাকে পাঠানো হলো। এক ব্যক্তি তো ফ্রিতে আমাকে একটি ব্যবহৃত কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ পাঠাতে চাইলেন।

BBS-এর মানুষদেরকে আমার বয়স বলেছিলাম কিন্তু আমি কে তা কখনো বলিনি। এই প্লাটফর্মগুলোর অন্যতম সুবিধা হলো এতে আমার পরিচয় কোনো গুরুত্ব রাখে না। আমি যে কেউ হতে পারি। এই বেনামি বৈশিষ্ট্য সব সম্পর্কের পার্থক্য দূর করে ভারসাম্যের মধ্যে নিয়ে আসে। ভার্চুয়ালি আমি লম্বা, বয়স্ক, পুরুষ হিসেবে নিজেকে কল্পনা করতে পারতাম। অগণিত ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতাম। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আমি আগ্রহ নিয়ে নানান প্রশ্ন করতাম। দিনে দিনে আমার কম্পিউটারে দক্ষতা বাড়তে থাকল। তবে এতে আমি মোটেও গর্বিত ছিলাম না। বরং আমার পূর্বের অজ্ঞতার জন্য লজ্জিত হলাম। নিজেই নিজেকে বলতাম, বোকা squ33ker চিপসেটের কার্যকারিতা নিয়ে অনেক আগে বোকার মতো প্রশ্ন করেছিল।

এই মুক্তসংস্কৃতিতে কোনো নির্দয় প্রতিযোগিতা ছিল না। কেউ কোনো ঝামেলা করত না এ কথা আমি বলব না। এই বেনামি সমাজে যারা নিন্দুক ছিল তারা কেউই কারো কাজ ছাড়া প্রকৃত পরিচয় জানত না। যদি অনলাইনে আপনার কোনো কার্যক্রম বিতর্ক তৈরি করত তাহলে আপনি সেই পরিচয় বাদ দিয়ে অন্য ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারতেন। নিজের পূর্বের চরিত্রটিকেও প্রতিযোগিতায় ছাড়িয়ে যেতে পারতেন। যেন সে কোনো অপরিচিত। বলে বোঝাতে পারব না এই ব্যাপারটা বেশ উপভোগ্য ছিল।

নব্বইয়ের দশকে, সরকার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হস্তক্ষেপ করে। ব্যবহারকারীদের অনলাইন ব্যক্তিত্বকে তাদের অফলাইন পরিচয়ে পরিণত করার ফলে ইন্টারনেট ডিজিটাল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অবিচারের শিকার হয়।

ইন্টারনেটের ব্যতিক্রম সমাজটি আমার প্রজন্মের সবাইকে নিজেদের মতামতের সাফাই না গেয়ে বরং তা পরিবর্তনের সুযোগ করে দেয়। কোনো কাজের জন্য অপমানিত হওয়ার ভয় না পেয়ে আড়ালে থেকে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করতে থাকি। ভুলের জন্য শাস্তির সাথে সংশোনের সুযোগ অপরাধীকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমার জন্য এটিই ছিল স্বাধীনতা।

চিন্তা করুন, সকালে জেগেই আপনি নতুন নাম, নতুন চেহারা, নতুন কণ্ঠ ধারণ করলেন। 'ইন্টারনেট বাটন' জীবনটাকেই 'রিসেট' করে দিত। সময়ের সাথে ইন্টারনেট প্রযুক্তি একেবারে বদলে যাবে। গুরুত্ব দিবে পরিচয় ও আদর্শগত ভিন্নতাকে। কিন্তু আমাদের সময় আমাদের ভিন্নতা, আমাদের ভুলকে উপেক্ষা করে তা আমদেরকে রক্ষা করত।

BBS ছাড়াও MMORPGs (massively multiplayer online role-playing games) গেইম খেলতাম। আলটিমা অনলাইন আমার প্রিয় MMORPG ছিল। এই গেইম খেলার জন্য আমি জাদুকর, যোদ্ধা বা চোর

সাজতে পারতাম যা আমার অফলাইন জীবনে সম্ভব ছিলনা। আলটিমা খেলতে গিয়ে বুঝতে পারলাম অন্যান্য খেলোয়াড়দের আমি চিনি কিন্তু অন্য কোনো রূপে, অন্য কোনো নামে। তারাও হয়তো আমাকে নিয়ে একই কথা ভাবত।

এই গেইমে অন্যরা আমার দেওয়া রহস্য সমাধান করে আমার চরিত্রটি অনুসন্ধান করতে হতো। আমি কখনো কবি তো কখনো যোদ্ধা, আবার কখনো কামার। দেখা যেত চরিত্র অনুসন্ধানে আমিই তাদের চেয়ে এগিয়ে আছি এমনভাবে তাদের সাথে মেসেজ আদানপ্রদান করতে হতো যাতে আমি নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে তাদের পরিচয় উন্মোচন করতে পারি।

এর চরিত্রগুলো বিচিত্র ছিল। স্কুলে অথবা অফিসের কাজ শেষে মনে হতো আমরা ডাক্তার, জাদুকর, রাখাল, রসায়নবিদ হিসেবে খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছি। এই গেইমের কিছু নিয়ম ছিল যাতে প্রতিটি চরিত্রকে কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতে হতো। এ গেইমগুলোকে খুব ভালোবাসতাম। যদিও পরিবারের জন্য ভালোবাসা এতটা উন্মুক্ত ছিল না। গেইমগুলো সময়সাপেক্ষ ছিল। আলটিমা নিয়ে পড়ে থাকায় বাসার ফোনবিলও অতিরিক্ত আসতে লাগল লাইন ব্যস্ত থাকায় অন্য কোনো ফোনকল আসত না। আমার বোন বুঝতে পারল সে আমার কারণে বন্ধুদের সাথে তার চলমান কৈশোর জীবনে স্কুলে ঘটে যাওয়া মজার মজার গল্প করতে পারছে না। সে খুব রাগ করল। সে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ফোন উঠিয়ে রেখে দিত আর ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত। ওদিকে নিচে আমি রাগে চিৎকার করতাম।

একটি গেইমকে সেইভ করে না রাখলে আর এর মধ্যখানে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে হলো-আপনার সব শেষ। কারণ শত-হাজার মানুষ একইসময় গেইমটি খেলছে। আপনি হয়তো আপনার সেনা নিয়ে সুউচ্চ দুর্গে আছেন। ড্রাগনকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এর মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনেক পরে আবার যখন সংযোগ আসবে তখন দেখবেন সমাধিফলকের নির্দয় লেখাটা- You Are Dead।

এ বিষয়গুলোকে এত গুরুত্ব দিতাম তা ভাবতেই লজ্জা লাগে এখন আমার বোন আমাকে দেখিয়ে ফোনের রিসিভার উঠিয়ে রাখত। কাউকে ফোন করার জন্য সে এই কাজ করত না। বরং সে আমাকে বুঝাতে চাইত, সে এই বাসার বস। বাবা-মা আমাদের চেঁচামেচিতে অতিষ্ট হয়ে অদ্ভুত এক কাজ করলেন। আনলিমিটেড ইন্টারনেটের ব্যবস্থা করে দিলেন এবং আরেকটি ফোন লাইন আনলেন। অবশেষে শান্তি আর শান্তি বিরাজ করল আমাদের বাসায়।

হ্যাকিং

সব কিশোররাই হ্যাকার হয়। তাদের জীবনের বিভিন্ন অপ্রিয় পরিস্থিতির জন্যই এটা তাদের করতে হয়। বড়রা ভাবেন তারা শিশু, আর তারা ভাবে তারা বড় হয়ে গেছে।

আপনার নিজের শৈশবের কথা মনে আছে? বাবা-মার কোনো আদেশ পছন্দ না হলে তা অগ্রাহ্য করার জন্য যা সম্ভব তাই করতেন কি-না? মূলত, আপনাকে বাচ্চা মনে করে সেভাবেই আপনার সাথে আচরণ করার কারণেই আপনি বিরক্ত হয়ে এমনটা করতেন। মনে করে দেখুন তো, তখন কেমন লাগত যখন আপনার বয়স আর উচ্চতার জন্য বড়রা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করত।

আপনার বাবা-মা, শিক্ষক, কোচ, স্কাউটমাস্টার, চার্চের পাদ্রি সবাই যেন আপনার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করার জন্য তাদের বয়সের ব্যবহার করতেন। তারা আপনার ভবিষ্যতের ওপর নিজের প্রথাগত ইচ্ছা চাপিয়ে দিতেন। বড়রা তাদের আশা, স্বপ্ন আপনার ওপর চাপিয়ে দিতেন আর বলতেন, 'তোমার ভালোর জন্য'। আবার কখনোবা তারা বলতেন, 'একদিন যখন বুঝবে তখন ঠিকই আমাকে ধন্যবাদ দিবে'। আপনার কৈশোরকালে এই কথাগুলোর জন্য নিজের ইচ্ছাকে তাদের ক্ষমতা দ্বারা দমে যেতে দেখেছেন।

বড় হওয়ার সাথে সাথে বুঝতে পারবেন আপনার মতামত ছাড়াই আপনার ওপর অপ্রিয় কিছু নিয়ম-নীতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। কিছু নিয়ম আপনি ঠিক তখন আবিষ্কার করবেন যখন আপনি তা ভঙ্গ করবেন। স্কুলে যখন ইতিহাস ক্লাসে বলা হলো যে, আমেরিকান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নাগরিকরা তাদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এটাকে বলে ডেমোক্রেসি।

এই ডেমোক্রেসি আমার ইতিহাস ক্লাসের সময় প্রয়োগ করা হলে নিশ্চিতভাবে আমি ও আমার ক্লাসমেটেরা ইতিহাস শিক্ষক মিস্টার মার্টিন, ইংলিশের মিস্টার ইভানস, সায়েন্সের মিস্টার সুইনি, গণিতের মিস্টার স্টকটন এবং আরো যে শিক্ষকরা বিভিন্ন বিষয়ে তাদের তৈরি বিভিন্ন নিয়ম চাপিয়ে দিতেন ও শিক্ষার্থীদের ওপর তাদের ক্ষমতার ব্যবহার করতেন, ভোট দিয়ে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করে ফেলতাম

যদি শিক্ষক বাথরুমে যেতে নিষেধ করতেন তাহলে বাথরুম আটকে রাখতে হতো। অজ্ঞাত কারণে স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনে ফিল্ড ট্রিপ বাতিল হওয়ার পর শিক্ষকরা এর কোনো ব্যাখা দেননি। কর্তৃপক্ষের কিছু নিয়ম আছে, সেগুলো রক্ষা করা লাগবে বলেই পার হয়ে যেতেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম এই ব্যবস্থার বাইরে কোনো মতামত প্রকাশ করা কঠিন। কারণ সবার

জন্য নিয়ম বদলাতে গেলে নীতিপ্রণেতাদের কিছু অসুবিধায় পড়তে হবে তাদের স্বার্থে আঘাত আসবে। এটা সিস্টেমজনিত ত্রুটি। রাজনীতি হোক বা গণনা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তৈরিকৃত নিয়মকে নিয়মপ্রণেতারা ভঙ্গ করে না।

তবে সব স্বৈরশাসনের মতো স্কুলের স্বৈরশাসনেরও জীবন সীমিত। সমস্ত অত্যাচারে বিভ্রান্ত কিশোররা প্রতিরোধ করতে শুরু করে। তারা হয় পালিয়ে যায় নয়তো অপরাধপ্রবণ হয়। কিন্তু বিপ্লবী কিশোরদের এই বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে ছিল না। আমি না করতাম প্রতিরোধ-প্রতিবাদ, আর না খেতাম ড্রাগস (এখন পর্যন্ত আমি মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হইনি বা সিগারেট খাইনি)। আমি বরং হ্যাকিং শুরু করলাম। এটা বড়দের ওপর সমান কর্তৃত্ব আরোপ করার সবচেয়ে ভালো ও শিক্ষণীয় উপায়।

অন্য সহপাঠীদের মতো আমিও নিয়মনীতি পছন্দ করতাম না। আবার তা ভাঙতেও ভয় পেতাম। সিস্টেম কী রকম তা আমার জানা ছিল। শিক্ষকের ভুল ধরতে গেলে বা তা শুধরে দিতে গেলে শাস্তি পেতে হবে। আমার অজান্তে কেউ আমার খাতা দেখে পরীক্ষা দিলে শাস্তি পেতে হবে, আর যে দেখেছে সে হবে সাসপেন্ডেড। হ্যাকিংয়ের উৎস এটাই। ইনপুট-আউটপুটের মাঝে নিয়মতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ার জন্য এটি একটি সচেতন পদক্ষেপ। যেখানে নিয়ম আছে, সেখানেই হ্যাকিংয়ের অস্তিত্বও থাকে।

একটি সিস্টেমকে হ্যাক করতে হলে এটি যারা তৈরি করেছে তাদের চেয়েও বেশি ভালোভাবে সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। একটা সিস্টেমকে কী কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে আর বাস্তবে সে কী কাজ করছে এই পার্থক্যকে দূর করতে গিয়ে হ্যাকাররা কোনো নিয়ম ভাঙে না বরং একটা কাজের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে দেয়।

মানুষ একটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে নিজের জন্য জীবনে যা কিছু পছন্দ করে তার পেছনে থাকে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং যুক্তি। আমরা প্রতিটি সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য পরিণতিগুলো মূল্যায়ন করতে এই অনুমানগুলো ব্যবহার করি। আমরা মনে করি কত নির্ভুলভাবে, কত জলদি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। তবে আমাদের সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই ত্রুটিযুক্ত হয়। এটাই হ্যাকিংয়ের প্রকৃতি। আপনি কে, আপনার যুক্তি কী তা এর জানার দরকার নেই। হ্যাকিংয়ের কাজ সেসব কর্তৃপক্ষ নিয়ে যারা কোনোরূপ পরীক্ষা ছাড়াই তাদের সিস্টেমের কাজকে সঠিক মনে করে। অবশ্যই আমি তা অনলাইন থেকে শিখেছি, স্কুল থেকে নয়। অনলাইন আমাকে আমার পছন্দনীয় সবকাজ শেখার সুযোগ করে দেয়। যত বেশি আমি অনলাইনে সময় কাটাতে থাকলাম স্কুলের হোমওয়ার্ক আমার কাছে অতিরিক্ত কাজ মনে হতো।

আমার বয়স যখন ১৩ বছর তখন আমি পড়ালেখা থেকে মুক্তি পাবার কথা চিন্তা করলাম। কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব তা জানতাম না।

ভাবলাম, যদি আমি ক্লাস ফাঁকি দিই তাহলে বাবা-মা আমাকে কম্পিউটার ব্যবহার করতে দিবেন না আর যদি পড়ালেখা ছেড়ে দিতে চাই তাহলে বাবা-মা নিশ্চিত আমাকে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন আর মানুষকে বলবেন আমি বাসা থেকে পালিয়ে গিয়েছি। এসব চিন্তা করতে করতে শেষমেশ একটা উপায় অবশ্য পেয়েও গেলাম। মূলত, সুযোগটা নিজেই আমার কাছে এসেছিল।

আমাদের স্কুলে নতুন ক্লাসের শুরুতেই সিলেবাস দিয়ে দেয়া হতো। এতে বইয়ের নাম, পরীক্ষার নিয়ম, কুইজ, অ্যাসাইনমেন্ট সবকিছু উল্লেখ করা ছিল। এছাড়াও সিলেবাসে গ্রেডিং সিস্টেম উল্লেখ করা ছিল। এ বিষয়গুলোকে আগে খুব একটা পাত্তা দিইনি। কিন্তু এখন এতেই লুকিয়ে ছিল আমার সব সমস্যার সমাধান। ওইদিন অংকের সিলেবাস নিয়ে বেশ গভীরভাবে চিন্তা করলাম। কোন অংকগুলো বাদ দিতে পারব আর কোনগুলো করলে পাস করতে পারব। যেমন–ইতিহাস ক্লাসে কুইজে ২৫%, পরীক্ষায় ৩৫%, টার্ম পেপারে ১৫%, হোমওয়ার্কে ১৫% আর প্রতি বিষয়ের ক্লাসে উপস্থিতির ১০% মার্কস নির্ধারিত ছিল। কুইজে আর পরীক্ষায় কোনো প্রস্তুতি ছাড়া বরাবরই ভালো করতাম। তাই এই দুটোর ওপর নির্ভর করলাম। বাকি রইল টার্ম পেপার আর হোমওয়ার্ক। নাহ! এগুলো আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। আমি যদি হোমওয়ার্ক না করে বাকি কাজগুলো করি তাহলে B পেতে পারব। হোমওয়ার্ক আর টার্ম পেপার দুটোই না করলে C পাব। ক্লাসে উপস্থিত থাকাটা বেশ বোকার মতো কাজ হবে। যদি এতে আমাকে শূন্য দেয়াও হয় তবু আমি D পেয়ে পাস করে ফেলতে পারব।

ছাত্ররা সর্বোচ্চ গ্রেড পাওয়ার শিক্ষকদের তৈরি এই নিয়ম বোকামি ছিল বটে। অবশ্য আমার জন্য এটি ছিল নিজের অপ্রিয় বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়ার সর্বোচ্চ স্বাধীনতা।

এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হোমওয়ার্ক করা ছেড়ে দিলাম। তখন প্রতিটি দিন ছিল পরম আনন্দের। প্রতিদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকা; মাথার ওপর ট্যাক্স এর ভার বহন করা মানুষরা তা একটুও বুঝবে না।

একদিন মিস্টার স্টকটন ক্লাসের সবার সামনে আমাকে মনে করিয়ে দিলেন আমার জমানো অর্ধডজন হোমওয়ার্কের কথা। তখন হোমওয়ার্ক না করার পেছনে আমার হিসেব-নিকেশ তাকে বলতে শুরু করলাম। সাথে সাথেই আমার সহপাঠীরা হাসিতে ফেটে পড়ল। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে তাদের কিছু উপকার হবে কি না এসব হিসেব করতে শুরু করল।

আমার কথা শুনে মিস্টার স্টকটন একটু হেসে বললেন, "Pretty clever, eddie"

তারপর তিনি আবার পড়ানো শুরু করলেন।

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা স্কুলের সবচেয়ে স্মার্ট ছেলে ছিলাম আমি।

ঠিক পরদিনই, মিস্টার স্টকটন পুরনো সিলেবাস পাল্টে নতুন সিলেবাস করলেন। এতে উল্লেখ ছিল, যদি কোনো শিক্ষার্থী ছয়টার বেশি হোমওয়ার্ক ফাঁকি দেয় তাহলে তাকে পরীক্ষায় ফেইল দেয়া হবে।

বাহ! বেশ বুদ্ধি আপনার, মিস্টার স্টকটন!

ক্লাসের পরে মিস্টার স্টকটন আমাকে বললেন, "তুমি তোমার মেধাকে হোমওয়ার্ক ফাঁকি দেয়ার কাজে না লাগিয়ে, খুব ভালোভাবে হোমওয়ার্ক করার কাজে লাগাও। তোমার মধ্যে আমি অনেক সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি, এড। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি বুঝতে পারছ না তুমি যে ফলাফল এখন করবে তা সারাজীবন তোমার কাজে লাগবে। নিজের পার্মানেন্ট রেকর্ড নিয়ে তোমার ভাব উচিত।"

***

হোমওয়ার্কের শিকল থেকে যে কদিন মুক্ত ছিলাম সেই কদিন ওই সময়টায় কম্পিউটারভিত্তিক কিছু হ্যাকিং করলাম। এতে আমার দক্ষতা বৃদ্ধি পেল বইয়ের দোকানে ছোট, ঝাপসা ফটোকপি করা হ্যাকার ম্যাগাজিন 2600 ও Phrack উল্টেপাল্টে দেখতাম আর হ্যাকিংয়ের টেকনিক আয়ত্ত করতাম Script kiddie n00b এর কাজের পদ্ধতিগুলোর কিছুই আমি বুঝতাম না।

এখনো লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করে কখন ও কীভাবে আমি দক্ষতা অর্জন করলাম। আমি কোনো ক্রেডিট কার্ড নাম্বার চুরি করিনি বা ব্যাংক একাউন্ট খালি করিনি। সত্যি বলতে লুট করা টাকা দিয়ে আমি কী করব এই চিন্তা তো অনেক দূরে, আমি আসলে এই বিষয়গুলো জানার জন্য যথেষ্ট ছোট আর বোকা ছিলাম। আমার যা কিছু দরকার তা এমনিতেই পাচ্ছিলাম। গেইম হ্যাক করার কিছু সাধারণ উপায় বের করলাম। আর তাছাড়া তখন ইন্টারনেটের এত টাকাপয়সা ছিল না। বর্তমানের মতো তো নয়ই। গেম হ্যাক করা ছাড়া আর যেটা জানতাম সেটা হলো ফ্রিতে ফোন করা বা phreaking।

তখনকার বড় কোনো হ্যাকারও খুব বেশি হলে গুরুত্বপূর্ণ নিউজ সাইটগুলো হ্যাক করত। তাও আধাঘণ্টার জন্য তা হ্যাক করে নিউজ হেডলাইনের জায়গায় Baron von এর কোনো GIF দিয়ে দিত আর লিখে দিত, "Because it's there"। বেশিরভাগ তরুণ হ্যাকার তাদের ক্ষমতা দেখাতে এই কাজ করত না। তারা এরকম করত কারণ অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় এমন কোনো সুযোগ তাদের কাছে ছিল না।

যদিও আমার বয়স কম ছিল। উদ্দেশ্য সৎ ছিল। অতীতের দিকে তাকালে বুঝতে পারি, আমি যত হ্যাকিংয়ের চেষ্টা করেছি তা আমার স্নায়বিক উত্তেজনাকে দিনকে দিন হ্রাস করছিল। আমার প্রথম দিকের হ্যাকিংয়ের প্রচেষ্টাটি আমার স্নায়বিক শক্তি হ্রাস করে দিল। আমি যত বেশি কম্পিউটার

সুরক্ষা ব্যবস্থাকে জানতে পেরেছি, তত বেশি এই যন্ত্রটিকে বিশ্বাস করার পরিণতি নিয়ে আমি আরো চিন্তিত হয়েছি।

কৈশোরে, আমার প্রথম হ্যাক আমাকে বেশ ভয় পাইয়ে দেয়। হঠাৎ করেই আমি পারমাণবিক হত্যাযজ্ঞের হুমকিতে থাকা পৃথিবীর বিষয়টা ভাবতে লাগলাম। আমেরিকার নিউক্লিয়ার প্রোগ্রামের কিছু আর্টিকেল পড়ছিলাম। শুধুমাত্র কয়েকটা ক্লিকের সাহায্যে আমেরিকার নিউক্লিয়ার রিসার্চ কেন্দ্র Los Alamos National Laboratory'র ওয়েবসাইটে পৌঁছে গেলাম। ইন্টারনেট এভাবেই কাজ করে। আপনার কৌতূহলকে আপনার আঙুল বাস্তবায়ন করে। হঠাৎ করেই আমি খেয়াল করলাম আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ সায়েন্টিফিক রিসার্চ ও মারণাস্ত্র তৈরিকারক প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটের একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থার দুর্বলতা দেখে অনেকটা খোলা দরজার মতো মনে হলো।

আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে করুন আপনাকে একটা পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করতে দিলাম যেটা একটি মাল্টিপেজ ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট পেজে রাখা আছে। ফাইলের URL সাধারণত website.com/files/pdfs/filename.pdf এরকম হয় একটি URL এর স্ট্রাকচার আসে তার ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার থেকে। প্রতিটি URL হলো এর ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারের একেকটা শাখা।

Website.com হলো ফাইলের একটি ফোল্ডার যার মধ্যে আবার পিডিএফ ফাইলের সাবফোল্ডার আছে। এখানে আপনি একটি নির্দিষ্ট ফাইল .pdf আপনি ডাউনলোড করতে চাচ্ছেন। বর্তমানে সব ওয়েবসাইট তাদের ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার বন্ধ ও প্রাইভেট রেখে আপনাকে নির্দিষ্ট ফাইলে প্রবেশাধিকার দেয়। কিন্তু তখনকার দিনে এতসব গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইট প্রযুক্তিজগতে নতুন মানুষদের দিয়ে চালানো হতো। তারা এসব ওয়েবসাইটের ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারকে উন্মুক্ত রেখে দিত। এর মানে আপনি website.com/files লিখে দিলে আপনি সেই সাইটের প্রতিটি ফাইল, প্রতিটি পিডিএফ দেখতে পারতেন। এমনকি যেগুলো ভিজিটরদের জন্য নয় সেগুলোও দেখতে পারতেন। এই ছিল লস আলামস সাইটের অবস্থা। হ্যাকিং কমিউনিটিতে "dirwalking" বা "directory walking" মূলত নতুনদের জন্য প্রাথমিক হ্যাকিং প্রক্রিয়া। সেটিই আমি করলাম। আমি যত দ্রুত সম্ভব ফাইল থেকে সাবফোল্ডারে গেলাম আর ফিরে আসলাম। আধাঘণ্টার মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা নিয়ে একটি আর্টিকেল পড়ার পর ওই ল্যাবের কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য এরকম একটি ফাইলে আটকে গেলাম। পরিষ্কার করে বলি, আমি যেসব ডকুমেন্টসে প্রবেশ করেছিলাম সেখানে আমার গ্যারেজে পারমাণবিক বোমা বানানোর মতো কোনো প্রক্রিয়ার কথা ছিল না (যদিও ডজনখানেক DIY ওয়েবসাইটে এসব অনেক পাওয়া যেত)। আমি যা

পেলাম তা ছিল অফিসের গোপন স্মারকচুক্তি এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য। সেনাসদস্য পিতামাতার সন্তান হিসেবে আমি তাই করলাম, যা আমার করা উচিত ছিল। আমি ল্যাবরেটরির একজন ওয়েবমাস্টারকে ওয়েবসাইটের দুর্বলতা জানিয়ে ইমেইল পাঠালাম এবং উত্তরের অপেক্ষা করলাম। যে উত্তর কখনোই আসেনি।

প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে সেই সাইটে গিয়ে চেক করতাম তারা ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার বদলিয়েছে কিনা। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখতাম তারা কিছুই বদলায়নি। ল্যাবরেটরি সাইটের নিচে থাকা তাদের ফোন নাম্বার জোগাড় করে বাসার অন্য একটি ফোনলাইন থেকে ফোন করলাম। একজন অপারেটর ফোন ধরতেই তোতলাতে শুরু করলাম। কোনোমতে ভাঙা গলায় ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারের কথা বলতে পারলাম।

অপারেটর থামিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন" ।

আমি তাকে ধন্যবাদ দেয়ার আগেই তিনি আমাকে ভয়েস মেইলে ট্রান্সফার করে দিলেন। আমি আত্মবিশ্বাস জুগিয়ে ধীর গলায় বার্তা পাঠিয়ে দিলাম। খুব স্বস্তির সাথে আমার নাম আর ফোন নাম্বার বলে সেই মেসেজটি দেয়া শেষ করলাম। আমি আমার বাবার মতো মিলিটারি ফোনেটিক বর্ণে আমার নাম বললাম, 'Sierra November Oscar Whiskey Delta Echo November"। তারপর পুরো এক সপ্তাহ ধরে লস আলামস ওয়েবসাইট চেক করছিলাম ।

বর্তমানে সরকারের সাইবার ইন্টেলিজেন্সের ধরন অনুযায়ী লস আলামস সার্ভারে দিনে কয়েকবার গেলে প্রবেশকারীরা স্বাভাবিকভাবেই খুব কৌতূহলী হয়ে উঠবে। আমিও কৌতূহল থেকেই গিয়েছিলাম।

সপ্তাহ অতিবাহিত হলো। সপ্তাহ আমার কাছে মাসের মতো মনে হলো। তারপর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় রাতের খাবারের কিছু আগে ফোন বেজে উঠল। মা খাবার রান্না করছিলেন। তিনি এসে ফোন ধরলেন। আমি ডাইনিং রুমে কম্পিউটারে কাজ করছিলাম। শুনতে পেলাম মা বলছেন, "জ্বী, সে আছে।" তারপর শুনলাম, "আমি কী জানতে পারি আপনি কে বলছেন?"

আমি চেয়ারটা ঘুরিয়ে দেখলাম মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চেহারার রঙ উড়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করেছ?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কে ফোন করেছে?"

"নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি লস আলামস থেকে।"

"ওহ, থ্যাংক গড।"

আমি খুশিমনে মাকে বসিয়ে তার হাত থেকে ফোনটি নিলাম।

"হ্যালো।"

ওপাশ থেকে লস আলামস আইটি বিভাগের খুব বিনয়ী একজন প্রতিনিধি আমাকে মিস্টার স্নোডেন বলে সম্বোধন করলেন। সমস্যার ব্যাপারে জানানোর জন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। আর বললেন তারা সমস্যা সমাধান করে ফেলেছেন।

এতো সময় কেনো লাগলো তা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমি থেমে গেলাম। তখনই কম্পিউটারে গিয়ে তাদের সাইট চেক করা থেকেও নিজেকে থামালাম। আমার মা আমার উপর থেকে চোখ সরাতে পারছিলেন না। তিনি প্রতিটা কথা জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছিলেন।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। তাকে আরো নিশ্চিত করার জন্য আমি গুরুগম্ভীর ভাষায় আইটি প্রতিনিধিকে বলতে থাকলাম কীভাবে আমি ডিরেক্টরি সমস্যাটা পেলাম, কীভাবে তা সমাধান করলাম, কেনো তারা এতোদিন সাড়া দিচ্ছিলেন না ইত্যাদি।

"আমাকে জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আমার কারণে কোনো সমস্যা হয়নি।" এটা বলে কথা শেষ করলাম।

"মোটেও না।" আইটি প্রতিনিধি বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন আমি কোনো কাজ করি কি না।

"তেমন কিছু না।" আমি বললাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমি কোনো চাকরি খুঁজছি কি না।

আমি বললাম, "স্কুলের সময়টায় আমি খুব ব্যস্ত থাকি। গ্রীষ্মে আমি অবসর পাব।" তখনই ওপাশের ব্যক্তিটি বুঝতে পারলেন তিনি একজন কিশোরের সাথে কথা বলছিলেন।

তিনি বললেন, "বেশ ভালো, বাবা। তোমার কাছে আমার কন্টাক্ট নাম্বার আছে। যখন তোমার আঠারো বছর হয়ে যাবে তখন আমার সাথে যোগাযোগ করবে কিন্তু। এখন সেই ভদ্রমহিলাকে ফোন দিয়ে দাও যার সাথে আমি শুরুতে কথা বলছিলাম।"

আমি আমার চিন্তিত মায়ের হাতে ফোন দিয়ে দিলাম। তিনি সেটা নিয়ে ধোঁয়ায় ভরপুর রান্নাঘরে চলে গেলেন। খাবার পুড়ে গিয়েছিল। এদিকে আমি আইটি প্রতিনিধির আমার ব্যাপারে বলা কিছু প্রশংসাসূচক কথা ভাবছিলাম। এই কথাগুলোর জন্য আমার মনে থাকা শাস্তির ভয় জানালা দিয়ে পালিয়ে গেল।

অসম্পূর্ণ

হাইস্কুল জীবনের কথা আমার খুব বেশি মনে নেই। কারণ এর পুরোটা সময়ই আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। কম্পিউটারের সাথে নির্ঘুম রাত কাটাতাম আর দিনে সব ঘুম পুষিয়ে নিতাম। অ্যারেন্ডেল হাই স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষকই আমার এই একটুআধটু ঘুমের অভ্যাস নিয়ে তেমন কিছু মনে করতেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি নাক ডাকা শুরু করেছি ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোতে দিতেন। তাও কিছু নির্দয় শিক্ষক ছিলেন যারা চক বা ইরেজার দিয়ে প্রবল শব্দ করে আমাকে ঘুম থেকে জাগাতেন। তারপর তাদের ঝটপট প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন, "তো আপনি কী মনে করেন, মি. স্নোডেন?"

আমি হাই তুলতে তুলতে টেবিল থেকে মাথাটা উঠিয়ে বসতাম আর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করতাম। আমার ক্লাসমেটরা মুখ চেপে হাসত। সত্যি বলতে, এই মুহূর্তগুলো আমার খুব ভালো লাগত। স্কুল লাইফে এগুলোই ছিল আমার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ঢুলুঢুলু চোখে হতবুদ্ধি অবস্থায় এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে আমার মন্দ লাগত না। ত্রিশ জোড়া চোখ ও কান আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমার কথা শুনছে আর মনে মনে আমার ব্যর্থ হওয়ার আশা করছে। দেখা যেত বোর্ডের অর্ধেক লিখাই মুছে ফেলা হয়েছে। তবু আমি ঝটপট তাকিয়ে উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করতাম। তাড়াতাড়ি যদি আমি কোনো উত্তর দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমি স্কুলে একজন লিজেন্ড হয়ে যাব। উত্তর দিতে একটু দেরি হলে একটু মজা করে সবাইকে হাসাতাম। তবে যখন কোনো কিছুই পারতাম না তখন ক্লাসমেটরা আমাকে বোকা ভাবত। যা খুশি ভাবুক। মানুষ সুযোগ পেলে মাঝেমধ্যে অবমূল্যায়ন করবেই। তারা অন্যের বুদ্ধি ও যোগ্যতাকে অপমান করে নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্যই। তাদেরকে সমালোচনা করার সুযোগ দেয়া উচিত যাতে আপনি আপনার দুর্বলতা কাটিয়ে নিজেকে উন্নত করতে পারেন।

কৈশোরকালে আমি ভাবতাম জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো বাইনারি। যেখানে একটিমাত্র উত্তর সঠিক হবে, বাকি সব ভুল। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর এই বিষয়টা আমার খুব ভালো লাগত। এর উত্তর দুটি উপায়ের যেকোনো একভাবে দিতে হবে ১ অথবা ০। অর্থাৎ হ্যাঁ অথবা না, সত্যি অথবা মিথ্যা। কুইজের ক্ষেত্রেও বাইনারির এই যুক্তি খাটত।

সম্ভাব্য উত্তরগুলো থেকে তৎক্ষণাৎ সঠিক উত্তর না পেলে "সর্বদা" বা "কখনোই নয়" এরকম ব্যতিক্রম উত্তর অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতাম।

বছরের শেষদিকে খুব ভিন্ন ধরনের এক এসাইনমেন্ট পেলাম। পেনসিল দিয়ে গোল্লা ভরাট করে এর উত্তর দেয়া যাবে না। এটি ছিল ইংলিশ ক্লাসের একটি এসাইনমেন্ট। এক হাজার শব্দের মধ্যে আত্মজীবনী লিখতে হবে। এমন

একটা বিষয়ে আমার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে বলা হচ্ছিল যে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এখানে আমাকে, আমার নিজেকে নিয়ে লিখতে হবে। আমার মাথা চিন্তাভাবনা করা বন্ধ করে দিল। আমি কিছুই লিখতে পারলাম না। শিক্ষক আমার খাতায় লিখে দিলেন, 'অসম্পূর্ণ'।

সেই সময়টায় আমি ব্যক্তিগত সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। নিজেকে নিয়ে লেখার মতো কিছুই ছিল না। আমার জীবনটাই তখন ছিল খুব বিভ্রান্তিকর। কারণ আমাদের পরিবার ভেঙে যাচ্ছিল। আমার বাবা-মার ডিভোর্স হতে যাচ্ছিল। ঘটনাগুলো খুব তাড়াতাড়ি ঘটল। বাবা বাসা ছেড়ে চলে গেলেন। মা ক্রফটনের বাসাটা বেঁচে দিলেন। আমাকে আর আমার বোনকে নিয়ে উঠলেন একটি এপার্টমেন্টে। তারপর আমাদেরকে নিয়ে এলিকট সিটির পাশেই একটি কন্ডোমিনিয়ামে উঠলেন। আমার বন্ধুবান্ধব আমাকে বলেছিল, বাবা-মার যেকোনো একজন জীবন থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত বা নিজে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবে তুমি প্রাপ্তবয়স্ক নও। কিন্তু কেউ আমাকে এটা বলেনি যে, একটা নির্দিষ্ট বয়সে এসে একটা বাচ্চার জন্য ডিভোর্স মানেই ছিল একসাথে উপরোক্ত এই দুটো বিষয়ের মুখোমুখি হওয়া। হুট করে নিজের আদর্শ হিসেবে কল্পনা করা খুব কাছের মানুষগুলো জীবন থেকে চলে গেল। কান্না ও অস্থিরতার মাঝে আশ্বাস খুঁজছিলাম যে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না। ওই মুহূর্তে তো মোটেও না.

কোর্টে কাস্টডি ও দেখা করার অধিকারের ব্যাপারে নিষ্পত্তি হওয়ার পর আমার বোন কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করল। ভর্তি হলো উইলমিংটনের ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনায়। সে বাসা ছেড়ে চলে গেল। আমার বোন চলে যাওয়া মানে ছিল পরিবারে আমার সবচেয়ে কাছের মানুষটিকে হারিয়ে ফেলা।

আমি খুব চুপচাপ হয়ে গেলাম। যাদেরকে ভালোবাসতাম তাদের জন্য একেবারে অন্যরকম এক মুখোশধারী মানুষ হয়ে গেলাম। বাসায় আমি ছিলাম দায়িত্ববান ও বিশ্বাসযোগ্য। বন্ধুদের কাছে ছিলাম হাসিখুশি ও উদাসীন। কিন্তু যখন একা থাকতাম তখন ছিলাম একেবারে ভগ্ন, চিন্তিত। মানুষের ওপর বোঝা হয়ে যাবার চিন্তা আমাকে গ্রাস করত। নর্থ ক্যারোলিনার রাস্তায় বের হতেও আমার ভয় করত। পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের জন্য প্রতিটা ক্রিসমাসই খারাপ যেত। নিজের কোনো কাজই করতে চাইতাম না।

আমার ছেলেবেলার প্রতিটা খারাপ অভিজ্ঞতা আমার কাছে অপরাধ চিত্রের মতো মনে হয়। এ যেন সেসব অপরাধের প্রমাণ যার জন্য আমি দায়ী। এই অপরাধবোধ দূর করার জন্য নিজের আবেগকে এড়িয়ে গেলাম। নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট হওয়ার চেষ্টা করলাম। উপযুক্ত বয়সের আগেই যেন বড় হয়ে গেলাম। কম্পিউটারে খেলছি কথাটা না বলে বলতাম কম্পিউটারে কাজ করছি। শুধু শব্দগুলোর পরিবর্তন হলো। আমি এবং অন্যরা এক ভিন্ন আমাকে

গ্রহণ করতে শুরু করল। নিজেকে 'এডি' বলা বাদ দিয়ে 'এড' বলতাম একটি সেলফোন কিনলাম। সেটি বড়দের মতো আমার বেল্টের সাথে আটকিয়ে রাখতাম।

এই মানসিক আঘাত কিছু অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ নিয়ে এলো। নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। বাসার চার দেয়ালের বাইরের জীবনটাকে গ্রহণ করা শিখলাম। বাবা-মার সাথে আর নিজের সাথে আমার যত দূরত্ব বাড়তে থাকল ততই বন্ধুদের সাথে ঘনিষ্ঠ হলাম। তারা আমাকে মারামারি করতে শেখাল, মানুষের সামনে কথা বলা শেখাল, স্টেজে দাঁড়াতে শিখাল। তারা আমাকে মাথা উঁচু করে চলতে শেখাল।

হাইস্কুলে দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতে আমার ঘুম আগের চেয়ে আরো বেড়ে গেল। শুধু স্কুলেই নয়, বাসায় কম্পিউটার ব্যবহার করতে করতে ঘুমিয়ে যেতাম। মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে দেখতাম কম্পিউটার স্ক্রিনে হ-য-ব-র-ল কতগুলো লিখা। কারণ কী বোর্ডের উপরই ঘুমিয়ে পড়তাম। শীঘ্রই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা শুরু হলো আর ফুলে গেল। চোখের সাদা অংশ হলদেটে হয়ে গেল। বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েও বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চাইত না।

রক্ত পরীক্ষা করে ধরা পড়ল আমার মনোনিউক্লিওসিস রোগ হয়েছে। এটি একটি সংক্রামক রোগ। গুরুতর এই রোগটি ছিল আমার জন্য খুব অপমানজনক। কারণ এই রোগ ঘটত কারো সাথে ঘনিষ্ঠতাজনিত কারণে। যেটাকে আমার সহপাঠীরা বলত 'hooking up'। কিন্তু পনের বছর বয়সে আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠতা ছিল কম্পিউটার আর মডেমের সাথে।

স্কুলে একেবারেই যেতে পারলাম না। অনুপস্থিতি বাড়তে থাকল। এটার জন্য আমি মোটেও খুশি ছিলাম না। এমনকি সারাদিন আইসক্রিম ডায়েটের মধ্যে থেকেও খুশি হতে পারলাম না। কিছু করার মত শক্তিও আমার ছিল না বাবা-মা যে গেইমগুলো নিয়ে আসতেন সেগুলো খেলতাম। দুজনই প্রতিদিন কোনো-না কোনো নতুন গেইম নিয়ে আসতেন। তারা যেন নিজেদের ডিভোর্স নিয়ে অপরাধবোধকে দমন করার ও আমাকে সুস্থ করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত ছিলেন। একটি জয়স্টিক ধরার মতো শক্তিও যখন হারিয়ে ফেললাম তখন ভাবতাম আমি কেনই বা বেঁচে আছি। মাঝেমধ্যে জেগে ওঠার পর আমার আশপাশকেও চিনতে পারতাম না। অন্ধকারে আমার বুঝতে সময় লাগত আমি মায়ের বাসায় আছি নাকি বাবার বাসায়। কার বাসায় কখন যাচ্ছি এসবের কিছুই আমার মনে থাকত না।

প্রতিটা দিন ছিল একইরকম। প্রতিটা স্মৃতি ছিল আবছায়ার মতো আমার মনে আছে The Conscience of a Hacker যেটাকে The Hacker's Manifesto বলা হয়, নীল স্টিফেনসনের The Snow Crash এবং জে. আর. আর. টলকিনের বইগুলো পড়তে পড়তে ঘুমের জগতে হারিয়ে যেতাম। গল্পের চরিত্রগুলোর সংলাপ, তাদের কাজ বেমালুম ভুলে যেতাম। স্বপ্নে

দেখতাম গলুম আমার বিছানার পাশে এসে কানে কানে বলছে, "মাস্টার, মাস্টার সব খবর চারদিকে ছড়িয়ে দিন।" জ্বরের ঘোরে দেখা দুঃস্বপ্ন আমাকে ভয় পাইয়ে দিত। কিন্তু স্কুলের জমানো হোমওয়ার্ক করার চিন্তা আমার জন্য প্রকৃত দুঃস্বপ্ন ছিল। স্কুলে চার মাসের মতো অনুপস্থিত ছিলাম। অ্যারান্ডেল হাই স্কুল থেকে একটি মেইল এলো। তাতে বলা ছিল আমাকে আবার প্রথম থেকে হাই স্কুলের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু করতে হবে। মনে খুব কষ্ট পেলাম। যদিও জানতাম এরকম কিছুই ঘটবে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যে ভয়টা পাচ্ছিলাম সেটাই হলো। স্কুলে গিয়ে আবার প্রথম সেমিস্টার থেকে শুরু করার বিষয়টা আমি কল্পনা করতেও ভয় পাচ্ছিলাম। যেভাবেই হোক এই অবস্থা এড়িয়ে যেতে হবে।

শারীরিক রোগশোকের কারণে এমনিই হতাশ ছিলাম তার ওপর স্কুলের এই খবর আমাকে আরো গভীর হতাশায় ঠেলে দিল। হঠাৎ করে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পায়জামা না কি যেন একটা পরলাম। তারপর অনলাইনের জগতে খুঁজতে শুরু করলাম। কিছু একটা হ্যাক করতে হবে। বেশ খোঁজাখুঁজি করে অনেকগুলো ফর্ম পূরণ করলাম। যার উত্তর কিছুদিন পর মেইলবক্সে এসে জমা হলো। আমি নিজেকে কলেজে ভর্তি করিয়ে ছাড়লাম। স্পষ্টতই হাইস্কুল ডিপ্লোমার কোনো দরকার হয়নি।

অ্যানে অ্যারান্ডেল কমিউনিটি কলেজ আমার বোনের কলেজের মতো স্বনামধন্য কোনো কলেজ নয়। এটি স্থানীয় একটি কলেজ। কলেজে ভর্তির অফার লেটারটি আমার হাইস্কুল প্রশাসনের কাছে নিয়ে গেলে তারা বেশ অবাক হলেন, খুশিও হলেন। আমাকে কলেজ ভর্তির সম্মতিপত্র দিয়ে দিলেন। কলেজে ক্লাস করতাম সপ্তাহে মাত্র দুদিন।

এটাই উপযুক্ত মনে হলো। আমার গ্রেড লেভেলের চেয়ে অতিরিক্ত ক্লাস করে কষ্ট করার কী দরকার। কলেজটি আমার বাসা থেকে ২৫ মিনিট দূরত্বে ছিল। আমি নিজে ড্রাইভ করে যাওয়া ছিল বেশ বিপজ্জনক। কারণ প্রায়ই ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে যেত। ক্লাসে যেতাম আর বাসায় এসেই ঘুমিয়ে পড়তাম। ক্লাসে কিংবা বলা যায় পুরো স্কুলে আমিই ছিলাম সবচেয়ে কমবয়সি শিক্ষার্থী। কলেজে আমার উপস্থিতি ছিল অনেকটা অমাবস্যার চাঁদের মতো। শারীরিকভাবেও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম। তাই খুব একটা ঘুরতে বের হতাম না। কলেজটি বাসার বেশ কাছে হওয়ায় আলাদা কোনো ক্যাম্পাস লাইফ বলতে কিছু ছিল না। কলেজ ও ক্লাস দুইটাই আমার সাথে বেশ মানাচ্ছিল। অ্যারান্ডেল হাই স্কুলের ঘুমের চেয়েও এর অনেক কিছুই ছিল বেশ মজাদার।

****

হাইস্কুল জীবনের গল্প শেষ করার আগে বলতে চাই, আমি সেই ইংলিশ ক্লাসের আত্মজীবনী লেখার এসাইনমেন্টের কাছে কৃতজ্ঞ। যেটা ছিল অসম্পূর্ণ। যত বড় হয়েছি তত এটা নিয়ে ভেবেছি। আত্মজীবনী লেখা মোটেও সহজ কাজ নয়। মূলত, আমার মতো জীবনের কারো জন্য আত্মজীবনী লেখা মোটেই সুখকর কিছু নয়। জীবনের বেশ কতকটা সময় নিজের পরিচয় লুকোতে লুকোতে শেষ পর্যন্ত একটি বইয়ে তা উন্মোচন করে দিলাম।

গোয়েন্দা কমিউনিটির কর্মীরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে চলে, ছদ্মবেশ ও গোপনীয়তার আড়ালে তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় অনেকটা সাদা পৃষ্ঠার মতো। সবার মধ্যে, সবার সাথে থেকেও কীভাবে নিজেকে আড়াল করে রাখা যায় তারা সেটা আয়ত্ত করে ফেলে। অন্য সবার মতোই সাধারণ বাড়িতে থাকছে, সাধারণ গাড়ি চালাচ্ছে, সাধারণ কাপড় পরছে। কিন্তু পার্থক্য হলো, এটা তারা জেনেশুনে করছে। সাধারণ জীবনটা হলো তাদের জন্য একটা পর্দার মতো। এটা এমন এক পেশা যেখানে নিজের প্রকৃত চরিত্রকে স্বীকার করা হয় না। নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করারও কোনো সুযোগ নেই এখানে। চরিত্রের এই বিভিন্নতাকে এনক্রিপশনের মতো মনে হয়। এনক্রিপশনের ক্ষেত্রে চরিত্রের মূল উপাদানের অস্তিত্ব থাকে কিন্তু সেটা থাকে লুক্কায়িত। অনেকটা তালাবদ্ধ করে রাখার মতো। অন্যের ব্যাপারে যত বেশি জানতে থাকবেন, নিজের ব্যাপারে ততই ভুলতে থাকবেন। ভুলতে থাকবেন আপনার পছন্দ-অপছন্দ। আপনি আপনার রাজনৈতিক চিন্তা ও এর প্রতি সব সম্মানও হারিয়ে ফেলবেন। এটি এমন এক কাজ যেখানে নিজের চরিত্রকে এড়িয়ে যাবার সাথে নিজের বিবেককেও এড়িয়ে যেতে হয়। মিশন হয়ে যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এভাবে বেশ কয়েক বছর নিষ্ঠার সাথে নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখলাম। অথবা বলা যায় এটা করতে আমি বাধ্য ছিলাম। আমি যখন আমার ইংলিশ ক্লাসের এসাইনমেন্টটি দিতে ব্যর্থ হয়েছিলাম তখন আমি কোনো গোয়েন্দা ছিলাম না। আমার তখন দাড়িও গজায়নি। আমি একটা বাচ্চাছেলে ছিলাম। কিছু সময়ের জন্য গেইমের মধ্যে গোয়েন্দাচরিত্রে অভিনয় করতাম তবে আমার বাবা-মায়ের বিবাহবিচ্ছেদের পরে যে স্বাভাবিক আচরণ এবং মিথ্যা হাসি ঝুলিয়ে রাখতাম তার মোকাবিলায় এসব কিছুই না।

বাবা-মার বিচ্ছেদের সাথে আমরা পরিবারের সবাই কথা গোপন রাখার বিষয়টা শিখে গেলাম। কথা কীভাবে লুকিয়ে রাখতে হয়, এড়িয়ে যেতে হয় তা আমাদের জানা হয়ে গেল। আমাদের বাবা-মা একজন আরেকজন থেকে আর আমরা দুই ভাইবোন থেকে অনেক কথা গোপন রাখতেন।

আমি আর আমার বোনও লুকোচুরি শিখে গেলাম। আমরা দুই ভাই-বোন ছুটির দিনে কেউ বাবার সাথে আর কেউ মায়ের সাথে থাকতে যেতাম। ভগ্ন পরিবারের সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো যখন বাবা-মা একজন আরেকজনের জীবন কেমন চলছে তা আমাদের থেকে জানতে চান।

মা তখন তাদের সংসারজীবনের স্মৃতিতে চলে যেতেন। বাবা খুব শূন্যতা অনুভব করতেন। আবার মাঝেমধ্যে ডিভোর্সের দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া নিয়ে রাগারাগি করতেন। তখন মনে হতো আমাদের চরিত্রগুলো পাল্টে গেছে। আমাকে এখন তার সাথে অভিভাবকের মতো আচরণ করতে হবে।

এসব লিখা আমার জন্য বেদনাদায়ক। যদিও এত বেশি বেদনাদায়ক নয়। কারণ সেই সময়ের ঘটনা তেমন একটা মনে নেই। বেদনাদায়ক বললাম কারণ লিখে কোনোভাবেই আমার বাবা-মার একে অন্যের প্রতি সম্মানের বিষয়টা বুঝানো যাবে না। তাদের সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কারণে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের মতপার্থক্যগুলো কবর দিয়েছিলেন এবং পৃথকভাবে শান্তিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

এরকম পরিবর্তন হলো চলমান পরিবর্তন। কিন্তু আত্মজীবনীকে পরিবর্তন করা যায় না। এটি হচ্ছে পরিবর্তনশীল মানুষের জীবনের অপরিবর্তনশীল তথ্য।

আমি কলেজে উচ্চশিক্ষা নেয়ার জন্য ভর্তি হইনি। আমার চলমান পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু নিজেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম অন্তত হাইস্কুল ডিগ্রিটা অর্জন করব।

অবশেষে এই প্রতিশ্রুতিটি রেখে বাল্টিমোরের নিকটবর্তী একটি পাবলিক স্কুলে গিয়ে মেরিল্যান্ড রাজ্যের হয়ে পরীক্ষা দিই। জেনারেল এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট (জিইডি) ডিগ্রির জন্য এই পরীক্ষাটি মার্কিন সরকার হাইস্কুল ডিপ্লোমার সমমান মনে করে। পরীক্ষা দিয়ে বের হবার পর নিজেকে খুব হালকা লাগছিল। এটা ছিল হ্যাকের চেয়েও বেশি কিছু। কারণ আমি আমার নিজেকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রেখেছিলাম।

৯/১১

১৬ বছর বয়স থেকে আমি একাই বাসায় থাকতাম। মা উনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমি আমার নিজের সময়টা বিভিন্ন কাজে ভাগ করে নিলাম। নিজেই নিজের খাবার রান্না করতাম, নিজের কাপড় ধুঁয়ে দিতাম। বিল পরিশোধ ছাড়া সব কাজের দায়িত্বই পালন করতাম। আমার একটা '1992 White Honda Civic' ছিল। ওটা চালিয়ে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতাম। 99.1 WHFS শুনতাম। "এখন শুনুন"–এটির বেশ জনপ্রিয় একটি বাক্য ছিল।

আমার জীবন একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে চলে এসেছিল। বাসা, কলেজ, বন্ধুবান্ধব আর জাপানিজ ক্লাস, এতটুকুই। ওই ক্লাসে বেশ কজন বন্ধু জুটে গেল। আমার ঠিক মনে নেই কীভাবে যেন আমাদের একটা গ্রুপ তৈরি হয়ে গেল। দ্বিতীয় সেমিস্টারে ভাষা শেখার চাইতে বরং একে অন্যকে দেখার জন্যই ক্লাসে যেতাম। আমার চারপাশে আমার মতোই অদ্ভুত মানুষজন ছিল। তাদের বেশিরভাগই ছিল চিত্রশিল্পী আর গ্রাফিক্স ডিজাইনার। তারা জাপানিজ এনিমেশন তৈরি করত। তাদের সাথে বন্ধুত্ব গভীর হওয়ার সাথে সাথে এনাইম জনরার সাথে আমার পরিচিতি বাড়ল। একটা পর্যায়ে Grave of the Fireflies, Revolutionary Girl Utena, Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, The Vision of Escaflowne, Rurouni Kenshin, Nausicaa of the Valley of the Wind, Trigun, The Slayers এবং আমার সবচেয়ে প্রিয় Ghost in the Shell- এর মতো এনাইম মুভির ব্যাপারে বেশ ভালো মতামত দেয়ার যোগ্য হলাম।

এই নতুন বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল পঁচিশ বছর বয়স্ক এক তরুণী। আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড়, ওর নাম ছিল ম্যায়। সে আমাদের সবার কাছে ছিল আদর্শ। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্পী ও শখের কসপ্লেয়ার। সে ছিল আমার জাপানি কনভার্সেশন পার্টনার। আমি এটা জেনে বেশ অবাক হলাম সে বেশ সফল ওয়েব ডিজাইন ব্যবসা করত। যেটাকে আমি বলতাম কাঠবিড়ালি ইন্ডাস্ট্রি। কারণ সে প্রায়ই তার পোষা কাঠবিড়ালিটাকে একটি চমৎকার বাক্সে করে নিয়ে আসত।

আমি কীভাবে ফ্রিল্যান্সার হলাম সেই গল্পটা বলি।

ম্যায়'র সাথে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের কাজ শুরু করি। ম্যায় তার ব্যবসায় তৎকালীন নগদ ৩০ ডলার প্রতি ঘণ্টা হারে আমাকে কাজ দিয়েছিল। তবে প্রশ্ন ছিল আমি আসলে কত ঘণ্টার হিসেবে বেতন পাব।

অবশ্য ম্যায় যদি তার হাসিটাকেই আমাকে পারিশ্রমিক হিসেবে দিত তাহলেও আমার চলত। কারণ আমি তার প্রেমে মজে ছিলাম। আমি কখনো এই বিষয়টা গোপন রাখার চেষ্টা করিনি। কারণ কাজের কোনো ডেডলাইন

আমি মিস করতাম না বা তাকে সাহায্য করার কোনো সুযোগও বাদ দিতাম না। ম্যায় কিছু মনে করত কিনা জানি না।

আমি খুব দ্রুত যেকোনো কাজ শিখে ফেলতে পারতাম। এই কাঠবিড়ালি ইন্ডাস্ট্রির ব্যবসায় অনলাইনে যেকোনো জায়গায় বসেই কাজ করতে পারতাম। তবে ম্যায় চাইত আমি তার অফিসে গিয়ে কাজ করি। তার অফিস মানে তার বাসা। একটি দোতলা বাসা। যেখানে সে আর তার স্বামী থাকত। তার স্বামী ছিল খুব পরিচ্ছন্নতাপ্রিয় ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তার নাম ছিল নর্ম।

হ্যাঁ, ম্যায় ছিল বিবাহিত। সে আর তার স্বামী যে দোতলা বাসায় থাকত সেটা ছিল ফোর্ট মিডের সাউথওয়েস্টার্ন প্রান্তে অবস্থিত সামরিক এলাকায়। নর্ম সেখানে এনএসএ'তে কাজ করত তাদের বিমানবাহিনীর ভাষাবিদ হিসেবে।

যদি আপনার বাড়িটি সামরিক এলাকায় সরকারি সম্পত্তি হয়ে থাকে তাহলে বাড়ির বাইরে ব্যবসা করা আইনসম্মত ছিল না। কিন্তু কিশোর হিসেবে একজন বিবাহিত মহিলার প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম; যে আবার আমার বসও ছিল। তাই আমি সেই নিয়মের প্রতি যথেষ্ট সৎ থাকতে পারলাম না।

তখন ফোর্ট মিড সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। এখন যদিও সেটা অকল্পনীয়। তখন সবখানে কাঁটাতার ঘেরা চেকপয়েন্ট আর ব্যারিকেড ছিল না। '92 Civic গাড়ি চালিয়ে, কাঁচ নামিয়ে, রেডিও অন করে পৃথিবীর সবচেয়ে গোপনীয় গোয়েন্দা বাহিনীর ঘাঁটিতে যেতে পারতাম।

কোনো গেটে আইডি কার্ড দেখাতে হতো না।

প্রতিটা বন্ধের দিন, জাপানিজ ক্লাস পরে এনএসএ হেডকোয়ার্টারের পেছনে ম্যায়-এর বাসায় এনাইম দেখতে যেতাম আর কমিক বানাতাম। এরকমই ছিল দিনগুলো। অতীতের সেই দিনগুলোতে প্রতিটি স্কুলের মাঠে আর সিচুয়েশনাল কমেডিতে বলতে শোনা যেত, 'দেশটা খুব উদার, তাই না?'

সকালে ম্যায় এর বাসায় যেতাম। নর্ম বাসায় ফিরার আগে পর্যন্ত ম্যায়-এর বাসায় থাকতাম। ম্যায়-এর সাথে আমি যে দুই বছর কাজ করেছি এর মধ্যে নর্ম এর সাথে যতবার দেখা হয়েছে সে আমার প্রতি খুব বিনয়ী, উদারমনস্ক ছিল। প্রথম প্রথম আমার কাছে মনে হতো সে হয়তো ভাবছে তার স্ত্রীকে আকর্ষণ করার মতো কোনো যোগ্যতা আমার নেই। তাই সে তার স্ত্রীকে আমার সাথে একা রেখে যেতে ভয় পেত না। কিন্তু একদিন তার নিশ্চিন্ত থাকার কারণ বুঝতে পারলাম। সে বাসা থেকে বের হচ্ছিল আর আমি বাসার ভেতরে যাচ্ছিলাম। তখন সে খুব ভদ্রভাবে বলল, বিছানার পাশের ড্রয়ারে একটি বন্দুক রাখা আছে।

ম্যায় আর আমার কাঠবিড়ালি ইন্ডাস্ট্রি ছিল সেই সময়ের, যখন কোম্পানিগুলোর ডট-কম ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছিল। ছোট ছোট এন্টারপ্রাইজগুলো দেউলিয়া হবার আগ পর্যন্ত একটি অন্যটির সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, তখন গাড়ি প্রস্তুতকারকরা ভালো বিজ্ঞাপন সংস্থা বা PR ফার্মকে তাদের ওয়েবসাইট বানানোর কাজ দিত আর নিজেদেরকে ইন্টারনেটে আরো উন্নতরূপে উপস্থাপন করত।

বড় সংস্থাগুলো ওয়েবসাইট তৈরির বিষয়ে কিছুই জানত না। বিজ্ঞাপন সংস্থা বা PR ফার্ম কিছুটা অবশ্য জানত। তাও সেটা ফ্রিল্যান্স ওয়ার্ক পোর্টালগুলোতে কোনো কাজের জন্য ওয়েব ডিজাইনারের খোঁজ করার মধ্যেই যথেষ্ট ছিল।

এদিকে একজন বয়স্কা বিবাহিত নারী ও এই অবিবাহিত পুরুষের অনলাইনভিত্তিক কাজটি প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ খুঁজছিল। প্রতিযোগিতা ছিল ব্যাপক। এই কাজ করে যে টাকা পেতাম তাতে এই যুবকের নিজেরই চলত না। পরিবার চালানো তো বাদই দিলাম। এই অপমানের সাথে আরেকটি অপমানও ছিল। বলার মতো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম আমাদের ছিল না। কারণ বিজ্ঞাপন সংস্থাটি বাসার ভেতরেই গড়ে উঠেছে।

ম্যায়কে আমার বস হিসেবে পেয়ে ব্যাবসার দুনিয়া সম্পর্কে বেশ কিছু জানতে পারলাম। তখন এত বড় ইন্ডাস্ট্রিতে যেখানে ক্লায়েন্টরা ফ্রিতে কাজ করাতে চাইত সেখানে টিকে থাকার জন্য ম্যায় ছিল যথেষ্ট চতুর আর পরিশ্রমী। এই সংস্কৃতিতে টিকে থাকার জন্য ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন উপায় খুঁজছিল। ম্যায় ওয়ার্ক পোর্টালগুলোর সাথে তার সম্পর্ককে খুব দক্ষতার সাথে চালিয়ে যেত। সে তৃতীয় পক্ষকে উপেক্ষা করে সরাসরি ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ রাখত। আমি তাকে টেকনিক্যাল কাজে সাহায্য করায় সে ব্যবসা ও তার ছবি আঁকায় সময় দিতে পারত। সে তার ইলুস্ট্রেশনের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে লোগো ডিজাইন করত ও ব্রান্ডিংয়ের কাজ করত। আমি কোডিংয়ের কাজ করতাম যেটা আমার জন্য সহজ ছিল। কিন্তু বারবার একই কাজ আমার জন্য নিষ্ঠুরতা বলা চলে। তবু আমি তা হাসিমুখে করতাম। প্রতিদানের আশা না করে ভালোবাসার খাতিরে নিঃস্বার্থভাবে কিছু করতে পারা চমৎকার একটি ব্যাপার।

আমি চিন্তা করতাম ম্যায় তার প্রতি আমার অনুভূতি বুঝতে পেরেও আমাকে ব্যবহার করছে কী না। যদি এমনটা হয় তাহলেও সেটা আমার ইচ্ছাতেই হচ্ছে এবং তার সাথে আমার কাটানো সময়গুলো আর্থিকভাবেও সুবিধাজনক। তবু কাঠবিড়ালি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার সময়টায় আমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়েও ভেবেছি। তখন আইটি সেক্টরে প্রফেশনাল ইন্ডাস্ট্রি সার্টিফিকেটের বেশ কদর ছিল।

অনেক চাকরি চাইত আবেদনকারী আইবিএম ও সিসকোর মতো বড় প্রযুক্তিভিত্তিক কোম্পানি দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হবে। আমি যে রেডিও শুনতাম সেটাতে এই বিষয়টা প্রচার হতো। প্রায় শখানেকবার শোনার পরে একদিন কাজ শেষে বাসায় ফিরে এসে 1-800 নম্বরটি ডায়াল করে জনস হপকিন্স

বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউট এর মাইক্রোসফট সার্টিফিকেশন কোর্সে আবেদন করলাম। ব্যয়বহুল এই কোর্সটি জন হপকিন্স এর মূল ক্যাম্পাসে ছিল না। স্যাটেলাইট ক্যাম্পাসে ছিল। এটি মাইক্রোসফটকে আইটিতে দক্ষ লোকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার উপর শুল্ক আরোপ করার অনুমতি দেয়।

আর এদিকে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজাররা ভাবত এত ব্যয়বহুল সার্টিফিকেট আর 'জন হপকিন্স' নামটি সিভিতে ব্যবহার করে আমার মতো মানুষরা চাকরীতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ইন্ডাস্ট্রিগুলো যত দ্রুত সম্ভব সার্টিফিকেট অনুযায়ী নিয়োগ দিচ্ছিল। A+ এর মানে ছিল আপনি কম্পিউটার মেরামত করতে পারবেন। A পাওয়ার মানে ছিল আপনি বেসিক নেটওয়ার্কিং করতে পারবেন। কিন্তু এসব দিয়ে শুধু হেল্প ডেস্কে কাজ করা যাবে। সবচেয়ে মানসম্পন্ন সার্টিফিকেট ছিল মাইক্রোসফট সার্টিফাইড প্রফেশনাল সিরিজের অধীনে মাইক্রোসফট সার্টিফাইড সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ার ও মাইক্রোসফট সার্টিফাইড সিস্টেমস এডমিনিস্ট্রেটর হওয়া ছিল সোনার হরিণ পাবার মতো। এর স্টার্টিং স্যালারি ছিল বছরে চল্লিশ হাজার ডলার। সতের বছর বয়সি আমার জন্য এই টাকার অংক ছিল বিস্ময়কর। অবশ্য কেন নয়? মাইক্রোসফট প্রতিটি শেয়ারে একশত ডলার এর ব্যবসা করত আর বিল গেটসকে তখন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

MCSE অর্জন করা এত সহজ ছিল না। অসাধারণ জিনিয়াস হ্যাকারদের জন্যও এটি সহজ ব্যাপার নয়। এখানে সাতটি পরীক্ষা দিতে হতো। প্রতিটা পরীক্ষার ফিস একশত পঞ্চাশ ডলার করে। হপকিন্সে আঠারো হাজার ডলার দিয়ে যে প্রস্তুতি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম সেটা আমি শেষ করিনি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, হপকিন্সে রিফান্ড করার নিয়ম ছিল না।

আমার মাথার ওপর টিউশন লোন ছিল। তাই ম্যায়-এর সাথে আরো বেশি সময় কাটালাম টাকার জন্য। আমি তাকে বললাম আমাকে আরো বেশি ঘণ্টা কাজ দিতে। সে রাজি হলো। সকাল ৯ টা থেকে আসতে বলল। এই সময়টা একজন ফ্রিল্যান্সারের জন্য একটু বেশি জলদিই ছিল। তাই ওই মঙ্গলবারে আমি একটু দেরি করে ফেললাম।

রুট ৩২ দিয়ে সুন্দর নীল আকাশের নিচে খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। চেষ্টা করছিলাম যাতে এত দ্রুত গাড়ি চালানোর জন্য স্পিড ট্র্যাপে আটক হতে না হয়। জানালার কাঁচ নিচে নামিয়ে রেখেছিলাম। মনটা ছিল বেশ ফুরফুরে। দিনটাকে খুব ভালো মনে হলো। গাড়িতে বসে রেডিও অন করে খবরের অপেক্ষা করছিলাম।

ফোর্ট মিডের ক্যানাইন রোড দিয়ে শর্টকাটে যাবার জন্য মোড় নিতে যাব ঠিক তখনই, নিউইয়র্ক শহরে প্লেন ক্রাশের ঘটনা শুনতে পেলাম। ভাগ্য ভালো থাকায় ওইদিন ম্যায় এর বাসায় ৯.৩০ টার কিছু আগেই পৌছাতে পেরেছি।

ম্যায়-এর সাথে সিঁড়ি দিয়ে তার অফিসে ঢুকলাম। এটি তার বেডরুমের পাশের একটি ছোট্ট রুম। রুমে তেমন কিছু নেই। শুধু আমাদের দুজনের জন্য পাশাপাশি দুটো ডেস্ক, ম্যায়-এর আঁকা ছবির জন্য একটা ড্রইং টেবিল আর ওর কাঠবিড়ালিদের জন্য একটি খাঁচা রাখা থাকে।

কিছুক্ষণ আগে রেডিও তে প্লেন ক্রাশের খবর শুনে আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। কিন্তু কাজ তো করতেই হবে। তাই কাজে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করলাম। টেক্সট এডিটরে প্রজেক্টের ফাইলগুলো দেখছি আর হাতে ওয়েবসাইটের কোডগুলো লিখছি। এর মধ্যে ম্যায়-এর ফোন বেজে উঠল। ম্যায় ফোন ধরল।

"কী! তুমি সত্যি বলছো!"

যেহেতু ম্যায়-এর পাশাপাশি বসে ছিলাম তাই ফোনের ওপাশে তার স্বামীর গলা শোনা গেল। সে কাঁপা কাঁপা গলায় খুব জোরে কথা বলছিল। এদিকে ম্যায়-এর চেহারার রঙ বদলে গেল। সে তখনই কম্পিউটারে একটি খবরে সাইটে ঢুকল। বাসার একমাত্র টিভিটি ছিল নিচতলায়। সাইটের রিপোর্টটা দেখলাম, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ারের একটিতে বিমান হামলা হয়েছে। ম্যায় ফোন রেখে দিল।

সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আরেকটি প্লেন এইমাত্র অন্য টাওয়ারে হামলা করেছে।" ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভাবছিলাম এটা একটা দুর্ঘটনা।

ম্যায় বলল, "নর্ম বলছে সেনাঘাঁটির গেটগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে।"

"কী? সত্যিই গেট বন্ধ করে দেয়া হবে?"

আমি আমার বাসায় যাওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে গেলাম।

"নর্ম বলছে তোমার এখন বাসায় চলে যাওয়া উচিত। নয়তো আটকে যাবে।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কাজটাকে সেইভ করলাম। আমি চলে যাবার সময় আবার ফোন বেজে উঠল। এবার কথা আরো সংক্ষিপ্ত ছিল। ম্যায়-এর চেহারা একেবারে শুকিয়ে গেল। আতঙ্ক, বিশৃঙ্খলা হলো সন্ত্রাসবাদের সুপ্রাচীন ধরন। এতে একটি ব্যবস্থা ভেঙে যায় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সেইদিনের কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। পেন্টাগন অ্যাটাকের পর আমি এনএসএ হেডকোয়ার্টারের পাশের ক্যানাইন রোড দিয়ে বাসায় ফিরছিলাম। এজেন্সিটির টাওয়ারের কালো গ্লাসগুলোতে যেন রাজ্যের ভয় নেমে এসেছিল। চারদিকে শুধু শোরগোল, একটার পর একটা ফোনকলের আনাগোনা, পার্কিং লটে আর রাস্তায় চলছিল গাড়িগুলোর দ্রুত ফিরে যাবার প্রতিযোগিতা।

আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় এনএসএর হাজার হাজার কর্মী কাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। আমি মানুষের সেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

এনএসএ প্রধান মিশেল হেইডেন ভবন খালি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এনএসএ, সিআইএ ভবন খালি হয়ে গেল। ৯/১১তে তাদের হেডকোয়ার্টার থেকে জানাল সর্বশেষ ও চতুর্থ হাইজ্যাক করা বিমান United Airlines Flight 93 থেকে কোনো একটি এজেন্সি, হোয়াইট হাউস বা আইনসভাতে হামলা হতে পারে।

পরবর্তী টার্গেটের ব্যাপারে কিছু ভাবার অবস্থায় আমি ছিলাম না। চারিদিকে অগণিত গাড়ির হর্নের শব্দে আমার মাথায় আর কোনো চিন্তাই আসছিল না। এর আগে এরকম একটি সামরিক বাহিনী অধ্যুষিত এলাকাতে কোনো হর্ন শুনিনি। এদিকে দক্ষিণ টাওয়ারের ধ্বংসের খবর চলছিল। এর মধ্যে রেডিওর সিগনাল চলে গেল। একদিকে রেডিও সিগনাল চলে যাবার তীক্ষ্ণ শব্দ, আর অন্যদিকে ক্ষীপ্ত চালকরা তাদের ফোনে বারবার ডায়াল করেই যাচ্ছে।

আমি এখনো সেই অসহায়ত্ব অনুভব করি যখন নেটওয়ার্কের ওপর অতিরিক্ত চাপের জন্য আমার দেয়া কলগুলো কেটে যেত। পৃথিবীর সাথে যেন সম্পর্কে ছেদ পড়ে গেল।

এনএসএ'র স্পেশাল পুলিশ জ্যাম নিয়ন্ত্রণ করছিল। কিছু ঘণ্টা বা দিন বা সপ্তাহের মধ্যে তারা মেশিন গান সজ্জিত গাড়ি নিয়ে চেকপয়েন্ট, রাস্তা পাহারা দিতে শুরু করল।

এই নতুন নিরাপত্তা প্রহরার অনেক কিছুই স্থায়ী হয়ে গেল। কাঁটাতার, নজরদারি ক্যামেরা লাগানো হলো। এনএসএ-তে আমি কর্মরত হওয়ার আগে পর্যন্ত সামরিক এলাকায় যাওয়া, এনএসএ'র রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো এসব বেশ কঠিন হয়ে গেল। ৯/১১ এর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গড়ে তোলা এ কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা ম্যায়-এর সাথে আমার কাজ বন্ধ করার অন্যতম কারণ ছিল। সেই দিনের ঘটনা তাকে খুব নাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা একসাথে কাজ করা বন্ধ করে দিলাম। দূরত্ব বাড়তে লাগল। ওর সাথে খুব কম কথা হতো। এক সময় আবিষ্কার করলাম তার জন্য আমার অনুভূতি বদলে গেছে। আর আমিও বদলে গেছি। এরই মধ্যে ম্যায় নর্মকে ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেল। আমার কাছে তাকে খুব অপরিচিত মনে হলো।

৯/১২

আপনার পরিবারের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান কোনটি হতে পারে? ফ্যামিলি রিইউনিয়ন? কতজন মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়? হয়তো ৩০, ৫০? যদিও সবাই আপনার পরিবারের অংশ কিন্তু তাদের প্রত্যেককে একজন একজন করে জানার সুযোগ নিশ্চয়ই আপনার হয়নি।

ডানবার'স নাম্বার অনুযায়ী জীবনে ১৫০টি সম্পর্ক আপনি গুরুত্বের সাথে বজায় রাখতে পারবেন। এখন স্কুলের কথা চিন্তা করুন। আপনার প্রাইমারি স্কুলে কয়জন ছাত্রছাত্রী ছিল? হাইস্কুলে কতজন ছিল? তাদের মধ্যে কতজন আপনার বন্ধু ছিল? কতজন সহপাঠী ছিল? কতজনকে আপনি এখনো মনে রেখেছেন? আপনি যদি আমেরিকার কোনো স্কুলের হয়ে থাকেন, তাহলে মনে করুন এক হাজার। তাদের সবাইকে নিশ্চয়ই আপনি আপনার আপনজন বলবেন না। কিন্তু তবুও তাদের সাথে আপনার একটা বন্ধন অনুভব করবেন।

৯/১১ তে প্রায় তিন হাজার লোক মারা যায়। মনে করুন, আপনি যাদেরকে ভালোবাসেন, যাদেরকে আপনি জানেন, বা যারা আপনার কোনো না কোনো ভাবে পরিচিত তারা হঠাৎ করে জীবন থেকে হারিয়ে গেল। শূন্য ঘর, শূন্য স্কুল, শূন্য ক্লাসরুম। যে মানুষগুলোর সাথে আপনি উঠা-বসা করতেন, যে মানুষগুলো আপনার প্রতিটা দিনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল, তারা আর আপনার জীবনে নেই।

৯/১১ এর ঘটনা পরিবারে, সমাজে, কর্মক্ষেত্রে এরকম একটা ক্ষত তৈরি করে দিয়ে যায়। এখন বিবেচনা করুন, এই ঘটনায় আমেরিকার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১০ লক্ষ মানুষ নিহত হয়। ৯/১১ এর পর এই দুই দশক ধরে চলছে আমেরিকান ধ্বংসযজ্ঞ। গোপন নীতি, গোপন আইন, গোপন কোর্ট, গোপন যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে আমেরিকা নিজেকেও নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে। এসবের ভয়াবহ পরিণতি, এসবের অস্তিত্ব মার্কিন সরকার বারবার অস্বীকার করেছে। আমার জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেক কেটেছে আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে আর বাকি অর্ধেক নির্বাসনে। এ সময়ের মধ্যে আমি খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছি কীভাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সত্যকে মিথ্যা বানাত।

আমি জানি কীভাবে তথ্যকে বিকৃত করে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয় এবং তা বন্ধু, শত্রু এমনকি নিজের দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। যে আমেরিকা ভিন্ন মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত সেই আমেরিকায় এখন তার সামরিক বাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে 'Stop resisting' বলে মানুষের থেকে আনুগত্যের দাবি করে। আমেরিকার এই পরিবর্তন খুব কষ্টদায়ক।

এই দুই দশক কীভাবে কাটল তা ভাবতে গেলেই সেই সেপ্টেম্বরের ‘গ্রাউন্ড জিরো’ এবং পরবর্তীতে এর প্রভাবের দিকে তাকাই। সেই সময়ের দিকে ফিরে তাকানো মানে মিথ্যের চেয়েও অন্ধকার এক সত্যের সামনে দাঁড়ানো যা তালেবান থেকে আল-কায়েদা ও সাদ্দাম হোসেনের কল্পিত মারণাস্ত্র মজুদ রাখাকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে।

সেই হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন আমার তরুণ সময়ের পুরোটা জুড়ে চলছিল। এগুলো কেবল নির্বাহী বিভাগ এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতেই জন্ম নেয়নি বরং সমস্ত আমেরিকানদের অন্তরে, আমার অন্তরে জন্ম নিয়েছিল।

সেদিন নর্থ টাওয়ার ধসে পড়ার সময় ফোর্ট মিডের পথ দিয়ে অস্থিরভাবে দ্রুত ছুটে চলছিলাম। বারবার আমার পরিবারে ফোন দিচ্ছিলাম কিন্তু ফোন যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মাকে ফোন দিতে পারলাম। তিনি তখন এনএসএ'র জন্য কাজ করতেন না। তিনি বাল্টিমোরের ফেডারেল কোর্টে ক্লার্ক ছিলেন। সেই মুহূর্তে আমার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তাকে আশ্বস্ত করা।

“কোনো সমস্যা নেই। আমি ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের কেউ নিউইয়র্ক তো যাননি, তাই না?”

“আমি কিছুই জানি না। গ্র্যান এর কোনো খবর পাচ্ছি না।”

“পপ কী ওয়াশিংটনে?”

“আমি যতটুকু জানি তার এখন পেন্টাগনে থাকার কথা।”

এ কথা শুনে আমার যেন দম বেরিয়ে গেল। ২০০১ সালে পপ কোস্ট গার্ড থেকে রিটায়ার্ড হয়ে এফবিআই-এর বিমান বিভাগের সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগ দেন। তার মানে ওয়াশিংটন ডিসি ও এর আশপাশের এলাকাগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলোতে তার যাতায়াত ছিল।

আমি মাকে সাহস দেয়ার আগেই তিনি বললেন, “কেউ হয়তো ফোন করেছে। গ্র্যান হবে হয়তো। আমি রাখছি।”

তিনি আমাকে আবার ফোন না দেয়ায় আমি বেশ কয়েকবার ফোন দেয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ফোন যাচ্ছিল না। বাসায় গিয়ে টিভির সামনে বসে খবরের চ্যানেল দেখছিলাম আর মায়ের অপেক্ষা করছিলাম। সেল টাওয়ার, টেলিকম স্যাটেলাইটগুলো কাজ করছিল না কিন্তু বাসার নতুন ক্যাবল মডেমটা বেশ কার্যকর ছিল।

বাল্টিমোর থেকে বেশ কষ্টে মাকে বাসায় ফিরতে হলো। তিনি কান্না করছিলেন। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল যে পপ নিরাপদেই ছিলেন। পরবর্তীতে পপ আর গ্র্যান ক্রিস্টমাস আর নতুন বছর নিয়ে পরিকল্পনা করছিলেন। কিন্তু তারা পেন্টাগন নিয়ে কোনো কথা বলেননি।

বাবা আমাকে ৯/১১ এর কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছিলেন। যখন টাওয়ার দুটোতে হামলা করা হয় তখন তিনি কোস্ট গার্ড হেডকোয়ার্টারে

ছিলেন। তিনি ও আরো তিনজন অফিসার এই খবর দেখার জন্য অফিস থেকে ছুটে আসলেন। একজন তরুণ অফিসার হলরুমে দৌড়ে এসে বলল, "তারা পেন্টাগনে বোমা হামলা করেছে।" কেউ বিশ্বাস করছিল না দেখে সে আবার বলল, "আমি সত্যি বলছি। তারা পেন্টাগনে বোমা হামলা করেছে।"

বাবা তাড়াতাড়ি উঁচু একটি জানালা দিয়ে পেন্টাগনের দুই-পঞ্চমাংশ জুড়ে থাকা পটোম্যাকের দিকে তাকালেন। আকাশজুড়ে কালো ধোঁয়া মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। বাবা যখন সেদিনের কথা বলছিলেন তখন আমি একটা কথা শুনে কৌতুহলী হয়ে যেতাম- "তারা পেন্টাগনে বোমা হামলা করেছে"।

আমি ভাবতাম, তারা? তারা কারা?

আমেরিকা তখন সারা পৃথিবীকে 'তারা' এবং 'আমরা'তে ভাগ করে ফেলল। প্রেসিডেন্ট বুশের মন্তব্য অনুযায়ী সবাই হয় আমাদের সাথে নয়তো আমাদের বিপক্ষে। অথচ তখনো ধ্বংসস্তূপের আগুন থামেনি।

আমার এলাকায় মানুষজন নতুন পতাকা লাগিয়েছিল তারা কাদের পক্ষে আছে তা বোঝানোর জন্য। বাবা-মায়ের বাসায় যাবার পথে প্রতিটি হাইওয়েতে লাল, নীল, সাদা কাপ দিয়ে UNITED WE STAND এবং STAND TOGETHER NEVER FORGET লিখা ছিল।

যে বন্দুকগুলোতে ধুলোবালি পড়ে ছিল সেগুলোও বিক্রয় হতে শুরু করল। আমেরিকানরা নতুন সেলফোন কেনার জন্যও ভিড় করছিল। যাতে তারা হামলার আগেই খবর পেতে পারে অথবা হাইজ্যাক করা ফ্লাইট থেকে ফোনে বিদায় চেয়ে নিতে পারে।

আমি মাঝেমধ্যে শুটিং রেঞ্জে প্র্যাকটিস করতে যেতাম সেখানে পাগড়ি পরিহিত আরব পুরুষের প্রতিকৃতি নিশান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। প্রায় এক হাজারের মতো গোয়েন্দা তাদের কাজে ফিরে এলো এই অপরাধবোধের সাথে যে তারা তাদের মূল কাজে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কাজটা হচ্ছে আমেরিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অন্য সবার মতো তাদের মধ্যেও রাগ কাজ করছিল। কিন্তু এর সাথে অপরাধবোধও ছিল। তাদের জন্য এই ক্ষতি পুষানো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল।

এর মধ্যে তাদের বস'রা বিশেষ বাজেট, বিশেষ ক্ষমতার কথা বলে প্রচারণা চালাতে লাগলো। সন্ত্রাসবাদের হুমকিকে ব্যবহার করে তারা তাদের ক্ষমতা বাড়াতে চাচ্ছিল। আর তাদের নির্বাচনি বিধিমালায় এমন সব বিষয় উল্লেখ করছিল যা ছিল জনগণ এমনকি আইনপ্রণেতাদেরও চিন্তার বাইরে।

সেপ্টেম্বরের বারো তারিখ থেকে আমেরিকার জন্য নতুন যুগ শুরু হয়। দেশপ্রেমে নতুনভাবে উজ্জীবিত মানুষ দেশের স্বার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছিল আর বিভিন্ন দেশ থেকে পাচ্ছিল সান্ত্বনা ও সহানুভূতি। আমার দেশ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারত। এই ঐক্যকে ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং

বিশ্বের মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে পারত। কিন্তু এটি যুদ্ধের পথ বেছে নিল।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অনুশোচনা হলো আমি এই সিদ্ধান্তের প্রশ্নাতীত সমর্থন করেছি। আমি ক্ষুব্ধ ছিলাম। এটি সেই প্রক্রিয়ার সূচনা ছিল যাতে আমার মন আমার বিবেককে পুরোপুরি পরাজিত করে। আমি গণমাধ্যমের দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত দাবিকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমাদেরকেই জীবন দিয়ে মূল্য দিতে হচ্ছে। আমি মুক্তিদাতা হতে চেয়েছিলাম। আমি মুক্ত করতে চেয়েছিলাম নির্যাতিতকে। দেশের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সত্যকেই গ্রহণ করেছিলাম।

আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, অনলাইনে প্রাপ্ত আমার অপ্রাতিষ্ঠানিক হ্যাকার আদর্শ এবং আমার বাবা-মা থেকে পাওয়া অরাজনৈতিক দেশপ্রেমের আদর্শকে প্রতিহিংসা একেবারে খণ্ডবিখণ্ড করে দিল। কত সহজে সেই পরিবর্তন এলো আর আমি তা গ্রহণ করে ফেললাম এটা ভেবে এখন খুব অপমানিত বোধ করি।

৯/১১ এর পর আমি দেশের জন্য কিছু করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু দোটানায় ছিলাম। কারণ তা খুব বিরক্তিকর হতে পারে। আমার পরিচিত যারা দেশের জন্য কাজ করছিলেন তারা সবাই স্নায়ুযুদ্ধের পর বার্লিন দেয়ালের পতন ও ২০০১ এর হামলার সময়কালের মধ্যে দেশের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ওই সময় আমেরিকার শত্রু ছিল না। আমি যে আমেরিকায় বড় হয়েছি সেই আমেরিকা ছিল সুপার পাওয়ার। অন্তত আমার কাছে সবকিছু ছিল খুব উন্নত। অনলাইন ছাড়া নতুন কোনো অঞ্চল জয় করা বা জনগণের সমস্যা সমাধান করার মতো কিছুই ছিল না।

কিন্তু ৯/১১ এর হামলা সব বদলে দিল। শুরু হলো সংঘর্ষ।

আমার ইচ্ছা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। আমি ভাবলাম, আড়ালে থেকে আমি দেশের সেবা করতে পারি। এ অসম যুদ্ধের বিশ্বে আইটি পেশা খুব ভালো ও নিরাপদ হবে। আমার ইচ্ছে হতো মুভি বা টিভি সিরিজের হ্যাকারদের মতো কিছু করার। তারা শত্রুদের ট্র্যাক করে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিত।

দুর্ভাগ্যবশত, এনএসএ ও সিআইএ লোকবল নিয়োগ দিচ্ছিল সেই অর্ধশত বছর আগের লিখিত নিয়োগ চাহিদা অনুযায়ী। তারা চাইত কলেজ ডিগ্রি। এর মানে হলো প্রযুক্তিভিত্তিক সংস্থাগুলো আমার AACC ও MCSE সার্টিফিকেট গ্রহণ করলেও সরকার করবে না।

অনলাইনে যত বেশি পড়ালেখা করলাম বুঝতে পারলাম ৯/১১ পরের বিশ্বটা একেবারেই ভিন্ন। এজেন্সিগুলো খুব দ্রুত বেড়ে উঠছিল, বিশেষ করে তাদের প্রযুক্তিগত দিকটা। এর ফলে সামরিক ক্ষেত্রেও লোকবল নিয়োগের জন্য তারা ডিগ্রি চাহিদা বাদ দিল। ঠিক তখন আমি যোগ দেয়ার চিন্তা করি।

আপনারা হয়তো ভাবছেন, যেহেতু আমার পরিবার দেশের জন্য কাজ করেছেন। তাই আমার সিদ্ধান্তটাও উপযুক্ত ও স্বাভাবিক। কিন্তু মোটেও এরকম কিছু ছিল না। কারণ প্রতিটি শাখার নিয়োগদাতাদের সাথে কথা বলার পর আর্মিতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমার মাকে বলার পর তিনি দিনের পরদিন বসে কান্নাকাটি করলেন, বাবা বললেন ওখানে গিয়ে আমি আমার প্রযুক্তিগত মেধাকে নষ্ট করব। আমার বয়স তখন ছিল বিশ বছর। আমি ভালো করেই জানতাম আমি কী করছি।

আমার যাবার দিন, আমার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়ে বাবার উদ্দেশ্য একটি চিঠি লিখেছিলাম। হাতে লিখা চিঠিটা বাবার এপার্টমেন্টের দরজার নিচে দিয়ে রেখে আসলাম। তাতে লিখা কথাগুলো এখনো আমার অন্তরে নাড়া দেয়। আমি লিখেছিলাম, "আমি দুঃখিত, বাবা। এটি আমার ব্যক্তিগত বিকাশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।"

X-Rays

আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিলাম। কারণ এর আদর্শ আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করবে। সেখানে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বেশ ভালো মার্কস পেলাম। সেখানে বিশেষ বাহিনী 18 X-RAY তে সার্জেন্ট অফিসার হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমেরিকার বিভিন্ন ভয়ানক যুদ্ধে যারা নিয়োজিত ছিল সেসব ছোট ছোট ইউনিটের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এই বিশেষ সেনাদল গড়ে তোলা হয়। 18 X-RAY ছিল বিশেষভাবে গড়ে তোলা কর্মসূচী। ৯/১১ এর পর অধিকতর যোগ্য সেনা নির্ধারণ করার জন্য তাদের শক্তিমত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও ভাষাগত দক্ষতার উপর জোর দেয়া হয়। তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হতো। দ্রুত পদোন্নতি দেয়া হতো যাতে তারা সেনাবাহিনী ছেড়ে না দেয়। আমি নিজেকে বেশ কমাস থেকেই প্রস্তুত করছিলাম। স্বাস্থ্য বেশ ভালোই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দৌড়ানোর বিষয়টি আমার ভালো লাগল না।

আমার কাগজপত্র সব অনুমোদন করা হলো। আমি তালিকাভুক্ত হয়ে গেলাম। এইতো আমি পেরেছি! এই কর্মসূচিতে যোগদান করা প্রথম সেনা ছিলাম আমি। নিয়োগদাতা আমার বেশ প্রশংসা করল আর উৎসাহ দিয়ে বলল, প্রশিক্ষণের পরে হয়তো আমাকে এই ফোর্সের যোগাযোগ, কারিগরি বা গোয়েন্দা সার্জেন্ট বানিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু প্রথমে আমাকে জর্জিয়ার ফোর্ট বেনিং এ প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

ম্যারিল্যান্ড থেকে জর্জিয়া যাবার পথে বাস থেকে প্লেন, প্লেন থেকে বাস সবখানে একই ব্যক্তি আমার পাশে বসে ছিল। সে ছিল বিশাল ও আনুমানিক দুই থেকে তিনশ কেজি ওজনের বডিবিল্ডারের মতো দেখতে। সারাটা পথ সে শুধু কথাই বলেছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কীভাবে সে ড্রিল সার্জেন্টকে চড় মারবে, কীভাবে শরীর ফুলানোর জন্য আমার স্টেরয়েড নেয়া উচিত এসব বলেই যাচ্ছিল। আমার মনে হয় ফোর্ট বেনিং এর স্যান্ডহিল ট্রেনিং এরিয়াতে আসার আগে পর্যন্ত সে একটুও থামেনি। নাম যদিও স্যান্ডহিল বা বালির পাহাড় কিন্তু ওই এলাকায় যাবার পর কোথাও তেমন একটা বালি দেখতে পেলাম না।

ড্রিল সার্জেন্টরা খুব রাগী-রাগী ভাব নিয়ে আমাদের স্বাগত জানাল। আমরা যে ভুলগুলো করেছিলাম সেই অনুযায়ী আমাদের নাম রাখা হলো। যেমন, কেউ একজন বাস থেকে খুব রংচঙা ডেইজি ফুলের ডিজাইনের শার্ট পরে নেমেছিল। আবার একজনের নামকে একটু বিকৃত করে হাস্যকর বানিয়ে দেয়া হলো। এভাবেই আমি Snowden থেকে Snowflake হয়ে গেলাম। আর আমার সিটমেট হয়ে গেল ডেইজি। ডেইজি খুব শক্ত করে তার চোয়াল চেপে ধরত। তাই কেউ তাকে কিল ঘুষি মারার সাহস করত না।

একদিন ড্রিল সার্জেন্টরা খেয়াল করল ডেইজি ও আমার মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক আছে। আর আমার প্লাটুনের মধ্যে আমি সবচেয়ে হালকা। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি, একশত চব্বিশ পাউন্ড ওজন। আর ডেইজি সবচেয়ে ভারী। তারা ঠিক করল তারা যত জলদি সম্ভব আমাদেরকে একত্রিত করে মজা করবে। আমার এখনো মনে আছে সেই 'Buddy Carry' ব্যায়ামের কথা। ফুটবল মাঠের মতো দেখতে জায়গায় আমার আহত সাথীকে বিভিন্নভাবে কোলে নিয়ে দৌড়াতে হবে। কখনো কনের মতো, কখনো ফায়ারম্যানের মতো আবার কখনো 'নেক ড্রাগ' করে বা গলা টেনে।

যখন আমার ডেইজিকে উঠানোর পালা আসত তখন তার বিশাল শরীরের কারণে আমাকে দেখাই যেত না। মনে হতো ডেইজি শূন্যে ভাসছে। তার বিশাল শরীরের নিচে আমি ঘেমে একাকার হয়ে তাকে গালাগাল দিয়ে কোনোমতে মাঠের অপর পাশে টেনেটুনে নিয়ে যেতাম আর ধপাস করে লুটিয়ে পড়তাম। তারপর ডেইজি হাসতে হাসতে আমাকে তার ঘাড়ের উপর পাতলা টাওয়ালের মতো উঠিয়ে নিত। দেখে মনে হতো বাচ্চা একটি ছেলে জঙ্গলের ভিতর মনের আনন্দে দৌড়াচ্ছে।

সবসময় আমাদের শরীর নোংরা থাকত বা শরীরে কোনো আঘাত থাকত। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমার পাতলা শরীর যা একাসময় অভিশাপ মনে হতো তা আশীর্বাদ হয়ে ধরা দিল। বেশিরভাগ সময়ই আমরা শারীরিক অনুশীলন করতাম। ডেইজি দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারত না কিন্তু আমি শিম্পাঞ্জির মতো বেয়ে বেয়ে উঠে যেতাম। ডেইজি পুলআপের সময় লোহার বারে ধরে তার বিশাল দেহটাকে উপরে টেনে নিতে পারত না। আমি এটা দুবারের মতো করে ফেলতে পারতাম এক হাতেই। সে কোনোমতে পুশ আপ করত। একটু পুশআপ করার পরই তার ঘাম বের হয়ে যেত। আমি সেটা হাতের তালুর উপর বা বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়েই করে ফেলতে পারতাম। দুই মিনিটের পুশআপ টেস্টে আমার স্কোর বেশি হওয়ার তাড়াতাড়ি থামিয়ে দেয়া হতো।

আমরা যেখানেই যেতাম দৌড়াতেই থাকতাম। মাইলের পর মাইল রাস্তা, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে শুধু দৌড়াতাম। এদিকে ড্রিল সার্জেন্টের মুখে ধ্বনিত হতো,

I went to the desert
where the terrorists run
pulled out my machete
pulled out my gun.

Left, right, left, right—kill kill kill!
Mess with us and you know we will!

I went to the caves

where the terrorists hide
pulled out a grenade
and threw it inside.

Left, right, left, right—kill kill kill!
Mess with us and you know we will!

এভাবে প্রতিধ্বনি করে দৌড়ানো মনকে শান্ত করে তোলে। কারণ এটি আপনাকে আর আপনার মধ্যে থাকতে দেয় না। আপনার নিজের চিৎকার ও অন্যদের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি আপনার কানে গিয়ে আপনার চোখকে সামনে রানারের পদক্ষেপগুলো দেখতে বাধ্য করে। কিছুক্ষণ পরে আপনি আর কিছুই ভাববেন না, আপনি কেবল শুনতে থাকবেন। সারি সারি সৈন্যের সাথে মাইলের পর মাইল ছাড়িয়ে চলতে থাকবেন। ক্লান্তি ভর না করা পর্যন্ত এটা ছিল শান্তিদায়ক। এটাই সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। ড্রিল সার্জেন্টকে ভয়ের কারণে নয় বরং ক্লান্তির কারণে কেউ তার মুখে চড় মারতে চাইত না। সেনাবাহিনী তার যোদ্ধাদের ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিত যে পর্যন্ত তারা ক্লান্তি ও দুর্বলতাবোধ না করে। ক্লান্তির কারণে আদেশ মান্য করা ছাড়া তারা আর কিছুই করতে পারত না। ব্যারাকে আমরা শুধু রাতেই অবকাশ পেতাম। 'The Star-Spangled Banner' গাইতাম। ডেইজি প্রায়ই গানের লাইন ভুলে যেত। সে সুরও বুঝতে পারত না।

কিছু সৈন্য বেশ রাত জেগে গল্প করত। তারা একে অন্যকে বলত তার ওসামা বিন লাদেনকে পেলে কী করবে। তারা সবাই বিশ্বাস করত যে তারা সবাই তাকে আটক করবে। তাদের বেশিরভাগ চিন্তাভাবনাই মাথা কেটে ফেলা, যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা এসবেই ঘুরপাক খেত। এদিকে আমি স্বপ্ন দেখতাম আমি দৌড়াচ্ছি। সতেজ জর্জিয়ার ভূমিতে নয়। বরং মরুভূমিতে।

তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে আমরা 'ল্যান্ড নেভিগেশন' করতে বের হলাম। এতে আমাদের প্লাটুন কোনো জঙ্গলে গিয়ে দলে দলে ভাগ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কোনো জিপিএস নেই, শুধু কম্পাস ও ম্যাপ এর সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে হতো। পথে কোথাও উঁচু পাথরে আরোহন করতে হতো বা ঝর্ণা অতিক্রম করতে হতো। এরকম আমরা আগেও করেছি। কিন্তু এভাবে পঞ্চাশ পাউন্ড ওজনের যন্ত্রপাতির ব্যাগ পিঠে নিয়ে করা হয়নি। তার চেয়েও বাজে ব্যাপার হলো আমাকে যে বুট দেয়া হয়েছিল তা এত বড় ছিল যে আমি এগুলোর উপর যেন ভেসে রইলাম। পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। এসব নিয়েই লাফিয়ে যাচ্ছিলাম।

এক পর্যায়ে, আমি ঝড়ে উপচে পড়া ধনুকের মতো বাঁকা একটি গাছের উপর দিয়ে চলছিলাম। যাতে আমি দিগন্ত বরাবর গুলি করে আমাদের অবস্থান বুঝে নিতে পারি। আমাদের গতিবিধি বুঝে নেয়ার পর আমি নিচে লাফ দিয়ে

নামার জন্য পা বাড়ানোর সাথে সাথেই দেখি আমার পায়ের নিচে একটি সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। আমি প্রকৃতিবিদ নই তাই এটা কোন প্রজাতির সাপ বুঝতে পারিনি। আমি কোনো কিছুরই পরোয়া করলাম না। নর্থ ক্যারোলিনার শিশুদের বলা হতো সাপ খুব বিষাক্ত হয়। আমি ওসব নিয়ে ভাবতে গিয়ে ভয় পেতে চাইনি।

এক পা, দু পা করে সাবধানে সামনে এগোতে থাকলাম। হঠাৎ করে নিচে পড়ে গেলাম। আমার পা সাপের একটু সামনেই আছড়ে পড়ল। তখন প্রচন্ড ব্যথা পেলাম। এটা সাপের বিষের চেয়েও মারাত্মক কষ্টদায়ক ছিল। আমি কোনোমতে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। মারাত্মক কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমাকে থামলে চলবে না। কারণ আমি জঙ্গলে আমার সেনাদলের সাথে ছিলাম। শক্তি জুগিয়ে, কষ্ট ভুলে left, right, left, right তালের সাথে চলতে থাকলাম। চলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুও মিশন শেষ করলাম। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ব্যারাকে ফিরে আসার পর পায়ে কোনো অনুভূতি পাচ্ছিলাম না। আমার বিছানাটা ছিল উপরে। কোনোভাবেই উঠতে পারছিলাম না। বেশ কষ্টে হাতে ভর দিয়ে উঠতে হলো।

পরদিন সকালে একটি কৌটার ঝনঝন শব্দে ঘুম ভাংলো। এর মানে ছিল কেউ ড্রিল সার্জেন্টের অপছন্দনীয় কোনো কাজ করেছে। আমি সাথে সাথে ঘুম থেকে উঠে বিছানার কিনারে ঝুলেই মাটিতে ঝাঁপ দিলাম। মাটিতে লাফ দেয়ার সাথেই লুটিয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিল আমার পা তার জায়গায় নেই। পাশের বিছানা ধরে হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যখন পায়ের উপর ভর দিলাম আবার পড়ে গেলাম। সবাই অট্টহাসি দিতে দিতে আমার চারপাশে জড়ো হলো। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই চিন্তিত হয়ে গেল। তারপরে একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল।

ড্রিল সার্জেন্ট বলল, 'এই শালা, কী হয়েছে তোর? জলদি মাটি থেকে উঠ নয়তো মাটিতে মিশিয়ে দিব।'

আমি তার আদেশ মানতে গিয়ে উঠার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমার চেহারায় যন্ত্রণা লক্ষ্য করে সে আমাকে থামিয়ে দিল।

'ডেইজি স্নোফ্লেইককে বেঞ্চে একটু শোয়াও তো।'

তারপর সে আমার উপর উপুড় হয়ে একটু ধীরে কর্কশ গলায় বলল, 'তুমি তোমার ভাঙা পা নিয়ে ক্রাচে ভর দিয়ে Sick Call-এ যাবে।' 'Sick Call' যেখানে আহত সেনা সদস্যদের মূলত চিকিৎসার বদলে নির্যাতন করা হয়।

সেনাবাহিনীতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়াকে সুনজরে দেখা হয় না। কারণ সেনাবাহিনী চায় তার সেনারা অপরাজেয় হোক। আর তাছাড়া সেনাবাহিনী চায়

না তার উপর ভুল ট্রেনিংয়ের অভিযোগ আসুক। এ কারণেই ট্রেনিংয়ে আঘাতপ্রাপ্ত সেনাদের দুর্বল ও নেতিবাচকভাবে দেখা হয়।

আমাকে বেঞ্চে শুইয়ে ডেইজি চলে গেল। আমার মতো আহত সেনাদের আলাদা করে রাখা হলো। আমরা যেন ছিলাম অচ্ছুত কুষ্ঠরোগীর মতো। কারো পা মোচড়ে গেছে, কারো পায়ের গোড়ালি ভেঙে গিয়েছে, কাউকে বিষাক্ত মাকড়সা কামড় দিয়েছে। আমার সাথে আরো যুদ্ধসাথী ছিল। যুদ্ধসাথী বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা আপনি যেখানে যাবেন আপনার সাথে তারাও যাবে। কারণ আর্মিতে একা থাকা মানে চিন্তিত হওয়া। আর চিন্তিত হলে অনেক সমস্যা হতে পারে।

আমার যুদ্ধসাথী ছিল সুন্দর, সুদর্শন এক ছেলে যে এক সপ্তাহ আগে তার কোমর ভেঙেছে। কিন্তু ব্যথা সহ্যের বাইরে যাবার আগে পর্যন্ত সে তা প্রকাশ করেনি। আমরা কেউই কারো সাথে কথা বলার মতো অবস্থায় ছিলাম না। ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে লেফট, রাইট, লেফট, রাইট করতে করতে এগিয়ে গেলাম।

হসপিটালে আমার এক্স-রে করা হলো। দেখা গেল পায়ের টিবিয়াতে ফাটল দেখা দিয়েছে। সময়ের সাথে তা হাড়ের উপরিভাগে ফাটলকে আরো গভীর করে হাড় ভেঙে দিতে পারে। পা ভালো করার জন্য আমাকে হাঁটাচলা বন্ধ করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমাকে আবার ব্যাটেলিয়নে ফিরিয়ে যেতে বলা হয়।

কিন্তু আমি তখনই যেতে পারলাম না। আমার যুদ্ধসাথীর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সে আমার পরে এক্স-রে রুমে গিয়েছিল। বেশ কয়েক ঘণ্টা আমি তার অপেক্ষা করলাম। আমার সময়টা কাটালাম সংবাদপত্র আর ম্যাগাজিন পড়তে পড়তে। ট্রেনিং এ আগত সেনাদের জন্য এটি ছিল বিলাসিতা।

একটু পর নার্স এসে বলল আমার ড্রিল সার্জেন্ট ফোন দিয়েছেন। ফোনটা কানে নিতেই সে রেগে বলল, 'স্নোফ্লেইক, তুমি বেশ আনন্দ নিয়ে ম্যাগাজিন পড়ছ তাই না। তোমার জন্য পুডিং পাঠাব? তোমরা দুই অপদার্থ এখনো বের হওনি কেনো?'

'ড্রিল সার্ন (জর্জিয়াতে এভাবেই সম্বোধন করা হয়) আমি আমার যুদ্ধসাথীর অপেক্ষা করছি।'

'সে কোথায়, স্নোফ্লেইক?'

"ড্রিল সার্ন, আমি বলতে পারছি না। সে পরীক্ষার জন্য গিয়েছিল, কিন্তু এখনো বাইরে আসেনি।"

আমার উত্তরে ড্রিল সার্জেন্ট খুশি হয়নি। আরো জোরে চিৎকার করে বলল, "শালা, তো তুমি বসে বসে কী করছ? যাও, তাকে খুঁজো।"

আমি ক্রাচে ভর দিয়ে কাউন্টারে গেলাম। তারা বলল, আমার যুদ্ধসাথীর সার্জারি চলছে।

ড্রিল সার্জেন্টের থেকে অগণিত ফোন আসার পর সন্ধায় পরিস্থিতি বুঝতে পারলাম। আমার যুদ্ধসাথী এক সপ্তাহ থেকে ভাঙা কোমর নিয়ে চলছিল। শীঘ্রই সার্জারি করা না হলে সে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যেত। মূল নার্ভগুলো ছিড়ে যেত। কারণ হাড়ের ভাঙন ছিল ছুরির মতোই ধারালো।

আমি ফোর্ট বেনিং এ বেঞ্চে ফিরে গেলাম। তিন-চারদিনের বেশি বেঞ্চে থাকা মানেই বড় বিপদ। সুস্থ হবার আগেই সৈন্যকে জোর করে আবার প্রশিক্ষণে যেতে হতো। কিংবা আবার মেডিকেল ইউনিটে হস্তান্তর করে অতঃপর বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হতো।

এই মানুষগুলো অনেক স্বপ্ন নিয়ে সেনাবাহিনীতে আসত। কেউ আসত তাদের নিষ্ঠুর পরিবার, বিরক্তিকর চাকরি থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য। কিন্তু যখন তাদের পরাজয়ের জন্য এভাবে ফিরিয়ে দেয়া হতো তখন আবার তারা ভগ্ন হৃদয়ের অপূরণীয় ক্ষতির সাথে নাগরিক জীবনে ফিরে যেত।

দিনে বারো ঘণ্টা একটি ইটের দেয়ালের সামনে বেঞ্চে বসে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজ ছিল না। আমাদের ক্ষতের কারণে সেনাবাহিনীর জন্য আমাদেরকে অনুপযুক্ত ভাবা হতো। আমাদেরকে এড়িয়ে চলা হতো। ড্রিল সার্জেন্টরা ভয় পেত যে আমরা হয়তো অন্যদের মাঝে আমাদের দুর্বলতা ছড়িয়ে দিব। শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক শাস্তিটাই বেশি ছিল। বেশ কিছু আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলাম। জুলাই চার তারিখের আতশবাজি উৎসবটাও দেখার সুযোগ হয়নি। উল্টো সেই রাতে জনশূন্য ব্যারাকে আমাদেরকে বলা হলো জনশূন্য বিল্ডিং 'ফায়ার গার্ড' হিসেবে প্রহরা দিতে। যাতে কোথাও আগুন না লাগে।

এক শিফটে দুজন করে আমরা 'ফায়ার গার্ড' হিসেবে প্রহরা দিলাম। আমি অন্ধকার রাতে ক্র্যাচে ভর দিয়ে আমার পার্টনারের সাথে দাঁড়িয়ে রইলাম বেশ দায়িত্ববান সেনাদের মতো। সে বেশ মিষ্টি, সাধারণ, হৃষ্টপুষ্ট আঠারো বছর বয়সি ছেলে। তার আঘাত ছিল সন্দেহজনক, হয়তো স্বেচ্ছাকৃত। সে বলছিল, তার কখনো সেনাবাহিনীতে আসা উচিত হয়নি। দূরে আতশবাজি ফুটছিল, সে বলে যাচ্ছিল সে কত ভুল করেছে আর কতই না একাকিত্বে ভুগছিল। তার বাবা-মার কথা খুব মনে পড়ে। তাদের পারিবারিক ফার্মটা আপ্যালাচিয়ার বাইরে কোথাও ছিল।

আমার তাকে সহানুভূতি দেখানো ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তাকে চাপলেইনের সাথে কথা বলার পরামর্শ দিলাম। চাপলেইন বলতে বোঝায় কোনো প্রতিষ্ঠানের যাজক। তাকে বোঝালাম একটা সময় সে এসবে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরই সে খুব মায়া মায়া ভাব নিয়ে আমার সামনে এসে সরাসরি বলল, সে AWOL (Absent Without Leave) এর পথ বেছে নিচ্ছে।

এটি সেনাবাহিনীতে একটি অপরাধ। সে আমাকে এ ব্যাপারে কাউকে বলতে নিষেধ করল। ঠিক তখনই আমি তার সাথে কাপড় ভর্তি ব্যাগ খেয়াল করলাম। তার মানে সে এই মুহূর্তেই এখান থেকে পালিয়ে যাবে।

তাকে বোঝানো ছাড়া এই পরিস্থিতি কীভাবে সামলাব বুঝতে পারলাম না। তাকে বোঝালাম AWOL খুব খারাপ হবে। তার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট হতে পারে। যেকোনো বাহিনী তাকে যেকোনো সময় ধরে নিয়ে যেতে পারে। সে কিছুই বুঝতে চাইল না। সে জানাল তার বাসা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায়। যেখানে কোনো আইন রক্ষাকারী বাহিনী নেই। সে বলল, এটাই তার মুক্ত হবার শেষ সুযোগ।

আমি বুঝতে পারলাম সে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে। সে আমার চেয়ে দেখতে বেশ বড়সড় ও সুস্থ ছিল। সে পালালে আমি তাকে ধরতেও পারব না। তাকে থামাতে গেলে সে আমাকে পিটিয়ে দুইভাগ করে দিবে। আমি তার ব্যাপারে রিপোর্ট করতে পারি কিন্তু এতে কাউকে সাহায্যের জন্য না ডেকে বা তাকে ক্র্যাচ দিয়ে আঘাত না করে তার সাথে এত কথা বলার জন্য আমার শাস্তি হতে পারে।

আমার খুব রাগ লাগছিল। তার সাথে বেশ চিল্লাচিল্লি করলাম। সে কেন আমি বাথরুমে যাবার অপেক্ষা করল না? সে কেন আমাকে এই পরিস্থিতিতে ফেলছে?

সে খুব নরম স্বরে বলল, "কারণ তুমিই একমাত্র যে আমার কথা শুনবে, বুঝবে।" বলে সে কাঁদতে লাগল।

সেই রাতের সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো আমি তাকে বিশ্বাস করলাম। এত হাজারের ভিড়েও সে একা। একটু কাছেই আতশবাজি বিস্ফারণ হলো। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, "আমাকে একটু বাথরুমে যেতে হবে. একটু পরেই আসছি।"

তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে চললাম। একবারও পেছন ফিরে তাকালাম না। তার সাথে সেটিই ছিল আমার শেষ দেখা। এরপর তাকে আর কখনো দেখিনি। তখন সেই মুহূর্তে আমিও বুঝতে পারলাম আমিও মন থেকে সেনাবাহিনীতে থাকতে চাই না।

ডাক্তারের সাথে আমার পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল কনফার্মেশনের জন্য। ডাক্তার দেখতে শুনতে ছিলেন লম্বা, রোগাটে। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ। তিনি আমার রিপোর্ট দেখে বললেন, আমি ট্রেনিং নেয়ার উপযুক্ত নই। পরবর্তী ট্রেনিং ছিল বিমানপোতে।

ডাক্তার বললেন, 'বাবা, তুমি যদি এখন এই পা নিয়ে লাফ দাও তাহলে তা একেবারে পাউডারের মতো গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবে।'

আমি হতাশ হয়ে গেলাম। আমি যদি সময়মতো প্রাথমিক প্রশিক্ষণটি শেষ না করি তবে আমি 18X-এ আমার জায়গা হারিয়ে ফেলব, যার অর্থ

সেনাবাহিনীর প্রয়োজন অনুসারে আমাকে যেকোনো কাজে পুনঃনিয়োগ দেওয়া হবে। তারা আমাকে দিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে–নিয়মিত পদাতিক, একজন মেকানিক, একটি ডেস্ক জকি, কিংবা আলুর খোসা ছাড়ানোর কাজও দিতে পারে। আর আমার সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন সেনাবাহিনীর সহায়তা ডেস্কে আইটির কাজ করতে হতে পারে।

ডাক্তার আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। একটা কাশি দিয়ে তিনি আমাকে একটি উপায় বলে দিলেন। আমি পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে আবার চেষ্টা করতে পারি। অথবা তিনি আমার জন্য 'Administrative Separation' এর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এটি বিশেষ রকমের বিচ্ছেদ ছিল। সম্মানজনক বা অসম্মানজনক কোনোটাই ছিল না। এটি ছয় মাসেরও কম সময়ের সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ছিল। এটি ছিল একটি বিরতি। অনেকটা ডিভোর্স না নিয়ে অ্যানালমেন্টের মতো। বিয়েটাই কখনো হয়নি এরকম। এতে চাইলেই আবার সব ঠিক করা যাবে।

আমার কাছে এটা বেশ ভালো মনে হলো। আমার কাছে মনে হলো আমি সেই অ্যাপালেচিয়ান ছেলের প্রতি যে দয়া দেখিয়েছি এটা এরই সুফল। ডাক্তার আমাকে চিন্তা করার জন্য এক ঘন্টা সময় দিলেন। আমি অফারটি গ্রহণ করলাম।

সাথে সাথেই আমাকে মেডিকেল ইউনিটে ট্রান্সফার করা হয়। সেখানে এডমিনিস্ট্রেটিভ সেপারেশনের জন্য আমাকে একটি স্টেটমেন্ট এ সাইন দিতে হলো। ওটায় বলা ছিল, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমার হাড় জোড়া লেগেছে।

আমার সিগনেচারটা ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। শুধু কিছু লেখালেখি শেষে আমি যেতে পারব। আমি এক হাতে সেই স্টেটমেন্ট ধরলাম আর একহাতে কলম। আমার চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। আমি এখানে হ্যাকটি বুঝতে পারলাম। যেটা আমি একজন ডাক্তারের আমার প্রতি দয়াদ্র অফার ভাবছি সেটা হলো সরকারের উপর থেকে নির্ভর ও পঙ্গু সেনাদের দায় এড়ানোর কৌশল।

সেনাবাহিনীর নিয়ম অনুযায়ী, আমি যদি মেডিকেল ডিসচার্জ পাই তাহলে সরকারের আমার চিকিৎসা, থেরাপি বিল দিতে হবে। সাথে আমার ইনজুরি কারণে তৈরি বিভিন্ন অবস্থা সামাল দিতে হবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসচার্জের কারণে আমার দায় আমার নিজেরই। আর স্বেচ্ছায় সেই দায় স্বীকার করার উপর আমার স্বাধীনতা নির্ভর করছে। আমি সাইন দিয়ে দিলাম আর সেদিনই সেনাবাহিনীর দেয়া ক্র্যাচে ভর দিয়ে সেনাবাহিনী ছেড়ে দিলাম।

ভালোবাসায় সমুজ্জ্বল

আমার ঠিক পরিষ্কার মনে নেই সুস্থ হয়ে ওঠার সময়টায় আমি ঠিক কখন আবার স্পষ্টভাবে ভাবতে শুরু করলাম। প্রথমে শারীরিক কষ্ট শেষ হলো। তারপর মানসিক কষ্টও চলে গেল। প্রথম কয়েক সপ্তাহ পর আমি সবার কথার গুরুত্ব দিতে শুরু করলাম। সবাই বলছিলেন আমার এখনো বয়স কম, আমার সামনে তাই অফুরন্ত সুযোগ আছে। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শুরু করলাম তারপর হাঁটতে শুরু করলাম।

আমার পরিবারের মতো আরো বেশ কিছু বিষয় ছিল যা আমি অবহেলা করেছি। এরকম আরেকটি বিষয় আছে। আমার মায়ের কন্ডোমিনিয়ামের সামনে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম যে বিষয়টি আমি অবহেলা করেছি সেটা হলো আমার টেকনোলজিক্যাল ট্যালেন্ট।

কম্পিউটারের সাথে আমার এতই সখ্য ছিল যে আমি আমার যোগ্যতাকে গুরুত্ব দিইনি। কম্পিউটার দক্ষতার জন্য আমি কখনো প্রশংসা পাবার বা সফলতা লাভের চিন্তা করিনি। আমার জন্য যা কঠিন আমি তাতে সফল হতে চেয়েছিলাম। প্রশংসা পেতে চেয়েছিলাম। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম, আমি কোনো পাত্রের মধ্যে রাখা কোনো ব্রেইন নই। আমার পেশিশক্তিও আছে।

সুস্থ হওয়ার সময়টায় বুঝতে পারলাম সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতা আমার গৌরবে আঘাত করেছে কিন্তু আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার মনোবল বেড়ে গেছে। আমি আঘাতকে আর ভয় পাই না। বরং এটি আমাকে উন্নত মানুষে পরিণত করছে। কাঁটাতারের বাইরের জীবনটা সহজ হয়ে উঠছিল। হিসেব করে বুঝলাম, আর্মিতে গিয়ে আমার চুলের বারোটা বেজেছে। ধীরে ধীরে চুল লম্বা হচ্ছিল। আর যে আঘাত পেয়েছি সেটাও সুস্থ হচ্ছিল।

আমি সত্যের মুখোমুখি হয়ে ভাবছিলাম, আমি যদি দেশের সেবা করতে চাই তাহলে মাথা ও হাত দিয়ে করতে হবে। অর্থাৎ কম্পিউটার জ্ঞান দিয়ে। এতে আমি আমার সেরাটা দেশকে দিতে পারব। যদিও আমি এত অভিজ্ঞ ছিলাম না। তবে সেনাবাহিনীতে গিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমাকে কোনো গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করতে সাহায্য করবে। ওখানে আমার মেধার কদর আছে, আর এটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে।

আমার অনিবার্যভাবে যেটা দরকার ছিল সেটা হলো গোয়েন্দা ছাড়পত্র। এর তিনটি লেভেল আছে–নিম্ন থেকে উচ্চ, কনফিডেনসিয়াল, সিক্রেট, টপ সিক্রেট।

শেষোক্তটি সেন্সেটিভ কম্পার্টমেন্টেড ইনফরমেশন বাছাইয়ের মাধ্যমে আরো দীর্ঘ হতে পারে। সিআইএ, এনএসএ তাদের বিভিন্ন পজিশনের জন্য টপ সিক্রেট/সেন্সেটিভ কম্পার্টমেন্টেড ইনফরমেশন চায়। যদিও এই দুটি

পাওয়া খুব কঠিন ছিল কিন্তু তা অনেক সম্ভাবনার দরজা খুলে দিবে। আমি অ্যারান্ডেল কমিউনিটি কলেজে গেলাম। তারা আমার গোয়েন্দা ছাড়পত্র পাবার জন্য 'সিংগেল স্কোপ ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন' এর আবেদনপত্র অনুমোদন করবে। যদিও Top Secret (TS)/Sensitive Compartmented Information (SCI) এর জন্য এক বছর বা তার চেয়ে বেশি লাগতে পারে। তবে যারা মানসিকভাবে ধকল কাটানোর চেষ্টা করছে তাদেরকে আমি মন থেকে এটাই সুপারিশ করব। এক্ষেত্রে শুধু কিছু প্রশাসনিক কাগজ লাগবে। পা গুটিয়ে বসে থাকা আর অপরাধ করার চেয়ে এটা ভালো। বাকিটা আপনার হাতে। কাগজপত্র অনুযায়ী, আমি ছিলাম উপযুক্ত আবেদনকারী। পরিবারের প্রায় সবাই সামরিক বাহিনীতে ছিল। প্রায় সবার কোনো না কোনো ছাড়পত্র আছে। আমি নিজে সামরিক বাহিনীতে যাবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় তা হয়নি। আমার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড, কোনো ড্রাগ নেয়ার অভ্যাস নেই। আমার একমাত্র আর্থিক ঋণ ছিল মাইক্রোসফট সার্টিফিকেটের জন্য স্টুডেন্ট লোন। এই টাকা পরিশোধের জন্য কোনো তারিখ আমি মিস করিনি।

আমাকে কোনো কিছুই সমস্যায় ফেলেনি, আমার নার্ভাসনেস ছাড়া। ন্যাশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো আমার জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে অনুসন্ধান চালাল এবং তারা আমার পরিচিত প্রায় প্রত্যেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। আমার বাবা-মা, আমার আত্মীয়স্বজন, আমার সহপাঠী এবং বন্ধুবান্ধব সবার। তারা আমার দৃষ্টিনন্দন স্কুল সার্টিফিকেটগুলো দেখেছিল এবং আমি নিশ্চিত, আমার কয়েকজন শিক্ষকের সাথেও কথা বলেছিল। আমার ধারণা তারা এমনকি ম্যায় এবং নর্মের সাথেও কথা বলেছে। যে ছেলের সাথে এক গ্রীষ্মে সিক্স ফ্ল্যাগ আমেরিকাতে একটি কোণ আইসক্রিম স্ট্যান্ডে কাজ করেছি তাকেও জিজ্ঞেস করেছে। ব্যাকগ্রাউন্ড চেকিংয়ের লক্ষ্যটি আমি খারাপ কিছু করেছি কিনা তা সন্ধান করা ছিল না। বরং আমাকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করতে পারে কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য ছিল। আইসি'র কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা নয় যে আপনি শতভাগ নিখুঁত কি না। কারণ যদি এমন হয় তবে তারা কাউকেই নিয়োগ দিতে পারত না। তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি কতটুকু সৎ। আপনার কোনো দোষ আপনি গোপন রাখছেন কি না যা আপনার শত্রু আপনার বা এজেন্সির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে।

একদিন জ্যামে বসে আমার জীবনের সব ভুল নিয়ে চিন্তা করছিলাম। তদন্তকারীদের মনে সন্দেহ জাগাতে পারে এমন কিছুই খুঁজে পেলাম না। আমি ইন্টারনেটে বেড়ে উঠেছি। আপনি যদি সার্চ বক্সে খারাপ কিছু সার্চ না দিয়ে থাকেন তাহলে বলব আপনি বেশিদিন হয়নি ইন্টারনেটে এসেছেন। যদিও আমি পর্নোগ্রাফি নিয়ে চিন্তিত ছিলাম না। আমি চিন্তিত ছিলাম আমার উগ্র দেশপ্রেমী কথাবার্তা ও মানুষের বিরুদ্ধে আমার মতামত নিয়ে যা আমি

অনলাইনে করেছি। আমি চিন্তিত ছিলাম চ্যাট লগ, ফোরাম পোস্ট আর প্রতিটা গেইমিং ও হ্যাকার সাইটে করা বোকার মতো মন্তব্য নিয়ে।

ছদ্মনামে লেখা মানে স্বাধীনভাবে লেখা হলেও এতে চিন্তাভাবনা না করেই অনেক সময় লেখা হয়। প্রথমদিকে ইন্টারনেট সংস্কৃতিতে একজন আরেকজনের চেয়ে উদ্ভট কথাবার্তা বলার প্রতিযোগিতা ছিল। গেইমের ওপর ট্যাক্স আরোপ করায় আমি বোমা মেরে দেশকে উড়িয়ে দেয়ার কথা বলতে দ্বিধাবোধ করিনি। রিএডুকেশন ক্যাম্পে যারা এনাইম মুভির পছন্দ করত না তাদেরকে খোঁয়াড়ে দিতে বলেছি। এসব সাইটের কেউই এসব সিরিয়াসলি নেয়নি। আর আমিও নিইনি।

পুরনো পোস্টগুলো পড়তে লজ্জা পেতাম। এসব অর্ধেক কথাই আমি মন থেকে বলিনি। অ্যাটেনশন পাবার জন্য বলেছিলাম। যদিও পার্মানেন্ট রেকর্ড নামে বিশাল ফোল্ডার নিয়ে মগ্ন থাকা চশমা পড়া ধূসর চুলের মানুষটির কাছে এসব বলতে আমার মোটেও অসুবিধা হয়নি।

আর বাকি অর্ধেক তো আরো খারাপ ছিল। তখন বেশ বড় হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আমি জেনেশুনে করা সেসব উত্তপ্ত মতামতের বিরোধিতা করি। আমার অদৃশ্য অস্তিত্বের সাথে যুদ্ধ করি। আমি আমার সেই বোকা, শিশুসুলভ ও নির্দয় আমার সাথে যুদ্ধ করতে চাচ্ছিলাম যার এখন কোনো অস্তিত্ব নেই। আমি চাইনি অতীতের সেই আমি বর্তমান আমাকে তাড়া করুক। আমার সেই অনুশোচনা প্রকাশ করার ও তার এবং আমার মধ্যে দূরত্ব রাখার কোনো উপায় আমার জানা ছিল না। টেকনোলোজিক্যালি এরকম একটি অতীতের সাথে জড়িয়ে ছিলাম যা নিয়ে আফসোস হয়।

এটা হয়তো আমার প্রজন্মের সবার সাধারণ সমস্যা। আমরা অনলাইনে বড় হয়েছি। আমরা নিজেদেরকে কারো তত্ত্বাবধান ছাড়াই আবিষ্কার করেছি। আমরা ভাবিনি যে, আমাদের দুঃসাহসী কাজ, অবজ্ঞাসূচক কথা এসব অনন্তকালের জন্য থাকবে যার জন্য আমাদেরকে একদিন জবাবদিহি করতে হতে পারে। যাদের ইন্টারনেট ছিল তারা এটা বুঝবেন। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, চাকরি পাবার আগে আপনারা আপনাদের অতীতের কোনো পোস্ট নিয়ে লজ্জাবোধ করেছেন। কোনো টেক্সট বা মেইল নিয়ে হয়তো ভেবেছেন যেটা আপনাদেরকে চাকরি থেকে বের করে দিতে পারে।

আমার বিষয়টা ভিন্ন ছিল। ম্যাসেজ বোর্ড থেকে পুরনো পোস্টগুলো ডিলিট করা যেত। ছোট একটা স্ক্রিপ্টে একসাথে করে দিয়ে দিলেই হবে। এটি মূল প্রোগ্রামও না। আমার সমস্ত পোস্ট এক ঘণ্টার মধ্যে ডিলিট হয়ে যাবে। বিশ্বাস করুন আমি এটা করতে চাইলাম।

কিন্তু করলাম না। আমার কাছে এটি সঠিক মনে হলো না। এমন না যে আমার পোস্ট ডিলিট করাটা বেআইনি ছিল বা আমি গোয়েন্দা ছাড়পত্র পাব না।

কিন্তু বিষয়টা আমাকে ভাবাল। অনলাইন জগতের সবচেয়ে ক্ষতিকর ধারণা হলো কেউ কোনো ভুল করতে পারবে না। যদি করে তাহলে সারাজীবন তাকে এটার জবাবদিহি করতে হবে। লিখিত তথ্যের বিশুদ্ধতার চেয়ে আত্মার বিশুদ্ধতা জরুরী। এমন পৃথিবীতে আমি থাকতে চাই না যেখানে সবাই ভালো সাজার নাটক করে। সেই কমেন্টগুলো মিটিয়ে দেয়া মানে আমি কে, কী তা মিটিয়ে দেয়া। অতীতের আমিকে অস্বীকার করা মানে বর্তমান আমার যথাযথতা অস্বীকার করা।

কমেন্টগুলো রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেগুলোর সাথেই চলতে চাইলাম। এ অবস্থানের প্রতি আমার বিশ্বস্ততা আমাকে নতুনভাবে সঠিক মতামত ছড়াতে সাহায্য করবে। অনলাইনে আমাদের অতীতের যেসব কাজ আমাদের লজ্জিত করে তা আমরা মিটাতে পারব না। তবে আমরা সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। আমাদের অতীতকে হয় আমাদের উপর অত্যাচার করতে দিব নয়তো তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাব।

সেই অলস সময়ে আমার মধ্যে এই আদর্শটি জেগে উঠল। যদিও তা কঠিন ছিল তবু আমি এর সাথেই মানিয়ে নিলাম। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, অনলাইনে আমার একমাত্র কাজ যার জন্য আমি কখনো লজ্জিত হইনি তা হলো ডেটিং প্রোফাইলে আমার আলাপচারিতা। সেখানে যাই লিখতাম মন থেকেই লিখতাম কারণ আমি চাইতাম বাস্তব জীবনে কেউ আমার কথা ভাবুক। HotOrNot.com নামে একটি ওয়েবসাইটে জয়েন করলাম। ২০০০ সালের শুরুতে এটি RateMyFace এবং Am.Hot এর মতোই খুব জনপ্রিয় ডেটিং সাইট ছিল। পরবর্তীতে উক্ত দুটির গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলো একত্রিত করে মার্ক জুকারবার্গ FaceMash নামে একটি সাইট তৈরি করেন, যার নাম পরবর্তীতে ফেসবুক হয়।

ফেসবুক পূর্ব ডেটিং সাইটের মধ্যে HotOrNot বেশ জনপ্রিয় ছিল এর ডেটিং কম্পোনেন্টের কারণে। এতে একে অন্যের ছবিতে HotOrNot ভোট দিতে হতো। আমার মতো রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীরা অন্য রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারত। এরকম সাধারণ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আমার দেখা হয় লিন্ডসি মিলসের সাথে।

লিন্ডসি, আমার ভালোবাসা এবং আমার স্ত্রী। সেই উনিশ বছরের লাজুক লিন্ডসি আমার কাছে ছিল স্বর্ণকেশী, সুন্দরী। ওর ছবিগুলো ছিল বেশ সুন্দর। সেল্ফ পোর্ট্রেটের মতো শিল্পবোধ সম্পন্ন, নজরকাড়া আলো আঁধারি ছবি। একটি ছবি ছিল সে যে ল্যাবে কাজ করত সেই ল্যাবে তোলা। আর আরেকটিতে সে ক্যামেরার বিপরীত দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি এই ছবিগুলোতে তাকে ১০ এ ১০ দিলাম অর্থাৎ হট। সে আমাকে দিল আট। আমাদের ম্যাচ হলো। আমরা চ্যাটিং শুরু করলাম। লিন্ডসি ফাইন আর্ট ফটোগ্রাফির ওপর পড়াশোনা

করছিল। তার নিজের ওয়েবসাইট ছিল। ওখানে অনেক জার্নাল ছিল আর ছিল বন, ফুল, পুরনো ফ্যাক্টরির ছবি আর ওর নিজের ছবি।

এই ওয়েবসাইট থেকে ওর ব্যাপারে যত তথ্য পারা যায় জানার চেষ্টা করলাম। তার শহর (লরেল, ম্যারিল্যান্ড), তার স্কুল (MICA, the Maryland Institute College of Art)।

আমি তার কাছে সাইবারস্টকিংয়ের বিষয়টা স্বীকার করলাম। আমার নিজেকে খুব নীচ মনে হল। সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমিও তোমার ব্যাপারে অনেক তথ্য খুঁজেছি, মিস্টার।" তারপর সে আমার ব্যাপারে অগণিত তথ্য বলতে থাকল।

আমি জীবনেও নিজের ব্যাপারে এত ভালো কথা শুনিনি। তবু তার সাথে সামনাসামনি দেখা করার ব্যাপারে আমি উদাসীন ছিলাম। আমরা দেখা করার জন্য একটা দিন নির্ধারণ করলাম। সেইদিনটা যত ঘনিয়ে আসছিল, তত আমার ভয় বাড়ছিল। অনলাইন সম্পর্ককে অফলাইনে নিয়ে আসা ভীতিকর বিষয় বটে। আমার অভিজ্ঞতা বলছিল, অনলাইনে যার সাথে তোমার খুব ভালো সম্পর্ক থাকবে, অফলাইনে তাকে দেখে ততটাই নিরাশ হবে। অনলাইনে কথা বলা যত সহজ, অফলাইনে ততটাই কঠিন।

দূরত্ব ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে দেয়। কেউই সরাসরি এত কথা বলতে পারে না যতটা সবাই একান্তে বলতে পারে। অদেখা কারো সাথে চ্যাট করাটাও এরকম। সরাসরি সেই মানুষের সাথে দেখা হলে দেখা যাবে আগ্রহ আর থাকছে না। কথাবার্তাও হয়ে যায় সীমাবদ্ধ এবং সাবধানী।

অনলাইনে আমার আর লিন্ডসির খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। আমি ভয় পাচ্ছিলাম সামনাসামনি দেখা হবার পর আমাদের যদি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আমি ভয় পাচ্ছিলাম হয়তো তার আমাকে পছন্দ হবে না।

লিন্ডসি আমার মায়ের কন্ডোমিনিয়ামের সামনে থেকে আমাকে পিক করবে বলেছিল। আমি সন্ধ্যার দিকে ঠান্ডার মধ্যে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর ফোনে লিন্ডসিকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলাম। 98 Chevy Cavalier গাড়ির অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ করে আমার মুখের উপর আলোকচ্ছটা এসে পড়ল। কিছুই দেখতে পারছিলাম না।

"সিটবেল্ট লাগাও।" আমি গাড়িতে উঠার পর এই ছিল আমাকে বলা লিন্ডসির প্রথম কথা। তারপর সে বলল, "তো কী চিন্তা করলে? কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

আমি বুঝতে পারলাম এতক্ষণ আমার চিন্তাভাবনায় ছিল শুধুই লিন্ডসি। কোথায় যাব সেটা আর চিন্তা করা হয়নি। লিন্ডসির জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো চুপচাপ বসে থাকতে হতো। কিন্তু লিন্ডসির সাথে কথা বলতে কোনো জড়তা কাজ করেনি। লিন্ডসির একটি প্রিয় রাস্তা ছিল। সে তার প্রিয় রাস্তা দিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করছিল। আমরা গিলফোর্ড পেরিয়ে বেশ কয়েক মাইল চলে

এলাম। আমাদের গল্প চলতেই থাকল যতক্ষণ না আমরা লোরেল মলের পার্কিং লটে এসে থামলাম। আমরা কারের ভেতরেই বসে গল্প করছিলাম। সব ঠিকঠাক চলছিল। সামনাসামনি দেখা হবার কারণে আমাদের ফোন কল, ইমেইল, চ্যাট বাড়তে থাকল।

অনলাইন যোগাযোগের ধারাবাহিতায় আমাদের দুজনার দেখা হয়। আর শুরু হয় একটি গল্পের। এই গল্প টিকে থাকবে ততদিন যতদিন আমরা বেঁচে থাকবো। আমরা আমাদের পরিবার নিয়ে কথা বললাম। লিন্ডসির বাবা-মারও ডিভোর্স হয়ে গেছে। তার বাবা-মার বাসার মধ্যে দূরত্ব ছিল ২০ মিনিটের মতো। সন্তান হিসেবে লিন্ডসির আনাগোনা ছিল দুই জায়গাতেই। সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার সে তার মায়ের বাসায় থাকত। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার ওর বাবার বাসায় থাকত। শুধু রবিবার তার জন্য নাটকীয় দিন ছিল। তাকে ভাবতে হতো ওইদিন সে কী করবে।

লিন্ডসি আমার পছন্দের বেশ সমালোচনা করল। বিশেষ করে ডেটের দিন আমি যে পোশাক পরেছিলাম। জিন্সের প্যান্টের সাথে স্লিভলেস গেঞ্জি আর এর উপর বোতাম লাগানো একটি শার্ট পরেছিলাম। এটিতে ধাতব শিখার কাজ করা ছিল (আমি বেজায় দুঃখিত)।

সে ডেট করছে এমন দুজনের কথাও বলল। তাদের ব্যাপারে অনলাইনেও বলেছিল। তাদেরকে আমি যেভাবে উপেক্ষা করলাম এতে ম্যাকিয়াভেলিও হয়তো লজ্জা পেয়েছেন (আমি মোটেও দুঃখিত নই)।

আমি লিন্ডসিকে আমার ব্যাপারেও সব বললাম। আর বললাম, আমার কাজের ব্যাপারে তাকে কিছুই বলতে পারব না। সেই কাজ যা আমি শুরুই করিনি। অথচ কত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে আমি তা বলছিলাম।

লিন্ডসিকে পলিগ্রাফ টেস্টের কথা বললাম। এটা গোয়েন্দা ছাড়পত্রের জন্য দরকার ছিল। লিন্ডসি তার সাথে প্র্যাকটিস করতে বলল। সে বলছিল, তুমি কী চাও, তুমি কে এসব বলতে কখনো লজ্জা পেয়ো না।

আমি আর কারো সাথেই এত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতাম না। কিন্তু লিন্ডসিকে আমি আমার দোষত্রুটি স্বেচ্ছায় বললাম। তাকে আমার ছবিও তুলতে দিলাম। এনএসএ'র ফ্রেন্ডশিপ এনেক্স কমপ্লেক্সে গোয়েন্দা ছাড়পত্র পাবার জন্য ফাইনাল ইন্টার্ভিউতে যাবার পথে আমার মাথায় লিন্ডসির কথাগুলো ঘুরছিল।

একটি জানালাবিহীন রুমে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। একটি অফিস চেয়ারে জিম্মিদের মতো বসে ছিলাম। বুকে ও পেটে নিউমোগ্রাফিক টিউব বসানো ছিল। এগুলো আমার নিশ্বাস পরিমাপ করছিল। আঙুলের অগ্রভাগে ফিংগার কাফ আমার ইলেকট্রিকাল অ্যাক্টিভিটি মাপছিল। হাতে একটি ব্লাডপ্রেশার কাফ আমার হার্ট রেট মাপছিল। একটি সেন্সর প্যাড আমার প্রতিটি স্নায়বিক অস্থিরতা আর নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করছিল। এসব ডিভাইস আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিল আর এগুলো সংযুক্ত ছিল টেবিলে রাখা কালো

বড় একটি পলিগ্রাফ মেশিনের সাথে টেবিলের অপরদিকে একটি সুন্দর চেয়ারে পলিগ্রাফার বসে ছিলেন। তিনি আমার কোনো এক শিক্ষকের কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমি পুরোটা সময় সেই শিক্ষকের নাম মনে করা আর মনে না করার চেষ্টা করছিলাম। পলিগ্রাফার আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করলেন। প্রথম দিকের প্রশ্নগুলো খুব সাধারণ ছিল। আমার নাম কী এডওয়ার্ড স্নোডেন? আমার জন্ম কী ৬/২১/১৯৮৩? আমি কোনো গুরুতর অপরাধ করেছি কি না? আমি কখনো জুয়া খেলেছি কি না? কোনো এলকোহল বা ড্রাগ নিয়েছি কি না? আমি কোনো বৈদেশিক শক্তির এজেন্ট ছিলাম কি না? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিরুদ্ধে আমি কোনো সহিংসতাকে সমর্থন করেছি কি না?

হ্যাঁ কিংবা না-তে এসব উত্তর দিতে হবে। আমি বেশিরভাগই না-তে উত্তর দিলাম। কিছু প্রশ্নের ব্যাপারে বেশ ভয়ে ছিলাম। ফোর্ট বেনিং অনলাইনে কোনো মেডিকেল স্টাফের কর্মদক্ষতা ও চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছ কি না? লস আলামস নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি নেটওয়ার্কে কী খুঁজছিলে? কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো আমাকে কখনোই করা হয়নি। কিছু বুঝতে পারার আগেই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। আমি খুব সাফল্যের সাথে পলিগ্রাফ টেস্টে পাস করলাম।

নিয়ম অনুযায়ী, আমাকে কতগুলো প্রশ্ন তিনবার করে উত্তর দিতে হবে। আমি তিনবারই পাস করলাম। তার মানে আমি শুধু TS/SCI পাস করিনি বরং সম্পূর্ণ পলিগ্রাফও পাস করেছি। দেশের সর্বোচ্চ সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম। আমার বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর। তখন আমার একজন প্রেমিকাও আছে, যাকে আমি ভালোবাসি। আমি যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছি।

দ্য সিস্টেম

আমার বয়স যখন ২২ বছর ছিল, তখনকার সময়ে আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই। আমার তখন নিজস্ব কোনো রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল না। যা ছিল তা পরস্পরবিরোধী কিছু মতাদর্শ। এসব মতাদর্শের কিছু অনলাইন থেকে প্রাপ্ত। আর কিছু মতাদর্শ ছোট থেকে বড় হতে হতে অর্জন করেছি। কিন্তু বিশ বছর বয়সের পর বুঝতে পারলাম এসব ছিল আমার তরুণ মনে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব। আমরা বড়দের থেকে কথা বলা শিখি এবং একটা সময় তাদের মতামতকেই গ্রহণ করতে শুরু করি

আমার বাবা-মা রাজনীতির সাথে মোটামুটি জড়িত ছিলেন তবে রাজনীতিবিদদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য রাজনীতিবিদের সাথে সম্পর্কহীনতা নন-ভোটারদের মতো ছিল না বা অবজ্ঞাসূচক ছিল না। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ হিসেবে তাদের এই দূরত্ব ছিল। তাদের এই শ্রেণিকে বলা হতো ফেডারেল সিভিল সার্ভিস বা পাবলিক সেক্টর। একটা সময় এটা হয়ে গেল ছায়া সরকার।

এরই মধ্যে নন-ইলেক্টেড নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তারা ছিলেন (যারা সম্ভবত আমেরিকার ইতিহাসে সর্বশেষ সক্রিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি)। তারা সরকারের জন্য কাজ করেছেন। তারা সিআইএ, এনএসএ, আইআরএস, এফসিসি'র মতো স্বাধীন সংস্থাগুলোতে কাজ করেছেন। নয়তো কাজ করেছেন শাসন বিভাগে (রাষ্ট্র, আইন, বিচার, কোষাগার ইত্যাদি)। এই শ্রেণির মানুষই ছিলেন আমার বাবা-মা। নির্বাচিত প্রতিনিধি ও তাদের নিয়োগকৃত অপেশাদার কর্তাব্যক্তির সহায়তা করার জন্য আমার বাবা-মার মতো ৩০ লক্ষ নিবেদিতপ্রাণ কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। তারা তাদের রাজনৈতিক দায়িত্বকে, দেশের প্রতি তাদের কৃত শপথকে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে পালন করেছেন।

সরকার আসে সরকার যায়। কিন্তু এই সিভিল সার্ভেন্টরা তাদের দায়িত্বে বহাল থাকেন। রিপাবলিকান কিংবা ডেমোক্রেটিক যে দলই হোক না কেন তারা নিষ্ঠার সাথে তাদের কাজ করেন। কারণ তারা কাজ করেন শুধু সরকারের জন্য। তারা কাজ করেন শাসনব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখার জন্য।

এই লোকেরাই, তাদের দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে দেশকে সমর্থন করেছিলেন। 9/11 এর পরে আমিও এটাই করেছি। আমি বুঝতে পারলাম যে আমার বাবা-মা আমাকে যে দেশপ্রেম শিখিয়েছিলেন তা সহজেই জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। আমি যখন সেনাবাহিনীতে যাবার চেষ্টায় ছিলাম

তখন আমার মাথায় চিন্তাভাবনা ছিল অনেকটা ভিডিও গেইমের মতো। যেখানে ছিল ভালো আর খারাপের দ্বন্দ্ব।

সেনাবাহিনী থেকে ফিরে আসার পর কম্পিউটারে মনোযোগ দিলাম। একটা সময় বুঝতে পারলাম যোগাযোগ প্রযুক্তি সহিংসতা সৃষ্টিকারী প্রযুক্তিকে হারিয়ে দিতে পারবে। গণতন্ত্রকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে চাপিয়ে না দিয়ে বরং সিলিকন ও ফাইবারের ক্যাবল দিয়ে জুড়ে দেয়া উচিত।

২০০০ এর গোড়ার দিকে ইন্টারনেট সবে বিকশিত হয়ে উঠছিল। এটি তখন আমেরিকান আদর্শের বিশুদ্ধি ও রূপান্তরকে আহ্বান করে।

এখানে সবার সমান অধিকার আছে? চেক করো।

এখানে সবার জীবন, স্বাধীনতা, সুখ-শান্তির প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থন জানানো হয়? চেক, চেক, চেক।

ইন্টারনেট সংস্কৃতি আমেরিকার সব গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টের মাধ্যমে আমেরিকার ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে ইন্টারনেট ব্যবহৃত হতে থাকে সরকার ও কর্পোরেট স্বার্থে। ইন্টারনেট ব্যবহৃত হতে থাকে ক্ষমতা ও মুনাফার জন্য। বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও দূরবর্তী স্থানে ফোন কল করার ওপর অতিরিক্ত টাকা দাবি করতে থাকে। অথচ এসব সহজলভ্য হওয়ার কথা ছিল। ঠিক ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের মতো আচরণ করা শুরু হলো যাদের কঠোর কর আরোপ প্রক্রিয়া মানুষের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করেছিল।

আমরা নতুন একটি সমাজে বেড়ে উঠতে থাকলাম। এই সমাজে আমাদের জন্মস্থান, আমাদের বেড়ে উঠা, স্কুলে আমাদের জনপ্রিয়তা এসবকিছুই মূল্যহীন। আমাদের জ্ঞান ও টেকনোলজিক্যাল দক্ষতাকে এখানে জোর দেয়া হয়।

স্কুলে আমাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রস্থাবনা শিখতে হয়েছিল। কিন্তু এখন এর সাথে আমি জানি John Perry Barlow'র 'A Declaration of the Independence of Cyberspace' এর কথা।

যেখানে বলা আছে, 'We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded by race, economic power, military force, or station of birth. We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her beliefs, no matter how singular, without fear of being coerced into silence or conformity.'

আইসি'তে কাজ শুরু করার পর বুঝতে পারলাম টেকনোলজিক্যাল মেধা ক্ষমতায়ন করার সাথে মানুষকে লজ্জায়ও ফেলতে পারে। ইন্টারনেটের বিকেন্দ্রীকরণের দক্ষতাকেও বিকেন্দ্রীকরণ করে। আমি হয়তো পরিবারে ও আমার এলাকার সবচেয়ে কম্পিউটারে দক্ষ ব্যক্তি হতে পারি। কিন্তু আইসি'র জন্য কাজ করা মানে আমার দক্ষতাকে দেশের ও পৃথিবীর সবার বিরুদ্ধে

ব্যবহার করা। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত জ্ঞানের সমাহার দেখতে পেলাম। উন্নতি করতে হলে আমাকে এসব বিশেষায়িত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

প্রযুক্তিবিদ হিসেবে আমার সামনে অনেক পথ খোলা ছিল। সফটওয়্যার ডেভেলাপার বা প্রোগ্রামার হতে পারতাম। হার্ডওয়্যার বা নেটওয়ার্ক স্পেশালিস্ট হতে পারতাম। কম্পিউটার, প্রোগ্রাম, নেটওয়ার্ক সবই আমার কাছে ভালো লাগত। তবে আমি এর একক কোনো উপাদান নিয়ে নয় বরং সম্পূর্ণ সিস্টেমের প্রতি আগ্রহী ছিলাম।

লিন্ডসির বাসা থেকে ফেরার পথে কিংবা AACC থেকে ফেরার সময় গাড়িতে বসে এসব নিয়েই চিন্তা করতাম। সফটওয়্যার ডেভেলাপার হওয়া মানে সব প্রক্রিয়াকে একে অপরের সাথে একত্রিত করে এদের ব্যবহারকারীর প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; একটি হার্ডওয়্যার বিশেষজ্ঞ হওয়া মানে মূল অবকাঠামো স্থাপন করা; নেটওয়ার্ক বিশেষজ্ঞ হওয়ার মানে সব প্রক্রিয়া পরিচালনা ও এদের নিরাপদ নিয়ন্ত্রণ করা; সম্পূর্ণ সিস্টেম নিয়ে কাজ করা মানে পরিকল্পিতভাবে সবকিছুর ভিত্তি তৈরি করা। সব উপাদান সহজলভ্য করে এদের কাজকে একত্রিত করে তার ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করা।

সিস্টেম নিয়ে কাজ করার দুটি উপায় আছে। প্রথমত, সমস্ত সিস্টেমের উপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এটি পরিচালনা করা। এর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই পজিশনকে বলা হয় সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর। দ্বিতীয়ত, একটি সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করা নয়তো বর্তমান উপায়কে ব্যবহার করা। এই পজিশনকে বলে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার। আমার দুটোতেই কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আমার কাজ আমার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকেও প্রভাবিত করতে শুরু করে।

একটি সিস্টেমের কথা ভাবুন। যেকোনো সিস্টেম হতে পারে কম্পিউটার সিস্টেম, ইকোসিস্টেম, লিগ্যাল সিস্টেম বা গভর্নমেন্টাল সিস্টেম। অনেকগুলো উপাদান একসাথে কাজ করে একটি সিস্টেম গড়ে তোলে। কোনো সিস্টেমে যখন সমস্যা ধরা পড়ে তখন বুঝতে হবে সেটি মূল সমস্যা নয়। মূল সমস্যা সূত্রপাত হয় অন্য কোথাও। সিস্টেম কেন ভেঙে গেল সেটা বের করতে হলে অন্যান্য উপাদানের উপর সেই সমস্যার প্রভাব খুঁজে বের করতে হবে। একজন সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর ও ইঞ্জিনিয়ারকে তাই সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিংয়ে দক্ষ হতে হয়। এটি যদি সফটওয়্যার সমস্যা হয় তাহলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের মতো লাইনের পর লাইন স্ক্রলিং করে মেরামত করতে হবে।

হার্ডওয়্যারের সমস্যা হলে হাতে সোল্ডার গান আর মুখে ফ্লাশলাইট নিয়ে সার্কিট বোর্ড ঠিক করতে হবে। নেটওয়ার্কে সমস্যা হলে ছাদের উপর, মাটির

নিচে ক্যাবল চেক করতে হবে ও অফিসের ল্যাপটপগুলোর কেন্দ্রীয় সার্ভারের সাথে দূরবর্তী তথ্যের সংযোগ ঘটাতে হবে। একটি সিস্টেম কাজ করে সুশৃঙ্খল নিয়ম অনুযায়ী। যদি সেই সিস্টেমে সমস্যা হয় তাহলে হয়তো কেউ সিস্টেমের অপব্যবহার করেছে বা কেউ সিস্টেমের এমন কোথাও প্রবেশ করেছে যেখানে তার প্রবেশাধিকার নেই। বা সেই সিস্টেমকে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছে। কিংবা একটি অংশের সমস্যার জন্য অন্যান্য অংশ সমস্যাগ্রস্ত হয়েছে।

আমার সম্পূর্ণ ক্যারিয়ারে প্রযুক্তির এই দিকগুলো নিয়ে প্রশ্ন করেছি। সমাধান করতে পেরেছি। কিন্তু দেশের ব্যাপারে না তো প্রশ্ন করতে পেরেছি আর না দিতে পেরেছি সমাধান।

হোমো-কন্ট্রাক্টাস

আমি আমার দেশের সেবা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এর পরিবর্তে আমি দেশের জন্য কাজ করা শুরু করলাম। এটা কোনো মামুলি পার্থক্য নয়। আমার বাবা ও পপ দেশের সেবা করে যে সম্মানজনক সুযোগ সুবিধা পেতেন তা আমি বা আমার প্রজন্ম পাইনি। আমার বাবা ও পপ দুজনেই তাদের কর্মজীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেশের সেবা করেছেন। আমার শৈশব থেকে একেবারে আইসিতে প্রবেশ পর্যন্ত আমেরিকান সরকার আমার থাকা, খাওয়া, পোশাক সবকিছুতে সাহায্য করেছে। তখন সরকার তার নাগরিকের সেবার যথাযথ মূল্য দিত।

আমি আইসিতে যোগ দিই একেবারে ভিন্ন একটি সময়ে। তখন পাবলিক সার্ভিসের আন্তরিক সেবাকে প্রাইভেট সেক্টরের কারণে উপেক্ষা করা হচ্ছিল। সামরিক সেনা, অফিসার, সিভিল সার্ভেন্টদের জায়গা দখল করে নিল 'Homo contractus'রা। এরা উদারনৈতিক মার্কিন সরকারের মূল কর্মীবাহিনী। এরা কোনো শপথ গ্রহণকারী কর্মী নয় বরং অস্থায়ী কর্মী। এদের কাছে সরকার কোনো কর্তৃপক্ষ নয়। বরং সেবাগ্রহীতা। এদের দেশপ্রেমের উদ্দীপনা আসে মোটা অংকের টাকা থেকে।

আমেরিকান বিপ্লবের সময় সদ্য গঠিত প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য বেসরকারি বাহিনী ব্যবহার করা হতো। এটা তাও মেনে নেয়া যায়। কিন্তু যে আমেরিকা সুপারপাওয়ার সেই আমেরিকা নিজ দেশের নিরাপত্তার জন্য বেসরকারি কর্মীবাহিনীর ব্যবহার করা আমার কাছে রীতিমতো আশ্চর্যজনক অশুভ এক লক্ষণ।

বেসরকারি বাহিনী দিয়ে চুক্তিতে কাজ করানো কোনো ভাল ফল নিয়ে আসেনি। এক্ষেত্রে ব্ল্যাকওয়াটারের 'ফাইটিং ফর হায়ার' কার্যক্রম এর কথা বলা যায়। এর সদস্যরা চৌদ্দজন ইরাকিকে হত্যা করার পর Xe Services হিসেবে নাম পরিবর্তন করে। পরে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এর কর্তৃত্ব নেয়ার পর এদের নাম হয়ে যায় 'একাডেমি'।

CACI ও টাইটান এর 'টর্চার ফর হায়ার' কার্যক্রমের কথাও বলা যায়। আবু গারিব কারাগারের বন্দিদের নির্যাতনের জন্য এরা কর্মী সাপ্লাই দিত এতে জনগণের মনে এ ধারণা জন্মে যে সরকার এসব নোংরা, বেআইনী ঘটনার দায় অস্বীকার করার জন্যই এসব বেসরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিযুক্ত করেছে। কিন্তু এটা সত্য নয়। অন্তত আইসির ক্ষেত্রে সত্য নয়। ঘটনা অস্বীকার করার চেয়ে বরং আইসি ধরা না পড়ার চেষ্টা করত।

প্রতিটি এজেন্সি নির্দিষ্ট কাজের জন্য কতজন নিয়োগ দিবে এর আইনি সীমারেখা থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেহেতু সরাসরি চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ দেয় না তাই তারা ছিল এই নিয়মের বাইরে। এজেন্সিগুলো যত বেশি টাকা দিয়ে পারে এদেরকে নিয়োগ দিত। তারা এক্ষেত্রে কংগ্রেসের উপকমিটিকে বুঝাত সন্ত্রাসীরা আমাদের বাচ্চাদের ক্ষতি করবে, রাশিয়ানরা আমাদের ইমেইলে আড়ি পেতে আছে। চায়না ক্ষমতার চূড়ায় চলে যাচ্ছে। কংগ্রেস আইসির এরকম হুমকিপূর্ণ চাহিদাকে নাকচ না করে বরং অনুমোদন দিত।

আমি সাংবাদিকদের কাছে যেসব ডকুমেন্ট দিয়েছিলাম এর মধ্যে ২০১৩'র 'কালো বাজেট' ছিল। এই বাজেটের ৬৮% বা ৫২.৬ বিলিয়ন ডলার আইসিকে দেয়া হয়। এই বাজেটে আইসি'র ১,০৭,০৩৫ কর্মীদের জন্যও তহবিল ছিল। যাদের মধ্যে ২১,৮০০ জন ছিল পূর্ণকালীন চুক্তিভিত্তিক কর্মী। এছাড়াও আরো দশ হাজার থেকে একলক্ষ চুক্তিভিত্তিক কর্মী ছিল। তারা এজেন্সিগুলোর সাথে নির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য চুক্তি করত। কিন্তু এই চুক্তিকারীদের তালিকা কখনোই আইসি ব্ল্যাক বাজেটে উল্লেখ করেনি। কারণ এতে পরিষ্কার হয়ে যেত যে, আমেরিকার গোয়েন্দা কার্যক্রম প্রায়ই সরকারি চাকুরেদের দিয়ে না করিয়ে বরং বেসরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মীদেরকে দিয়ে করানো হয়।

অনেকেই ভাবত এটা সুবিধাজনক। কারণ চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের তো আর পেনশন এবং অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হচ্ছে না। প্রকৃত সুবিধা ছিল আইসির সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য। বেসরকারি কোম্পানি থেকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী ভাড়া করার জন্য তারা কংগ্রেস থেকে টাকা চাইত। কংগ্রেসের লোকজন তা অনুমোদন করত। পরবর্তীতে এই আইসি ডিরেক্টর ও কংগ্রেসের লোকজন যখন অবসরে চলে যেত তখন তাদেরকে সেসব বেসরকারি কোম্পানি থেকে বিশাল অংকের টাকায় পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত করে পুরস্কৃত করা হতো। এই চুক্তিভিত্তিক কাজ দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। আর এসব দুর্নীতি চলত সরকারি মদদে। জনগণের টাকা নিয়ে বেসরকারি ঝুলিতে ভরার জন্য এটি আমেরিকার সবচেয়ে আইনসম্মত ও সুবিধাজনক উপায়। গোয়েন্দা নজরদারির বেশিরভাগই বেসরকারিকরণ হয়ে গেলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতেই কোনো ব্যক্তিকে ছাড়পত্র দেয়ার মূল ক্ষমতা ছিল।

আর ছাড়পত্রের আবেদন করতে হলে প্রার্থীদের এমন কোনো চাকরির অফার থাকতে হতো যে চাকরিতে তাদের কাছে ছাড়পত্র চাওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাই সরকারি চাকরি দিয়ে তাদের ক্যারিয়ার শুরু করত। আপনাকে ছাড়পত্র দিয়ে বেসরকারি কোম্পানিকে এক বছর পর্যন্ত সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষা করতে হবে। এই এক বছর আপনাকে বেতন

দেয়া বেসরকারি কোম্পানির জন্য বেশ ব্যয়বহুল। তাই তারা নিয়োগ দিত ইতোমধ্যেই ছাড়পত্র আছে এমন সরকারি কর্মীদের।

এক্ষেত্রে সরকার ব্যাকগ্রাউন্ড চেকের সব খরচ বহন করে কিন্তু এর সুফল ভোগ করে খুব কম। এক্ষেত্রে সরকারকেই একজন প্রার্থীর ছাড়পত্র দেয়ার সব খরচ বহন করতে হয়। তারপর তারা যখন এটা পেয়ে যায় তখন তারা সরকারি কর্মীদের নীল ব্যাজ না নিয়ে বেসরকারি চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সবুজ ব্যাজ গ্রহণ করে। কারণ এই সবুজ ব্যাজে আছে প্রচুর টাকার হাতছানি।

আমার TS/SCI ছাড়পত্র যে সরকারি চাকরি করে পেয়েছিলাম এটি সেই চাকরি ছিল না যেমনটা আমি চাইতাম। আমি ছিলাম ম্যারিল্যান্ড রাজ্যের কলেজ পার্কের ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কাজ করা একজন কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়টি এনএসএকে Center for Advanced Study of Language নামে প্রতিষ্ঠান খুলতে সাহায্য করছিল।

এই প্রতিষ্ঠান কম্পিউটারের সাহায্যে এমন কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে চাচ্ছিল যাতে মানুষ তাড়াতাড়ি কোনো ভাষা শিখতে পারে। এদিকে এনএসএ কম্পিউটারের বিভিন্ন দেশের ভাষা বুঝতে পারার বিষয়টা উন্নত করতে চাচ্ছিল। যেখানে অন্যান্য এজেন্সি হিমশিম খাচ্ছিল আরবি, ফারসি, দারি, পশতু, কুর্দিশ ভাষী ও ভাষান্তর করতে পারে এমন মানুষজন খুঁজে পেতে সেখানে আমি অনেক আমেরিকানকে জানি যাদেরকে নাকচ করা হয় শুধু তাদের পূর্বপুরুষদের জন্মস্থানের জন্য। এনএসএ চাচ্ছিল কম্পিউটারের এমন ব্যবস্থা যাতে বিদেশি ভাষার বার্তাসমূহ বিশ্লেষণ করে তাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যায়।

CASL এর কাজ সম্পর্কে আমার তেমন একটা ধারণা ছিল না। এত উজ্জ্বল ছাড়পত্র নিয়ে আমি যখন সেখানে যোগ দিলাম তখন সেই ভবনটারই কাজ শেষ হয়নি। ভবনের কাজ শেষ হয়ে মূল প্রযুক্তি স্থাপিত হবার আগে পর্যন্ত আমার কাজ ছিল অনেকটা নাইট শিফট সিকিউরিটি গার্ড এর মতো। ভবন নির্মাতারা চলে যাবার পর প্রতিদিন সারা ভবন জুড়ে আমাকে চক্কর কাটতে হতো কেউ শূন্য ভবন জ্বালিয়ে দিল কি না তা দেখার জন্য। আমি ঘন্টার পর ঘণ্টা অডিটোরিয়ামে নতুন স্থাপিত চেয়ারগুলোতে একটু বসতাম, দেয়ালের প্রশংসা করতাম আর রং শুকিয়ে যাওয়া দেখতাম।

একটি শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থায় এই ছিল আমার কর্মজীবন। আমার এতে মোটেও খারাপ লাগেনি। অন্ধকারে শুধু হাঁটাহাঁটি করতাম আর ভাবতাম। আর এভাবেই কোনো কিছু না করেই টাকা পেতাম। দিনের বেলা ঘুমিয়ে কাটিয়েছি কিংবা লিন্ডসির সাথে ওর ফটোগ্রাফি অভিযানের জন্য এখানে ওখানে গিয়েছি। ততদিনে আমার ভালোবাসায় মজে লিন্ডসি অন্য বয়ফ্রেন্ডদের ছেড়ে দিয়েছে।

ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম সরাসরি দেশের সেবা করা যায় এমন টেকনিক্যাল কাজের সুযোগ খুবই কম। এর চেয়ে বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করা যায়। এরা দেশের জন্য কাজ করত মুনাফার আশায়।

সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের কাজ বেশিরভাগই বেসরকারি পর্যায়ের ছিল। ব্যাংক ও সামাজিক গণমাধ্যমগুলো বাইরের লোক দিয়ে সিস্টেম লেভেলের কাজ করাতো। মার্কিন সরকার উদ্ভাবনের জন্য তাদের গোয়েন্দা এজেন্সির সবচেয়ে সংবেদনশীল কাজ করাতো সেইসব মানুষ দিয়ে যারা মূলত এজেন্সির জন্য কাজ করত না।

এজেন্সি গুলো টেকনোলজিক্যাল কোম্পানি থেকে নতুনদেরকে নিয়োগ দিচ্ছিল। তারা সেই নতুনদের হাতেই যেন রাজ্যের চাবি ও রাজত্ব দিয়ে দিচ্ছিল। কেউ জানত না সেই চাবি আর রাজত্ব কীভাবে কাজ করত। এক্ষেত্রে নিজস্ব যুক্তি দাড় করিয়ে খুব আশাবাদী হয়ে জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে চাকরি মেলায় উপস্থিত হলাম। মেলার নাম 'Clearance Jobs'। দ্বৈত অর্থবোধক এই নামটা আমার কাছে বেশ হাস্যকর ঠেকল।

সিআইএ সদর দপ্তরের কাছে ভার্জিনিয়ার টাইসনস কর্নারের রিটজ কার্ল্টনের আলিশান হোটেলে তখন এরকম চাকরি মেলা প্রতি মাসেই হতো। আবার ফোর্ট মিডের এনএসএ হেডকোয়ার্টারের পাশে বিভিন্ন সাধারণ হোটেলেও হতো। চাকরিপ্রার্থীর চেয়ে নিয়োগদাতার আধিক্যই বেশি ছিল। নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব মেলায় প্রচুর টাকা খরচ করত। কেননা এসব মেলাতেই দক্ষ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ও ছাড়পত্রপ্রাপ্ত প্রার্থীরা আসতো।

প্রার্থী হিসেবে চুক্তিকারীদের জগতে যখন প্রবেশ করলাম তখন মনে হচ্ছিল এটা ম্যারিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় নয়। এ যেন Lockheed Martin, BAE Systems, Booz Allen Hamilton, DynCorp, Titan, CACI, SAIC, COMSO'র মতো প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেছি।

সেখানে এসব বড় বড় চুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের বুথ ছিল। সেগুলো ছিল খুব সাজানো গোছানো। সিভি জমা দেয়ার পর তারা সরকারি চাকরির লম্বা তালিকা দেখাল। যেহেতু এই চাকরিগুলো বেশ গোপনীয় ছিল তাই চাকরির কোনো বিস্তারিত বিবরণ থাকত না শুধু সাংকেতিক কিছু শব্দ থাকত। বিভিন্ন কোম্পানির পজিশনের মধ্যে পার্থক্য ধরা যেত তাদের অভিজ্ঞতা চাহিদা, সার্টিফিকেট ও গোয়েন্দা ছাড়পত্রের ধরন দেখে।

২০১৩ এর তথ্যফাঁসের পর সরকারের কাছে আমি ছিলাম একজন চুক্তিকারী বা একজন পুরনো ডেল কর্মকর্তা। অর্থাৎ আমার কাছে সরকারি কর্মীদের সমমান ছাড়পত্র নেই। সরকার আমাকে 'Job hopping' বা চাকরি বদলানোর দোষ দেয়। বোঝায় যে আমি বিগড়ে যাওয়া কর্মী যার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বনিবনা হতো না।

আইসি ভালো করেই জানত সব চুক্তিভিত্তিক কর্মীই চাকরি পরিবর্তন করে। এই গতিশীলতা এজেন্সিগুলোই তৈরি করেছিল আর এ থেকেই তারা মুনাফা পেত।

জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কোনো টেকনোলজিক্যাল চুক্তির ক্ষেত্রে আপনি হয়তো কোনো এজেন্সিতে শারীরিকভাবে কর্মরত আছেন কিন্তু কাগজপত্র অনুযায়ী আপনি 'Dell' নয়তো 'Lopheed Martin' এর হয়ে বা এদের অধীন কোনো ছোট ফার্মের হয়ে কাজ করছেন। আপনার বিজনেস কার্ডে নতুন নিয়োগদাতা ও নতুন পজিশন উল্লেখ থাকলেও কিছুই বদলাবে না। তবু আপনি গোয়েন্দা এজেন্সিতে বসে কাজ করবেন। আপনার সহকর্মীরাও বাস্তবে কোনো কোম্পানির হয়ে কাজ করছে।

আমার চুক্তিভিত্তিক কাজের সময়কাল আমার মনে নেই। আমার সিভির কপিটাও আমার কাছে নেই। সেই Edward_Snowden_Resume.doc ফাইলটি আমার বাসার কম্পিউটারে ছিল। যেটা এফবিআই জব্দ করেছে।

আমার প্রথম চুক্তিতে করা কাজ ছিল COMSO'র সাথে। সিআইএ BAE System-কে ভাড়া করে। BAE Systems ভাড়া করে COMSO-কে। British Aerospace-এর আমেরিকান উপবিভাগ ছিল BAE Systems। COMSO ছিল এর নিয়োগদাতা। আমি জব ফেয়ারে যত কোম্পানির সাথে কথা বলেছি এর মধ্যে COMSO ছিল সবচেয়ে ক্ষুধার্ত। কারণ এটি ছিল ছোট। আমি কখনোই জানতে পারিনি এর বিভিন্ন শব্দের পূর্ণরূপ কী বা আদৌ আছে কিনা। আমি COMSO বা BAE Systems-এর অফিসে কাজ করিনি। সিআইএ হেডকোয়ার্টারে কাজ করেছি। ম্যারিল্যান্ডের গ্রিনব্যাল্টে অবস্থিত COMSO অফিসে মাত্র দুই কি তিনবার গিয়েছিলাম। প্রথমবার গিয়েছিলাম কাগজপত্রর কাজে আর বেতন নিয়ে কথা বলার জন্য।

CASL এ বছরে ৩০ হাজার ডলারে কাজ করতাম। কিন্তু সেখানে প্রযুক্তি নিয়ে তেমন একটা কাজ ছিল না। COMSO-তে ৫০ হাজার ডলার দাবি করলাম। এই পরিমাণ বলার সাথে সাথেই টেবিলের অপর পাশের লোকটি বলল, ৬০ হাজার ডলার হলে কেমন হয়। আমি তখন এত অনভিজ্ঞ ছিলাম যে বুঝতেই পারলাম না সে কেন এত বেশি বেতন দিয়ে আমাকে রাখছে। পরে বুঝতে পারলাম COMSO, BAE ও আরো কোম্পানিগুলো যেসব চুক্তি করত একে বলা হতো 'Cost Plus'।

COMSO'র লোকটি ৬২ হাজার ডলার দেয়ার কথা বলল। এর ফলে আমি আবার নাইট শিফটে কাজ করতে থাকলাম। তারপর আমরা হ্যান্ডশেক করলাম। সে নিজেকে আমার ম্যানেজার বলে দাবি করল। সে বলল আমি সরাসরি সিআইএ থেকে কাজের আদেশ পাব। সব ঠিক থাকলে আমাদের আর দেখা হবে না।

গোয়েন্দা মুভিতে এরকম বলা মানে বোঝায় আমি কোনো বিপজ্জনক মিশনে যাচ্ছি। সেখানে মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার গোয়েন্দা জীবনে এর মানে হলো চাকরিতে আপনাকে স্বাগতম। এরই মধ্যে আমি দরজা পর্যন্ত চলে আসলাম। ততক্ষণে সে হয়তো আমার চেহারাটাই ভুলে গেছে।

খুব খুশিমনে মিটিং শেষে বেরিয়ে আসলাম। কিন্তু গাড়িতে করে ফিরে আসার পথে মনে পড়ল আমি যদি ম্যারিল্যান্ডের এলিকট সিটিতে লিন্ডসির কাছাকাছি থাকি কিন্তু ভার্জিনিয়ার সিআইএ সদর দপ্তরে কাজ করি তাহলে আমার যাতায়াত পথের দূরত্ব হবে যেতে আসতে দেড় ঘণ্টা করে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কারণ লিন্ডসিকে ভার্জিনিয়ায় আসার কথা বলতে পারব না। সে MICA-তে মাত্র দ্বিতীয় বর্ষে আছে। আর প্রতি সপ্তাহে তিনদিন ওর ক্লাস থাকে। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম আমি COMSO'র কাছে ছোট বাসা নিব। তারপর ছুটির দিন আমি ম্যারিল্যান্ড যাব বা লিন্ডসি আমার কাছে আসবে। আমি খুব সস্তা জায়গা খুঁজছিলাম। সস্তা বাসা চাচ্ছিলাম যাতে আমি খরচ বহন করতে পারি। আর সাথে সুন্দর বাসাও চাচ্ছিলাম যাতে লিন্ডসি থাকতে পারে। বাসা খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। ভার্জিনিয়ার যেখানে সিআইএ সদর দপ্তর ও এর কর্মীদের বসবাস ছিল ওই জায়গাটায় বাসার দাম ছিল অনেক বেশি।

ব্রাউজিং করে শীঘ্রই আমি একটি বাসা পেলাম এটা আমার বাজেটের মধ্যে এবং আমার সিআইএ হেডকোয়ার্টার থেকে পনের মিনিটের পথ। ব্যাচেলর বাসা মনে করে সেখানে গেলাম। কিন্তু দেখলাম কাঁচঘেরা আধুনিক বাড়ি। গাছপালা ভরপুর পরিপাটি প্রবেশপথ। বাসায় ঢুকার পথে আমার নাকে কুমড়া তরকারির গন্ধ এসে লাগছিল।

গ্যারি নামে এক লোক দরজা খুলল। একটু বয়স্ক ব্যক্তি। ইমেইলে তিনি আমাকে 'ডিয়ার এডওয়ার্ড' বলায় আমার কাছে বয়স্কই মনে হয়েছিল। বেশ ভালো পোশাক পরিহিত ছিল। দেখতে বেশ লম্বা। ধূসররঙা চুল। তার পরনে ছিল স্যুট। এর উপর অ্যাপ্রোন। সে আমাকে বেশ ভদ্রভবে অপেক্ষা করতে বলল। সে রান্নাঘরে আপেলে লবঙ্গ গেঁথে সেটা আবার জায়ফল, চিনি, দারুচিনির সাথে মিশিয়ে কি জানি করছিল। আপেল ওভেনে বেক করতে দিয়ে গ্যারি আমাকে রুম, বেসমেন্ট দেখাল আর বলল আমি তাড়াতাড়ি সেখানে উঠতে পারব। আমি অফার গ্রহণ করে সিকিউরিটি ডিপোজিট আর বাড়িভাড়া দিয়ে দিলাম। তারপর সে আমাকে বাসার কিছু নিয়ম বলে দিলো। সেগুলো ছিল–ঘর অপরিচ্ছন্ন রাখা যাবে না, কোনো পোষা প্রাণী রাখা যাবে না, কোনো রাতের মেহমান আনা যাবে না। প্রথম নিয়ম আমি শুরুতেই ভাঙলাম। দ্বিতীয় নিয়ম ভাঙ্গার কোনো ইচ্ছা ছিল না। আর তৃতীয় নিয়ম গ্যারি লিন্ডসির ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছিল।

দীক্ষাদান

আপনারা হয়তো হলিউডের কোনো গোয়েন্দা ছবি বা নাটকে 'CIA Headquarters, Langley, Virginia' নামটা দেখে থাকবেন। তারপর দেখে থাকবেন মার্বেল পাথরঘেরা লবি, তারকা-চিহ্ন খচিত দেয়াল আর CIA সিলযুক্ত মেঝে। ল্যাংলী হলো ঐ জায়গাটির ঐতিহাসিক নাম। হলিউড শুধু এই নামটিকেই ব্যবহার করে। সিআইএ সদর দপ্তর মূলত ভার্জিনিয়ার ম্যাকলিনে। ভিআইপি আর বহিরাগত কর্তাব্যক্তি ছাড়া এই লবি দিয়ে কেউ আসে না। এটি মূলত পুরনো সদর দপ্তর ভবন। সিআইএ'র বেশিরভাগ কর্মীরা নতুন সদর দপ্তর ভবনে কাজ করে। ওইদিনই প্রথম সিআইএ সদর দপ্তরে গিয়েছিলাম ওইদিনসহ হাতেগোনা কদিন দিনের আলোতে সিআইএ সদর দপ্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম। বেশিরভাগই সময়ই কাটিয়েছি আন্ডারগ্রাউন্ডে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি কক্ষে। এর দেয়ালগুলো ছিল সিমেন্টের ব্লক দিয়ে তৈরি। আন্ডারগ্রাউন্ডটি ছিল পারমাণবিক বোমার আঘাত থেকে সুরক্ষিত থাকার সব সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তৈরি।

"আচ্ছা তো এটাই বুঝি ছায়া সরকার?" একজন বলে উঠল। বাকিরা হো হো করে হাসছিল। তারা সবাই হয়তো এলিট শ্রেণির লোকদের দেখার আশা করছিল। আর আমি খুঁজছিলাম আমার বাবা-মার মতো সিভিল সার্ভিসের মানুষজন। আগত সবাই ছিলাম কম্পিউটারের দক্ষ ও বয়সে তরুণ। জীবনে প্রথমবার সবাই পেশাদারদের মতো খুব পরিপাটি পোশাক পরে এসেছে। এই পোশাকের নিচে কারো শরীরের ট্যাটু লুকিয়ে ছিল। কারো চুলের রং তখনো বুঝা যাচ্ছিল। কারো ছিদ্র করা কান দেখেই বুঝা যাচ্ছে, তাদের কানে কিছু ছিল। আমাদের সবার পরনে ছিল চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের সবুজ ব্যাজ। আমরা ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করব এরকম কিছুই আমাদেরকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না।

আজকের বৈঠকটি ছিল আমাদেরকে দীক্ষাদান করার জন্য। আমাদেরকে বোঝানো হচ্ছিল আমরা হলাম এলিট, আমরা বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। আমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে দেশের গোপন বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য যা অনেক সময় কংগ্রেস এবং বিচারবিভাগও সামাল দিতে পারে না।

বৈঠকে বক্তাদের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল কম্পিউটারে দক্ষদের এটা বলার প্রয়োজন নেই যে তাদের বিশেষ ও স্বতন্ত্র জ্ঞান আছে। তারা এই দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নাগরিকদের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। গোয়েন্দা কমিউনিটি ও টেক ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। দুটোই নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রাখা নিয়ে গর্ব করে। তারা মনে করে তাদের কাছে সব সমস্যার সমাধান আছে। এগুলো তারা একতরফা

ভাবে মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়। তার মনে করে এসব সমাধান তথ্যের ওপর নির্ভর করে। তারা উভয়ে মনে করে এই সমস্যাগুলোর রাজনীতির সাথে সম্পর্ক নেই।

আইসিতে প্রযুক্তিতে খুব দক্ষ হওয়ার সাথে আপনার মানসিকতাতেও এটি খুব প্রভাব বিস্তার করবে। হঠাৎ করে আপনার সামনে বিভিন্ন জানাশোনা ইতিহাসের কাহিনি উন্মোচন হতে থাকবে। আর তাছাড়াও আপনি হুট করে মিথ্যা বলার, ছদ্মবেশ ধারণ করার, গোপনীয়তার লাইসেন্স পেয়ে যাবেন। অনেকেই এর ফলে বিশ্বাস করতে শুরু করে আনুগত্য হলো প্রতিষ্ঠানের প্রতি, আইনের শাসনের প্রতি নয়।

বৈঠকে বসে আমি কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। কোনোমতে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছিলাম। তখন 'প্রাথমিক কার্যকরী নিরাপত্তা পদ্ধতি' নিয়ে কথা চলছিল। এটি নজরদারির একটি অংশ। আইসির ভাষায় একে ট্রেডক্রাফট বলে। এগুলো অনেকটা মাথা খারাপ করার মতো কথা–কাউকে বলো না তুমি কার জন্য কাজ করো। গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোথাও ফেলে এসো না। তোমার অরক্ষিত ফোন নিয়ে সুরক্ষিত অফিসে এসো না। সেটিতে কাজের ব্যাপারে কোন কথা বলো না। শপিং মলে সিআইএ ব্যাজ লাগিয়ে ঘুরতে যেয়ো না। মানুষকে বলো না, "এই দেখো আমি সিআইএ'র জন্য কাজ করি।"

তারপর লাইট অফ হয়ে গেল। পাওয়ার পয়েন্টে কতগুলো চেহারা দেখা গেল। তারা ছিল প্রাক্তন সরকারি ও চুক্তিভিত্তিক গোয়েন্দাকর্মী যারা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য ছিল। তারা আইসির সাথে শত্রুতা করেছিল ও আইসি'র নিয়ম ভঙ্গ করেছিল। তাদের ঔদ্ধত্য তাদের ধ্বংসের দিকে যায় ও কারাগারে নিক্ষেপ করে। তারা এখন অন্ধকার কোনো বেসমেন্টে বন্দি এবং কেউ কেউ হয়তো মৃত্যু পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।

আইসিতে আমার ক্যারিয়ার শেষ হবার বুঝতে পারলাম সেসব জঘন্য, অযোগ্য, দেশদ্রোহী মানুষগুলো আসলে ছিল সেসব আদর্শবান মানুষ যারা দেশের মানুষদের স্বার্থে তথ্যফাঁস করেছিল।

এখন সেই একই স্ক্রিনে বিশ বা তার চেয়েও বেশি মানুষের সামনে আমার চেহারাটা দেখানোর কথা। সাংবাদিকদের কাছে যেসব তথ্য দিয়েছিলাম সেসব তথ্যকে সরকার হয়তো শত্রুকে তথ্য বেঁচে দেয়ার অভিযোগ দিয়ে চালিয়ে দেয়। আমি সিআইএ'তে যখন যোগ দিই তখন এর নৈতিকতা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে।

৯/১১ এর পর কংগ্রেস ও শাসন বিভাগ কিছু কঠোর আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা প্রধান সিআইএ ও পুরো আমেরিকার সব গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। ৯/১১ এর ঘটনায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা প্রধানকে তার এই দ্বৈত পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

অন্যান্য সব গোয়েন্দা এজেন্সির উপর সিআইএ'র অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে যে কর্তৃত্ব ছিল তা জর্জ টেনেটের অব্যাহতির সাথে হারিয়ে গেল।

টেনেটের অব্যাহতি ও পদাবনতি ছিল সেই রাজনৈতিক শ্রেণির বিশ্বাসঘাতকতা, সিআইএ যে রাজনৈতিক শ্রেণির সেবা করত। শুরু হলো ছাঁটাই ও শাস্তির সংস্কৃতি।

সিআইএ'র প্রাক্তন অফিসার ও ফ্লোরিডার রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য পর্টার গসকে গোয়েন্দা এজেন্সির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। একজন রাজনীতিবিদের সিআইএ-তে নিয়োগের ফলে সিআইএ রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ডিরেক্টর গস এসেই কর্মীদের জোরপূর্বক অবসর গ্রহণ, পদ থেকে অস্থায়ী অব্যাহতি ও বরখাস্ত করতে থাকেন। এর ফলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কর্মীশূন্য হতে থাকে আর চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের উপর নির্ভর হয়ে যায়। মানুষ অভ্যন্তরীণ এসব বিষয়ে তেমন কিছুই জানত না, ধন্যবাদ সেসব তথ্যফাঁস ও তথ্য উন্মোচনকে।

তখন সিআইএ কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হলো। মূল গোয়েন্দা নজরদারির কাজ করত Directorate of Operations (DO)। Directorate of Intelligence (DI) নজরদারির ফলাফল বিশ্লেষণ করত। Directorate of Science and Technology (DST) কম্পিউটার, যোগাযোগের সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র গোয়েন্দাদের সাপ্লাই দিত এবং এসবের ব্যবহার শিখাতো। Directorate of Administration (DA) ছিল আইনজীবীসহ আরো পেশাদারদের নিয়ে যারা সংস্থার কাজের সাথে সমন্বয় করত ও সরকারের সাথে সংযোগ রক্ষা করত। সবশেষে ছিল DS বা the Directorate of Support। এটি সবচেয়ে আজব ও সবচেয়ে বড় পরিচালনা পর্ষদ ছিল।

DS এর সদস্যরা ছিল এজেন্সিতে কাজ করা প্রত্যেক ব্যক্তি। এর প্রযুক্তিবিদ, ডাক্তার, ক্যাফেটেরিয়া ও জিমের কর্মী, গেইটের নিরাপত্তা প্রহরীসহ সবাই। এর কাজ ছিল সিআইএ'র বৈশ্বিক যোগাযোগ অবকাঠামো পরিচালনা করা। এটি গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো বিশ্লেষক ও প্রশাসকদের কাছে পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করত। যেসব কর্মী সিআইএ'কে প্রযুক্তি সহায়তা দিত, এর সার্ভার পরিচালনা করত, সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত। তাদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা ছিল। এই কর্মীদের বেশিরভাগই ছিল তরুণ ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী।

আমাদের দল DS-এর সাথে যুক্ত ছিল। আমাদের কাজ ছিল সিআইএ'র ওয়াশিংটন-মেট্রোপলিটান সার্ভার আর্কিটেকচার পরিচালনা করা। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিআইএ'র সব সার্ভার ও ব্যয়বহুল সব কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক ও ডাটাবেজসহ প্রেরিত, গৃহীত ও জমাকৃত সব তথ্য পরিচালনা করা।

সংস্থাটির গুরুত্বপূর্ণ সার্ভারের অর্ধেকই আছে নতুন সদর দপ্তর ভবনে। এখানেই আমার দল কাজ করত। আর বাকি অর্ধেক ছিল পুরনো সদর দপ্তর ভবনে। প্রতিটি সদর দপ্তর এর সার্ভার তাদের ভবনের অপর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। যাতে কোনো ভবন বোমায় উড়ে গেলেও বেশি যন্ত্রপাতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সিআইএ'র একটি অংশ ছিল SIGINT (Signal Intelligence)। আরেকটি অংশ ছিল HUMINT (Human Intelligence)। আমি কাজ করতাম COMSEC (Communications Security) এ। আমার কাজ ছিল Cryptographic বা সাংকেতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। অর্থাৎ বিভিন্ন কোড নিয়ে। এই কোডগুলো ছিল এজেন্সির সবচেয়ে গোপন বিষয়। কারণ এগুলো অন্যান্য গোয়েন্দা এজেন্সির গোপনীয়তাও সংরক্ষণ করত। এ সংকেতসমূহ বিভিন্ন উপায়ে সার্ভারে সংরক্ষিত হতো। আর এই সার্ভারসমূহ আমি পরিচালনা করতাম। আমার দল সেসব কিছুসংখ্যক দলের মধ্যে ছিল যারা এসব সার্ভারে কাজ করত ও এতে প্রবেশ করতে পারত।

সিআইএ'র নিরাপত্তা পরিবেষ্টিত অফিসগুলোকে বলা হতো ভল্ট। আমার দলের ভল্ট ছিল সিআইএ হেল্প ডেস্ক সেকশনের একটু আগে। দিনের বেলা হেল্প ডেস্ক সেকশনে আমার বাবা-মার বয়সি লোকজন কাজ করত। সিআইএ'র প্রযুক্তি বিভাগের এই জায়গাটিতেই আমি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নারী দেখেছি। তাদের কারো নীল ব্যাজ ছিল। অর্থাৎ তারা সরকারি কর্মী। তাদেরকে বলা হতো 'Govvies' আর বাকিরা ছিল চুক্তিভিত্তিক। তারা সারাদিন ফোন রিসিভ করত, হেল্প ডেস্কে আসা লোকদের সাথে কথা বলতো। তাদের কাজ ছিল অনেকটা কল সেন্টারের মতো, পাসওয়ার্ড রিসেট করা, একাউন্ট আনলক করা। যদি এই Govvies রা তাদের সামান্য প্রযুক্তি জ্ঞান দিয়ে সমস্যা সমাধান করতে না পারে তাহলে তা বিশেষায়িত দলের কাছে পাঠিয়ে দিত। এ ধরনের সমস্যাগুলো বেশিরভাগই ঘটত কাবুল, বাগদাদ, বোগোটা বা প্যারিসে সিআইএ'র বৈদেশিক স্টেশনে। আমার স্বীকার করতে লজ্জাই লাগছে যে, আমি হেল্প ডেস্কের সামনে দিয়ে বেশ গর্ব ভরে আমার ভল্টের দিকে হেঁটে যেতাম তাদের সামনে দিয়ে সেই ভল্টে যেতাম যেখানে তারা কখনো প্রবেশ করতে পারবে না।

কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি এখানে আমার প্রবেশাধিকার আছে হয়তো সিস্টেমটা সমস্যাগ্রস্ত বলেই। সরকার নিজের কর্মী দিয়ে কাজ না করিয়ে চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে কাজ করাচ্ছে। আর এভাবে পরিচালনা করার অর্থ হলো সরকার এতে যথাযথ গুরুত্ব দিচ্ছে না। সিআইএ হেল্প ডেস্কের এই পথটি আমার কাছে ছিল গোয়েন্দা এজেন্সিতে জেনারেশনাল ও কালচারাল পরিবর্তনের প্রতীক। আমি ছিলাম এই পরিবর্তনের অংশ। পুরনো কর্মীরা

নতুনদেরকে এজেন্সিতে স্বাগত জানাচ্ছে। তাদের উন্নতির পথ সুগম করে দিচ্ছে ও টেকনোলজিক্যাল সিস্টেমের ওপর ক্ষমতা গ্রহণ করতে দিচ্ছে।

হেল্প ডেস্কের Govvies'দের আমার প্রতি উদারতার জন্য আমি তাদেরকে ভালোবাসতে শুরু করলাম। আমার কাজ না হলেও আমি তাদেরকে সহায়তা করতাম। তাই তারা আমার প্রশংসা করত।

তাদের মধ্যে অনেকেই গোয়েন্দা হিসেবে দেশের বাইরে কর্মরত ছিল। তারপর তারা যখন দেশে ফিরে আসে তখন উপযুক্ত প্রযুক্তি জ্ঞান না থাকায় তাদের ক্যারিয়ারের বাকি সময়টা হেল্প ডেস্কে কাজ করতে থাকে।

এই Govvies'দের সম্মান অর্জন করতে পেরে আমি গর্বিত ছিলাম। যদিও আমার দলের অনেকেই এই মেধাবী ও নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের নিয়ে দুঃখবোধ করত, কেউবা তাদের নিয়ে মজা করত। এই মানুষগুলো স্বল্প যশ, স্বল্প সম্মান পেয়েও এজেন্সির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় কাজ করেছে। অবশেষে পুরস্কার হিসেবে তারা পেল নির্জন হলওয়েতে ফোন ধরার চাকরি।

***

কয়েক সপ্তাহ দিনের শিফটে কাজ করার পর রাতের শিফটে কাজ করতে হলো। সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা। এই সময়টা হেল্প ডেস্কের কর্মীরা ঝিমাতো আর পুরো এজেন্সি হয়ে যেত প্রাণহীন। রাত ১০টা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত সিআইএ প্রায় জনশূন্য থাকত। এ যেন রহস্যে ভরপুর ভূতুড়ে কোনো জায়গা। সব চলন্ত সিঁড়ি বন্ধ থাকত। তাই এটি হেঁটে হেঁটে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করতে হতো। অর্ধেক লিফট চালু থাকত। দিনের বেলা শোরগোলের জন্য এদের শব্দ শোনাই যেত না কিন্তু রাতের বেলা খুব জোরে শব্দ হতো। প্রাক্তন সিআইএ প্রধানদের ছবি দেখে মনে হতো তারা যেন মিটিমিটি তাকিয়ে আছে। আর ঈগলের মূর্তি দেখে মনে হতো কোনো জন্তু। যে কিনা এখনই এসে আমাকে খেয়ে ফেলবে।

সিআইএ করিডরে কিছু লাইটের ব্যবস্থা করেছিল যেগুলো পথ চলার সাথে সাথে জ্বলে উঠত। তখন মনে হতো কেউ ফলো করছে। এর সাথে আছে নিজের পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি। সপ্তাহে তিনদিন কাজ করতে হতো। দুদিন ছুটি ছিল। প্রতি রাতে বারো ঘণ্টার কাজ করতে হতো।

আমি হেল্প ডেস্কের অপর পাশের সুরক্ষিত অফিসে বসতাম। বিশটা ডেস্কের প্রতিটাতে দুই-তিনটা করে কম্পিউটার টার্মিনাল ছিল। ওখানে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসত। তাদের কাজটা ছিল গতানুগতিক। যেন তারা বিপর্যয় আসার অপেক্ষা করছে। এসব সমস্যার সমাধান জটিল কিছু ছিল না। সমস্যা দেখা দিলে লগ ইন করে তা ঠিক করতাম। আর নয়তো নতুন সদর দপ্তর ভবনের গোপন কক্ষে ডাটা সেন্টারে গিয়ে ঠিকঠাক করতে হতো। কিংবা সুড়ঙ্গ

দিয়ে অর্ধেক মাইল হেঁটে গিয়ে পুরনো সদর দপ্তর ভবনের ডাটা সেন্টারের যন্ত্রপাতি মেরামত করতাম।

রাতে সিআইএ'র সম্পূর্ণ সার্ভার আর্কিটেকচারের কাজ করার জন্য আমার সাথে আরেক জন লোক ছিল। তার নাম ছিল ফ্রাংক। আমাদের দলের সবার মধ্যে সে ছিল সব দিক দিয়ে একটু ব্যতিক্রম। রাজনৈতিকভাবে সে ছিল লিবারেটদের সমর্থক। প্রযুক্তির বাইরে সে রহস্য ও গোয়েন্দা বই পড়তে পছন্দ করত। তার বয়স পঞ্চাশের মতো হবে। একসময় সে নেভির রেডিও অপারেটর ছিল। চুক্তিভিত্তিক কর্মী হয়ে যাওয়ায় সে কল সেন্টারের পদ থেকে বেঁচে গেছে।

ফ্রাংকের সাথে দেখা হওয়ার পর ভাবতাম আমার এই রাতগুলো যদি CASL এর সেই রাতগুলোর মতো হতো। কারণ সত্যি বলতে ফ্রাংক তেমন কোনো কাজই করত না। সে আমাকে ও বাকিদেরকে বলত সে কম্পিউটারের কিছুই জানে না। সে বুঝতে পারছে না তারা তাকে এত গুরুত্বপূর্ণ দলে কেনো দিলো। সে বলত, 'কংগ্রেস ও আয়করের পর, চুক্তিভিত্তিক কাজ হলো আমেরিকার তৃতীয় সর্বোচ্চ কেলংকারী'। তারা যখন তাকে সার্ভার টিমে দিল তখন সে তার বসকে বলেছিল সে এসব কাজের কিছুই জানে না। কিন্তু তারা তার কোনো কথাই শুনেনি। সে সারা দিন বই পড়ত। মাঝেমধ্যে কার্ড খেলত। আর তার প্রাক্তন স্ত্রী ও গার্লফ্রেন্ডদের স্মৃতিচারণা করত।

সার্ভারে সমস্যা হলে সে শুধু দিনের শিফটে রিপোর্ট করত। দিনের শিফট প্রতিদিন এসে ফ্রাংকের এসব রিপোর্ট দেখে বিরক্ত হতো। তার সাথে কয়েক সপ্তাহ কাজ করার পর বুঝলাম সে এখনো চাকরিতে আছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে। এটা বোঝার জন্য তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম কোন সিআইএ কর্মকর্তা বা অন্য কোন গোয়েন্দা এজেন্সির কর্মকর্তার সাথে সে নেভিতে কাজ করেছে। কিন্তু নেভির সব প্রবীণ সেনা এজেন্সির অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিল। আমরা অনেক্ষণ কথা বলার পর হঠাৎ সে চিন্তিত হয়ে বলল, "আমাকে টেপ বদলাতে হবে।"

আমার কোনো ধারণাই ছিল না সে কী বলছিল। সে আমাদের ভল্টের ধূসর দরজাটির দিকে গেল। দরজার ওপাশেই ছিল নোংরা সিড়ি যেটা সরাসরি ডাটা সেন্টারের দিকে নেমে গেছে। সেটি ঠান্ডা, অন্ধকার একটি কক্ষ। আমরা একটু আগে সরাসরি এর উপরেই বসে ছিলাম। এই অন্ধকার কক্ষে ছিল লাল, নীল মিটমিটে এলইডি লাইট। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যানগুলো মূল্যবান যন্ত্রপাতিকে শীতল রাখত যাতে এগুলো নষ্ট না হয়। ফ্রাংক কক্ষের একটি জীর্ণ জায়গায় গিয়ে দাড়াল। ওই জায়গাটাতে ডিরেক্টর অফ অপারেশনের যন্ত্রপাতির মজুদ ছিল। সে পুরনো একটি কম্পিউটার ডেস্কে বসল। এই কম্পিউটারটি বেশ পুরনো। আমার বাবার কোস্ট গার্ড ল্যাবে দেখা কম্পিউটারগুলোর চেয়েও অনেক আগের। আশি বা নব্বই শতকের সময়কার। এত প্রাচীন কম্পিউটার

ছিল যে দেখতে মেশিন মনে হচ্ছিল। এতে ছোট টেপ চলছিল। এটা হয়তো স্মিথসোনিয়ানদের সময়কার।

মেশিনের পাশে একটি সিন্দুক ছিল। ফ্রাংক এটা খুলল। সে টেপ খুলে সেই সিন্দুকে রেখে দিল। তারপর আরেকটি পুরনো টেপ সিন্দুক থেকে বের করে মেশিনে লাগিয়ে দিল। সে পুরনো কীবোর্ডে ক্লিক করছিল এর মনিটর কাজ করছিল না। কিন্তু তবু ফ্রাংক আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করছিল। টেপটি হুট করে ঘুরতে শুরু করল। ফ্রাংকের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল।

সে বলল, "এটি এই ভবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। এজেন্সি আধুনিক প্রযুক্তিতে বিশ্বাস করে না। তারা তাদের সার্ভারকেও বিশ্বাস করে না। এগুলো যেকোনো সময় নষ্ট হয়ে সব তথ্য হারিয়ে যেতে পারে। কিছুই যাতে না হারায় তাই সব কিছু এই টেপে সংরক্ষিত হয়।"

"তো তুমি এই টেপে স্টোরেজ ব্যাকআপ করছো?"

"টেপে স্টোরেজ ব্যাকআপ পুরনো একটি পদ্ধতি। কিন্তু বিশ্বস্ত। টেপ কখনো নষ্ট হওয়ার কথা না।"

"কিন্তু এই টেপ এ কী আছে? ব্যক্তিগত কিছু নাকি গোয়েন্দা তথ্য?"

ফ্রাংক তার গালে হাত রেখে খুব গভীরভাবে চিন্তা করার ভান করে বলল, "এড, আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই না। এগুলো খুব স্পর্শকাতর তথ্য। খুব।" ফ্রাংক হাসতে হাসতে উপরে চলে গেল। আমি ভল্টের অন্ধকার ঘরে বাকরুদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে রইলাম।

ফ্রাংক এই টেপ বদলের কাজটা পরের রাতেও করল। এর পরের রাতেও একই কাজ করল। আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম এজেন্সি কেনো ফ্রাংককে কাজে রেখেছিল। সে সন্ধ্যা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কাজ করতে আগ্রহী ছিল। তাছাড়া সে টেপ এর বিভিন্ন সিস্টেম সম্পর্কে জ্ঞান রাখত পুরনো সময়ের মানুষজনের মধ্যে যারা টেপ সম্পর্কে জ্ঞান রাখত তাদের সবারই পরিবার ছিল। কিন্তু ফ্রাংক ছিল ব্যাচেলর। এবং সে আগের সময়কার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।

এদিকে আমি আমার সব কাজকে স্বয়ংক্রিয় করার উপায় খুঁজে পেলাম। বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট অটোমেটিকালি আপডেট সার্ভারে জমা হচ্ছিল। হারিয়ে যাওয়া নেটওয়ার্ক সংযোগগুলো আবার রিস্টোর হচ্ছিল।

আমার কাছে তাই তখন অগাধ সময়। রাতে আমি যা চাইতাম তাই করতে পারতাম। ফ্রাংকের সাথে লম্বা একটা সময় রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে গল্প করতে পারতাম। কিন্তু রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় হলে সে উপন্যাসে ডুব দিত নয়তো ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে পিজ্জা খেত কিংবা জিমে চলে যেত। তখন আমি অনলাইনে চলে যেতাম।

সিআইএ'তে অনলাইন প্রবেশ করলে একটি বক্স আসে। ওটাতে আপনি যা করছেন তা রেকর্ড হয়। আপনি এজেন্সিতে কর্মরত থাকাকালীন এই বক্স

আপনার স্ক্রিনে ভেসে উঠবে। আইসি কর্মীদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলেই তারা নাগরিক জীবন নিয়ে চিন্তা দেখায় না। এ কারণে না যে আধুনিক নজরদারি কীভাবে আমেরিকাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে তা নিয়ে তাদের কাছে তথ্য আছে। বরং তাদের বস'রা তাদের ওপর নজর রাখছে।

সিআইএ'র নিজস্ব ওয়েব ও ইন্টারনেট আছে। ফেসবুকের মতো তাদের নিজস্ব সাইট আছে যেটাতে গোয়েন্দারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। তাদের নিজেদের উইকিপিডিয়া আছে। এটাতে তাদের সংস্থার বিভিন্ন টিম, মিশন, প্রজেক্টের কথা আছে। তাদের নিজস্ব গুগল আছে। এটা গুগল প্রদত্ত। এতে তারা তাদের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক সার্চ করতে পারে। সিআইএ'র প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। এতে তাদের বিভিন্ন মিটিং ও প্রেজেন্টেশন নিয়ে পোস্ট দেয়া হয়।

ফ্রাংক বলেছিল, সিআইএ'র অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্কে বেশিরভাগই এলিয়েন ও ৯/১১ সার্চ করা হয়। কিন্তু এসব সার্চ করে কোনো সদুত্তর পাওয়া যাবে না। আমি নিজেও সার্চ করেছিলাম। সত্যি বলতে এলিয়েনরা কখনোই পৃথিবীতে যোগাযোগ করেনি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সাথে তো মোটেই না। কিন্তু আল-কায়েদার আমাদের মিত্র সৌদির সাথে অবশ্যই গভীর সম্পর্ক আছে। অন্য দুটি দেশের সাথে আমরা যুদ্ধ শুরু করার সাথে সাথে এ বিষয়টি বুশের হোয়াইট হাউস থেকে সন্দেহাতীতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে একটা জিনিস যেটা অসংগঠিত সিআইএ তখন বুঝতে পারেনি এবং সিলিকন ভ্যালির বাইরে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারাও বুঝেনি যে, কম্পিউটারের লোকরা সব জানে বা তাদের সবকিছু জানার কথা। এই কর্মীরা যত বেশি উচ্চপদস্থ হবে তত বেশি তাদের ভার্চুয়াল এক্সেস থাকবে। অবশ্য সবার মধ্যে সবকিছু জানার আগ্রহ থাকে না।

আমার ছোটবেলা থেকেই সবকিছু কীভাবে কাজ করে, কীভাবে বিভিন্ন সিস্টেম একত্রিত হয়ে কাজকে পরিণতি দেয় তা জানার আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহ থেকেই সিআইএ সিস্টেমে আমি হানা দিই। সিআইএ'র সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর পদের সাথে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা আমাকে সেই সুযোগ এনে দেয়। আমি বেশ কয়েকটি বিষয়ে আমার জ্ঞানকে পূর্ণ করলাম। আপনাদের আগ্রহ দমানোর কারণে বলছি, অবশ্যই মানুষ চাঁদে গিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন সত্যি। আর কেমট্রেইলস বলতে কিছু নেই।

সিআইএ'র অভ্যন্তরীণ নিউজ সাইটে বিভিন্ন টপ সিক্রেট বাণিজ্যিক খবর, বিভিন্ন ক্যুর খবর ফাঁস হবার আগেই তা আমি পড়তে পারতাম। এই খবরগুলো অনেকটা সিএনএন, নেটওয়ার্ক নিউজ, ফক্স ডেইজ লেটারের মতো ছিল। পার্থক্য ছিল তাদের সংবাদ সূত্র ও বিস্তারিত বর্ণনায়।

মাঝেমধ্যে অভ্যন্তরীণ কোনো খবর মিডিয়ায় কখনোই আসত না কিন্তু আমি তা জানতে পারতাম। তাই আমার কাজের গুরুত্বটা আমি বুঝতে

পারলাম। সিআইএ ছিল সত্যিই আন্তর্জাতিক। অর্থাৎ এর কর্মীবাহিনী ক্যাফেটেরিয়াতে বহু রকম ভাষা শুনে আমি অভিভূত হই। সিআইএতে কাজ করা বেশ রোমাঞ্চকর ছিল। আমি যেখানে বড় হয়েছি এর থেকে সিআইএ মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। সেখানেও প্রায় একইরকম পরিবেশ ছিল। আমার বিশ বছর বা এর কাছাকাছি বয়সে নর্থ ক্যারোলিনা, আমার নানার কোস্ট গার্ড ঘাঁটি আর ফোর্ট বেনিংয়ে আমার কয়েক সপ্তাহ অবস্থান ছাড়া আমি কখনো বেল্টওয়ের বাইরে যাইনি।

Ouagadougou, Kinshasa বা আরো বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারলাম। কম্পিউটার ছাড়া সাধারণ ম্যাপ দিয়ে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। আমার ইচ্ছে হতো দেশের বাইরে গিয়ে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু করি। আবার মনে হতো ফ্রাংকের মতো বড় টেবিলে বসে বেশি টাকা কামাই করি। তারপর হয়তো ভবিষ্যতে কোনো জং ধরা টেপের দেখাশোনা করার জন্য আমাকে রাখা হবে।

তারপর আমি অকল্পনীয় কাজ করলাম। একজন Govvie হয়ে গেলাম। আমার কয়জন সুপারভাইজার আশ্চর্য হয়েছিলেন। আবার অভিভূতও হয়েছিলেন। কারণ সাধারণত উল্টোটা হয়। একজন সরকারি কর্মী পরে বেসরকারি হয়ে যায়। অথচ এখন একজন চুক্তিভিত্তিক প্রযুক্তি কর্মী অপেক্ষাকৃত কম টাকায় সরকারি কাজ করতে যাচ্ছে। আমার কাছে সরকারি কর্মী হওয়া যুক্তিসম্মত মনে হলো। আমাকে ভ্রমণের টাকাও দেয়া হবে। আমার ভাগ্য ভালো ছিল। একটা সুযোগ এলো। সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে দেশের বাইরে সিআইএ'র টেকনোলজি সম্পর্কিত চাকরির জন্য আবেদন করলাম। সাথে সাথেই তা মঞ্জুর হলো।

সিআইএ সদর দপ্তরে আমার শেষ দিনটি ছিল কিছু ফর্মালিটি। কিছু কাগজপত্রের কাজ ছিল। সবুজ থেকে নীল ব্যাজধারী হলাম। আমাকে নতুন করে দীক্ষাদান করা হলো। আমি যেহেতু সরকারি কর্মকর্তা তাই এটি হলো রাজকীয় কনফারেন্স রুমে। ক্যাফেটেরিয়ার ডাংকিন ডোনাটের পাশে। এখানে আমি সেই পবিত্র অনুষ্ঠানে শামিল হলাম যাতে কখনোই চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা শামিল হতে পারত না। আমি আনুগত্যের শপথ করলাম। সরকার বা সংস্থার প্রতি নয়। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি। আমি অন্তর থেকে শপথ করলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে দেশীয়, বৈদেশিক শত্রুদের থেকে রক্ষা করব ও সমর্থন করব।

পরদিন আমার পুরনো বিশ্বস্ত হোন্ডা সিভিক নিয়ে ভার্জিনিয়ার কান্ট্রিসাইডে গেলাম। আমার স্বপ্নের বৈদেশিক স্টেশনে যাবার আগে আমাকে একটি স্কুলে ক্লাসের প্রথম সিটে গিয়ে বসতে হবে। স্কুল জীবন যা আমি কখনো শেষ করিনি।

দ্য কাউন্ট অফ দ্য হিল

সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমার প্রথম যাত্রা ছিল ভার্জিনিয়ার ওয়ারেনটনে জীর্ণ, নীরব একটি মোটেলের উদ্দেশ্যে। এর নাম ছিল 'কমফোর্ট ইন'। এই মোটেলের মূল ক্লায়েন্ট ছিল সিআইএ। এই শহরের যত খারাপ মোটেল ছিল সেগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে খারাপ। এ কারণেই সিআইএ এটি পছন্দ করেছে। কারণ এতে কারোরই বুঝার কথা না যে কমফোর্ট ইন ওয়ারেনটনে সিআইএ'র অস্থায়ী ট্রেনিং সেন্টার। এখানে যারা কাজ করত তারা একে বলত 'পর্বত'।

আমি সেখানে যাওয়ার পরে ডেস্ক ক্লার্ক সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে নিষেধ করল। কারণ পুলিশ টেপ দিয়ে এটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমাকে মূল ভবনের দ্বিতীয় তলায় একটি কক্ষ দেয়া হলো। এখান থেকে কমফোর্ট ইন এর অন্যান্য ভবন ও পার্কিং এলাকা দেখা যেত।

রুমে তেমন একটা আলো ছিল না। বাথরুমে ছিল শ্যাওলা উঠার দাগ। ময়লা কার্পেটে সিগারেটে পুড়ে যাওয়া দাগ ছিল। অথচ পাশেই ছিল নো স্মোকিং সাইন। পাতলা ম্যাট্রেসের উপর গাড়ো বেগুনি দাগ দেখলাম। আমার কাছে এটা মদের দাগ মনে হচ্ছিল। এসব ছাড়া মোটেলের সবই ভালো লেগেছে। আমি তখনো সেই বয়সে ছিলাম যখন এসবেও রোমান্টিকতা খুঁজে পেতাম। সারা রাত জেগে জেগে পার করলাম। বাতির আশপাশে পোকা উড়ছিল। আর আমি সকালবেলার ফ্রি কন্টিনেন্টাল নাস্তার অপেক্ষা করছিলাম যা আমাকে দেয়ার কথা হয়েছিল। পরদিন আবিষ্কার করলাম ওয়ারেনটনে নাস্তা মানে টক দইয়ের সাথে 'Froot Loops' সিরিয়াল দেয়া হয়।

সরকারি চাকরিতে সু-স্বাগতম।

এই কমফোর্ট ইনে আমাকে ছয় মাস থাকতে হবে।

আমি এবং বাকিদেরকে আমরা কোথায় থাকছি, কী কাজ করছি তা আমাদের পরিবারকে জানাতে নিষেধ করা হয়েছিল।

এ নিয়মগুলো বেশ কঠিন মনে হলো। না ম্যারিল্যান্ড যেতে পারছিলাম আর না ই লিন্ডসির সাথে কথা বলতে পারছিলাম। স্কুলে ফোন নিয়ে যাওয়া নিষেধ ছিল। সারাক্ষণই ক্লাস থাকত। ওয়ারেন্টনে আমাদের খুব ব্যস্ত রাখা হতো। যাতে আমরা একাকিত্ব বোধ না করি।

ক্যাম্প পিয়ারির নিচের ফার্মটি ছিল সিআইএর সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন। কারণ এখানে হলিউড নিয়ে অন্তত কিছু কথাবার্তা বলা যেত। পাহাড়টি ছিল খুব রহস্যময়। ব্র্যান্ডি স্টেশনের সাথে মাইক্রোওয়েভ ও ফাইবার ক্যাবল দিয়ে এতে স্যাটেলাইট সংযোগ দেয়া হয়। এটি ছিল ওয়ারেনটন ট্রেনিং সেন্টারের পার্শ্ববর্তী এলাকা।

এটি ডিসির বাইরে সিআইএ'র মূল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। এখানে কর্মরত প্রযুক্তিবিদরা বলত, সিআইএ তার সদর দপ্তর ভবন হারিয়েও বাঁচতে পারবে। কিন্তু ওয়ারেন্টন হারালে এটি মরে যাবে। পর্বতের একেবারে উপরে দুইটি ডাটা সেন্টার আছে। এর মধ্যে আমি একটি তৈরি করতে সাহায্য করেছিলাম।

পাহাড়ের নাম হয়েছিল এর সুউচ্চ লোকেশনের কারণে। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন পাহাড়ের একটিমাত্র রাস্তা ছিল। এর পাশ দিয়ে ছিল বেড়া দেয়া। তুষারপাত হলে উঁচু রাস্তায় বরফ জমে যেত। যানবাহন চলাচলে বেশ সমস্যা হতো। গাড়ি পেছনের দিকে স্লিপ করত।

প্রহরা দেয়া চেক পয়েন্টের পেছনেই ছিল স্টেট ডিপার্টমেন্টের কূটনৈতিক সংযোগ ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি। জায়গাটাকে দেখে মনে হতো এখানে আমেরিকান ফরেন সার্ভিস তার প্রযুক্তিবিদদের শুধু ট্রেনিং দিচ্ছে। আসলে এখানে খুব দামি ও নামহীন কিছু ভবন আছে। এসব ভবনে আমি ট্রেনিং নিয়েছি। তাছাড়াও এখানে আইসির শ্যুটিং রেঞ্জ ছিল। এখানে বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা ছিল। গুলির আওয়াজ এমন অদ্ভুত ছিল যা আমি আগে শুনিনি। পপ পপ; পপ, পপ পপ; পপ।

Basic Telecommunications Training Programme (BTTP)-এর ক্লাস 6-06 এর সদস্য ছিলাম। এর অস্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম এই নামের আড়ালেই লুকিয়ে আছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে টেকনিক্যাল ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসারদের ট্রেনিং দেয়া।

এরা ছিল সিআইএ'র উচ্চপদস্থ সংযোগ রক্ষাকারী কর্মী। একটা সময় যারা কোড ক্লার্ক, রেডিওম্যান, ইলেক্ট্রিশিয়ান, মেকানিক, ফিজিক্যাল এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি এডভাইজার হিসেবে কাজ করত তারা সবার কাজ বর্তমান সময়ে একজন TISO অর্থাৎ Technical Information Security Officer করে থাকে। এই গোপন অফিসাররা সিআইএ'র টেকনোলজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিচালনা করেন। বিশেষ করে বৈদেশিক স্টেশনগুলোতে। এই স্টেশনগুলো লুক্কায়িত ছিল আমেরিকান মিশন ও দূতাবাসে।

আপনি যদি দেশের বাইরে আমেরিকান দূতাবাসে শত্রু-মিত্র সবার সাথে থাকেন তাহলে দেখবেন বিদেশিদেরও সিআইএ বিশ্বাস করে না। আপনার সব টেকনোলজিক্যাল কাজ আপনাকে অভ্যন্তরীণ ভাবেই করতে হবে। স্থানীয় কাউকে দিয়ে কাজ করালে তারা সস্তায় তা করে দিবে। কিন্তু সে বৈদেশিক কোনো শক্তির পক্ষ থেকে আড়ি পাতার কোনো ব্যবস্থা রেখে দিতে পারে। এ কারণেই TISO কে ভবনের সব মেশিন ঠিক করতে হয়। কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সিসিটিভি, HVAC সিস্টেম, সোলার প্যানেল, হিটার, কুলার, ইমার্জেন্সি জেনারেটর, স্যাটেলাইট সংযোগ, সেনাবাহিনীর যন্ত্রপাতি, ঘড়ি, লক সবকিছু। তাদেরকে কোনো সিস্টেম তৈরি ও ধ্বংস করা দুটোই

জানতে হয়। যদি সন্ত্রাসীরা কোনো দূতাবাসে সবাইকে জিম্মি করে তাহলে সব কূটনীতিক ও বাকিরা নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়া পরে TISO-রা সবার পরে বের হয়। সিআইএ'র বিভিন্ন দরকারি ডকুমেন্ট নষ্ট করা, জ্বালিয়ে দেয়া, মুছে ফেলা, ছিঁড়ে ফেলার পর তাদেরকে সদর দপ্তরে মেসেজ পাঠাতে হয়। এছাড়াও তারা সাংকেতিকভাবে কোনো ডকুমেন্ট সিন্দুকের বদলে ডিস্কে সংরক্ষণ করার কাজ করে। যাতে শত্রুরা হাতে কোনো মূল্যবান তথ্য না পায়।

বর্তমান কূটনৈতিক ব্যবস্থার সবচেয়ে গোপনীয় বিষয় হলো দূতাবাসগুলো এখন গুপ্তচরবৃত্তির কাজ করে। বর্তমান ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ও বিমান সুবিধার সময়ে এক দেশের ভূমিতে অন্য দেশের সার্বভৌম অস্তিত্ব রাখার বিষয় পুরনো হয়ে গেছে। এখন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাঝে সরাসরি কূটনীতিক সম্পর্ক আছে। যদিও দূতাবাস তাদের প্রবাসে থাকা নাগরিকদের বিভিন্ন সুবিধা দেয়। তাছাড়া ভিসা ইস্যু করা, পাসপোর্ট রিনিউ করার জন্য দূতাবাসের দরকার। কিন্তু এগুলো একবারে ভিন্ন ভবনে হয়। এসব গোয়েন্দাগিরি পরিচালনাকে ন্যায্যতা দেয় না। ক্ষমতার ব্যবহার করে গোয়েন্দাগিরিকে ন্যায্যতা দানের চেষ্টা চলছে।

TISO-রা কূটনীতিক আবরণের আড়ালে কাজ করে। সবচেয়ে বড় দূতাবাসে পাঁচজন, মাঝারিতে তিনজন থাকে। বেশিরভাগেই একজন থাকে। তাদেরকে বলা হয় "Singletons"।

আমি শুনেছিলাম যতটা পদ সিআইএ'র আছে এর মধ্যে এদের ডিভোর্সের হার বেশি। তারা বাসা থেকে দূরে এমন এক জায়গায় থাকে যেখান থেকে সম্পর্ক রক্ষা করা কঠিন।

ওয়ারেন্টনে আটজন সদস্য নিয়ে আমাদের ক্লাস শুরু হয়। গ্রাজুয়েশনের আগেই একজন চলে যায়। সবাই এখানে স্বেচ্ছায় বিদেশভূমে গুপ্তচরবৃত্তি কাজ করার জন্য এসেছে। আমার আইসি ক্যারিয়ারে শুধু চব্বিশ বছর বয়স্ক আমিই একমাত্র কমবয়সি ছিলাম না। বাকিরা প্রযুক্তি পাগল মানুষজন কেউ কলেজ থেকে বা সরাসরি রাস্তা থেকে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করেছিল। আমরা সেখানে সবাই একে অন্যকে বিভিন্ন উপনামে ডাকতাম। খামখেয়ালি হয়ে মাঝেমধ্যে আসল নামে ডাক দিতাম।

বিশ বছর বয়সি ট্যাকোবেল। সিআইএতে আসার আগে সে পেনসিলভানিয়াতে একটি রেস্টুরেন্টের ব্রাঞ্চে নাইটশিফট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করত।

বিশ বা তার চেয়ে বেশি বয়সি রেইনম্যান অটিজম স্পেক্ট্রাম, সিজোফ্রেনিয়া, উন্মাদনা নিয়ে কাজ করত। আমাদের দেয়া নাম সে গর্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। তার কাছে এটি ছিল নেটিভ আমেরিকান সম্মাননা।

ফ্লুট মেরিনে কাজ করত। একটি মিউজিক স্কুল থেকে সে বাঁশির উপর ডিগ্রি নিয়েছিল। তাই তাকে আমরা ফ্লুট ডাকতাম।

পয়ত্রিশ বছর বয়সি SPO, সিআই এ সদর দপ্তরে Special Police Officer ছিল। ম্যাকলিনের গেইটে প্রহরা দিতে দিতে সে ছিল খুব বিরক্ত। তাই দেশের বাইরে তার পরিবারকে নিয়ে মোটেল রুমে কোনোমতে থাকতেও সে দ্বিধা বোধ করেনি। তার বাচ্চারা ড্রয়ারে সাপ পুষে, এটা ম্যানেজমেন্ট জানার পূর্ব পর্যন্ত তারা মোটেলেই ছিল।

সবার বড় ছিল কর্নেল। সে ছিল চল্লিশের মাঝামাঝি বয়সি। সে ছিল বিশেষ বাহিনীর সার্জেন্ট। যদিও সে সিআইএ অফিসার ছিল না তবু আমরা তাকে কর্নেল ডাকতাম।

আমার উপনাম ছিল কাউন্ট। আমার অভিজাত বংশপরিচয় বা শৌখিন ফ্যাশনের জন্য এই নাম ছিল না। সিসেম স্ট্রিটের ভ্যাম্পায়ার পাপেটের মতো ক্লাসে তর্জনী আঙুল উঠিয়ে স্যারকে প্রশ্ন করতাম আর ক্লাস বিঘ্নিত করতাম। এই মানুষদের সাথে আমি বিশটির মতো ক্লাস করেছি। প্রতিটি ক্লাস ছিল একটি আরেকটির চেয়ে ভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, দূতাবাসে বা যেকোনো জায়গায় কীভাবে প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করে সরকারের সেবা করা যায় এই বিষয়ের উপর বেশিরভাগ ক্লাস ছিল।

একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে আমার বয়সের চেয়েও বেশি পুরনো আশি পাউন্ড ওজনের প্যাকেজ ড্রিল করে লাগানো ছিল। কম্পাস ও কিছু ল্যামিনেটেড শিটের সাহায্যে বিশাল আকাশে তারার মাঝে আমাকে সিআইএর গুপ্ত স্যাটেলাইট খুঁজতে হতো। এটির মাধ্যমে ম্যাকলিনে এজেন্সির ক্রাইসিস কমিউনিকেশন সেন্টারে যোগাযোগ করা যেত। তারপর স্নায়ুযুদ্ধ জমানার একটি কিট এতে সংযোগ করে একটি রেডিও চ্যানেল গঠন করতে হতো।

ঐসব রাতে অন্ধকারে ঘাঁটিতে থাকতে হতো। পাহাড়ের একেবারে উপরে গাড়ি চালিয়ে যেতাম। প্রতিপক্ষের নজর এড়াতে চালা- ঘরে বসে ইলেক্ট্রিকাল কন্সেপ্ট পড়তাম।

আমরা তখন একটি বিষয় শিখলাম। অনেকটা ভুডুর মতো। এতে খুব সূক্ষ্ম ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক নিঃসরণ থেকে কম্পিউটার মনিটরে যা দেখানো হয় তা আবার তৈরি করা যেত। এই নিঃসরণ হয় আন্দোলিত স্রোত থেকে। এটিকে বিশেষ এন্টেনা দিয়ে ক্যাপচার করে রাখা যেতে পারে। এই উপায়কে বলে Van Eck Phreaking। ইন্সট্রাক্টর কখনো পুরোটা করেনি বা আমাদেরকেও দেখায়নি। কিন্তু এর ভয়াবহতা সত্যি ছিল। সিআইএ এটি অন্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছিল। তার মানে এটা অন্যরা আমাদের উপর ব্যবহার করতে পারে।

আমি আমার পুরনো সাদা সিভিক গাড়ির ছাদে বসলাম। সামনের দৃশ্যটা মনে হচ্ছিল ভার্জিনিয়ার মতো। সপ্তাহে বা মাসে এই প্রথম আমি লিন্ডসিকে ফোন দিলাম। আমার ফোনের ব্যাটারি শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা কথা বলতে থাকলাম। রাত যত বাড়ছিল আমার নিশ্বাস তত জোরে শোনা যাচ্ছিল।

অন্ধকার মাঠ, সুউচ্চ পাহাড়, চকমকে নক্ষত্র সবকিছু লিন্ডসির সাথে দেখতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তাকে এই সৌন্দর্যের কথা বলা ছাড়া দেখানোর উপায় নেই। অলরেডি ফোনে কথা বলে নিয়ম ভেঙে ফেলেছি। সে থাকলে ছবি তুলে নিয়ম ভাঙতাম।

ওয়ারেন্টনে পড়ালেখার মূল বিষয় ছিল সিআইএ স্টেশনের কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের টার্মিনাল ও ক্যাবলের যত্ন কিভাবে নেয়া যায়। টার্মিনাল বলতে কম্পিউটারকে বোঝায়। এটি নির্দিষ্ট নিরাপদ নেটওয়ার্কে বার্তা পাঠায় ও গ্রহণ করে। ক্যাবল বলতে মূলত বার্তাগুলোকেই বোঝায়। সিআইএ'র টেকনিক্যাল অফিসাররা ক্যাবল বলতে কর্ড এবং তারকেও বুঝে যেগুলো এজেন্সির টার্মিনালের সাথে অর্ধশতাব্দী বা এর বেশি সময় থেকে সংযুক্ত। বিশেষ করে পৃথিবী জুড়ে থাকা এর প্রাচীন যোগাযোগ পূর্ব টার্মিনাল। এগুলো হলো বিভিন্ন দেশীয় সীমান্তে সাগরের বুকে লুকিয়ে থাকা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল।

TISO-দের হার্ডওয়্যার, বিভিন্ন সফটওয়্যার প্যাকেজ, ক্যাবলে দক্ষ হতে হবে। আমার কিছু সহপাঠীর কাছে ইন্টারনেট, ওয়ারলেস যুগের বিভিন্ন বিষয় বেশ কষ্টকর মনে হলো। কেউ যদি প্রযুক্তির কোনো বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত তাহলে আমাদের ইন্সট্রাক্টর আমাদেরকে বলে দিত, এইবারই প্রথম TISO-দেরকে মোর্স কোড শেখানো হচ্ছে না।

গ্রাজুয়েশনের পরে আমাদেরকে একটি ড্রিম শিট ফিল আপ করতে হতো। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিআইএ স্টেশনের তালিকা দেয়া থাকত যেগুলোতে কর্মী প্রয়োজন। আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী তা সাজাতাম। এই শিটগুলো সেসব পছন্দসই ডিভিশনে যেত। আর তারা এগুলোকে ময়লা হিসেবে ফেলে দিত।

আমি তালিকায় প্রথমে রাখলাম Special Requirements Division-কে। এটা কোনো দূতাবাস নয়। এর অবস্থান ছিল ভার্জিনিয়াতে। এখান থেকে আফগানিস্তান, ইরাক, পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকার মতো বিভিন্ন বিপজ্জনক জায়গায় পাঠানো হতো। SRD-কে বাছাই করে আমি আসলে প্রায় তিন বছরের জন্য এরকম বিপদসংকুল যেকোনো শহরে তিন বছর বা এর চেয়ে বেশি সময়ের জন্য থাকার চ্যালেঞ্জ নিতে যাচ্ছিলাম। আমার ইন্সট্রাক্টররা ভেবেছিলেন SRD আমাকে লুফে নিবে। আর আমিও আমার যোগ্যতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু যেভাবে আশা করেছিলাম ওরকম কিছুই হয়নি।

কমফোর্ট ইন কিছু সুযোগ-সুবিধায় কাটছাঁট করছিল। আমার কিছু সহপাঠী বুঝতে পারছিল যে, প্রশাসন ফেডারেল শ্রম আইন লঙ্ঘন করছে

আমি বা আমার বয়সি কারো জন্য এটা চিন্তার বিষয় ছিল না। আমাদের কাছে তা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অতিরিক্ত সময় কাজ করে এর পারিশ্রমিক না পাওয়া, ছুটি মঞ্জুর না হওয়া, পারিবারিক সুবিধাদি না পাওয়া বয়স্ক সহপাঠীদের

জন্য চিন্তা ও অসন্তোষের বিষয় ছিল। কর্নেলের উপর ভরণপোষণের টাকা দেয়ার দায়িত্ব ছিল, স্পোর পরিবার ছিল। সুতরাং টাকা ও সময় দুটোই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

এই অসন্তোষ আরো বেশি হয় যখন কমফোর্ট ইনের জরাজীর্ণ সিড়িটা ভেঙে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সবাই ভয় পেয়েছিল। সবাই ক্ষোভের সাথে বলছিল, এই ভবন সিআইএ ছাড়া আর কারো হলে ফায়ার কোড ভায়োলেশনের জন্য এর শাস্তি হতো। অসন্তোষ বাড়তেই লাগল। বিদ্রোহ বিদ্রোহ ভাব ছড়িয়ে পড়ল।

মোটামুটি সবাই জড়িত থাকায় ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তে কাউকে গ্রাজুয়েশন দেয়া হবে আর কাউকে বের করে দেয়া হতে পারে। সহপাঠীরা আমাকে ধরল। যেহেতু ইন্সট্রাক্টররা আমাকে পছন্দ করত। আমার দক্ষতার কারণে ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিলাম। তাছাড়া আমি সদর দপ্তরে কাজ করেছি। তাই আমলাতান্ত্রিক বিষয়ে ধারণা আছে। আমি খুব ভালো লিখতে পারতাম। তাই তারা চাইল আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাস প্রতিনিধি হিসেবে স্কুলের হেডের কাছে যাতে অভিযোগপত্র লিখি।

এ কাজটি করতে আমি বেশ উৎসাহী ছিলাম। কিন্তু আমার মতো একজন মানুষ যে কিনা সবকিছুতেই ভালো করছিল সে হুট করে প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ করছে এটা অদ্ভুত লাগবে শুনতে। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক থেকে নীতি সংকলন করে পাঠালাম।

পরদিন সকালে স্কুলের হেড আমাকে তার অফিসে ডাকলেন। তিনি বললেন কোনো সমস্যাই তিনি সমাধান করতে পারবেন না।

"একমাত্র তুমি এখানে বারো সপ্তাহের বেশি সময় থেকে আছো। তোমার সহপাঠীদের বলো এসব বাদ দিতে। সামনে আরো অ্যাসাইনমেন্ট আসছে। তারপর তোমাদের কাছে ভাবার মতো আরো ভালো কিছু বিষয় আসছে। তোমাদের এখানে কাটানো সময়ের মাঝে শুধু সেরা পার্ফরমেন্সটাই মনে থাকবে।"

তিনি যা বললেন তা হয় হুমকি নয়তো ঘুষ। দুটোই আমাকে চিন্তিত করল। তার অফিস থেকে বের হবার পর সব মজা শেষ। আর যাই হোক আমি ন্যায়ের সাথে ছিলাম।

আমি ক্লাসে ফিরে আসলাম। সবাই আগে থেকেই হেরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে। আমার চেহারা দেখে স্পো বলল, "দুঃখ করো না। অন্তত তুমি চেষ্টা করেছ।"

আমার অন্য যেকোনো সহপাঠীর চেয়ে স্পো অনেক বেশিদিন থেকে এজেন্সির সাথে জড়িত। সে জানে ম্যানেজমেন্ট যা ভেঙেছে তা ম্যানেজমেন্ট ঠিক করে দিবে এই বিশ্বাস করা হাস্যকর।

যে হারকে আমি মেনে নিতে পারছিলাম না সেই হার স্পো ও বাকিরা মেনে নিয়েছিল। একটি ন্যায়সঙ্গত দাবিকে কীভাবে অস্বীকার করা হয় তা ভেবে আমার ঘৃণা হচ্ছিল। এমন না যে আমার সহপাঠীরা লড়তে ইচ্ছুক ছিল না। বরং তাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। সেই চব্বিশ বছর বয়সেই ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে আমি মুনাফার কথা চিন্তা করলাম। আমি সিস্টেমের কথা ভাবছিলাম।

ইমেইলটি আবার লিখে ফিল্ড সার্ভিস গ্রুপ ডিরেক্টরের কাছে পাঠালাম।

যদিও তিনি স্কুলের হেডের চেয়ে উচ্চপদস্থ ছিলেন। তবে ফিল্ড সার্ভিস গ্রুপ ডিরেক্টরের পদ সদর দপ্তরের সিনিয়র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ের।

কিছুদিন পর ফিল্ড এক্সপেডিয়েন্ট ক্লাসে একজন সেক্রেটারি এসে বলল পুরনো পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে গেছে। আনপেইড ওভারটাইম থাকছে না। দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা "A Humoton Inn" এ চলে যাব।

তখন স্কুলের হেড দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে তার অফিসে ডেকে নিলেন। স্পো তখন তার জায়গা থেকে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরল। অশ্রুসজল চোখে বলল সে আমায় কখনোই ভুলবে না। স্কুলের হেড তখন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

স্কুল হেডের অফিসে ফিল্ড সার্ভিস ডিরেক্টর বসে ছিলেন। তিনি TISO-এর সবার বস। তাকেই আমি ইমেইল দিয়েছিলাম। তিনি বেশ ব্যতিক্রম ধরনের আন্তরিক ছিলেন। এটি আমাকে বেশ চিন্তিত করল।

আমি খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি ঘেমে একাকার। স্কুল হেড বললেন, আমাদের ক্লাস যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল তা সমাধান হওয়ার পথেই ছিল।

স্কুল হেডের বস তাকে থামিয়ে বললেন, "কিন্তু আমরা এখানে সেগুলো নিয়ে কথা না বলে কেন চেইন অব কমান্ড নিয়ে কথা বলছি?"

তিনি আমাকে থাপ্পড় মারলেও এত আশ্চর্য হতাম না। যতটা এই কথায় হই। তিনি চেইন অব কমান্ড নিয়ে কী বলছিলেন এর কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বলতে থাকলেন।

সিআইএ অন্যান্য নাগরিক সংস্থা থেকে আলাদা। এরকম একটি নাগরিক সংস্থার জন্য এর চেইন অব কমান্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খুব ভদ্রভাবে আমার তর্জনী উঁচু করে বললাম, ইমেইল পাঠানোর আগে আমি চেইন অব কমান্ড মানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়েছি।

স্কুলের হেড তার সু-জুতার দিকে একবার তাকাচ্ছিলেন আর আরেকবার জানালার দিকে।

"শোনো।" তার বস বললেন।

"এড, আমি এখানে কোনো দুঃখ পাওয়ার প্রতিবেদন দিতে আসিনি। আমি জানি তুমি খুব মেধাবী ছেলে। তোমার ইন্সট্রাক্টররাও একই কথা

বলেছেন। তাছাড়া তুমি কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও ছিলে। আমরা বেশ অভিভূত হয়েছি। আমরা তোমাকে এখানে চাই। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে আমরা তোমার ওপর নির্ভর করতে পারব কিনা। তোমাকে বুঝতে হবে এটি একটি সিস্টেম। কিছু পরিস্থিতি আমাদের পছন্দ না হতে পারে কিন্তু মিশনটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একটি দলের সবাই যদি নির্ভর করার অযোগ্য হয় তাহলে আমরা মিশন পূর্ণ করতে পারব না।" এবার তিনি একটু থামলেন।

"আমি জানি না তোমার উপর কোনো দায়িত্ব দিলে সেটা তুমি পূরণ করতে পারবে কিনা।"

তো এই ছিল তাদের প্রতিশোধ। স্কুলের হেড পার্কিং লটে হাসছিল। আমি ছাড়া আর কেউই SRD বা আর কোনো যুদ্ধরত জায়গাকে ড্রিম শিটে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পছন্দ হিসেবেও রাখেনি। সবাই ইউরোপীয় মনোরম, ছুটি কাটানোর মতো শহরকে বেছে নিয়েছিল। যেখানে গুলি, বোমার আওয়াজ শুনারই কথা না। তারা আমাকে জেনেভাতে পাঠিয়ে শাস্তি দিল। বাকিরা এটা চাইলেও আমি কখনো চাইনি।

ডিরেক্টর আমার মন বুঝতে পেরে বলেছিল, এটা কোনো শাস্তি নয় এড। এটা একটা সুযোগ। সত্যি। তোমার মতো দক্ষ ও মেধাবী ছেলের প্রতিভা সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রে নষ্ট হবে। তোমার জন্য দরকার বড় কোনো স্টেশন। যেখানে নতুন নতুন প্রজেক্ট আছে। এগুলো তোমাকে ব্যস্ত রাখবে ও তোমার দক্ষতা বাড়াবে।"

ক্লাসে যারা আমাকে শুভকামনা জানিয়েছিল তারাই পরে ঈর্ষান্বিত হল। তারা ভাবল আমি যাতে আর কোনো প্রতিবাদ করতে না পারি তাই আমাকে এত বিলাসবহুল পদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সময় আমার প্রতিক্রিয়া একেবারেই ভিন্ন ছিল। আমার মনে হচ্ছিল ক্লাসে হয়তো স্কুলের হেডের কাছে সংবাদদাতা কেউ আছে। আর নয়তো কে তাকে বলবে আমি কোন রকম স্টেশন উপেক্ষা করতে চাচ্ছি।

ডিরেক্টর হাসি দিয়ে জায়গা থেকে উঠল।

"ঠিক আছে। যাওয়ার আগে পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আমরা আর কোনো এড স্নোডেন মুহূর্ত চাই না।"

জেনেভা

১৮১৮ সালে ম্যারি শেলি লিখেন ফ্রাংকেনস্টাইন। এর পটভূমি হলো জেনেভা। জেনেভার ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন সুইস সিটিতে আমার বসবাস। আরো অনেক আমেরিকানদের মতো আমি ফ্রাংকেনস্টাইনের ওপর মুভি ও কার্টুন দেখে বড় হয়েছি। কিন্তু বইটি পড়া হয়নি। জেনেভার উদ্দেশ্যে যাবার আগে জেনেভা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলাম। ফ্রাংকেনস্টাইন ও জেনেভা কনভেনশন এ দুটো বইয়ের পিডিএফ ডাউনলোড করেছিলাম ফ্লাইটে বসে পড়ার জন্য। শুধু ফ্রাংকেনস্টাইন পড়ে শেষ করলাম। লিন্ডসি এখানে আসার আগে আমি আমার একাকি রাতগুলো বই পড়ে কাটিয়ে দিতাম। সেইন্ট-জিন ফ্যালাইসেস ডিস্ট্রিক্টের একটি আসবাবপত্রহীন অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম। দূতাবাস ওটার টাকা দিত। এর একদিকে ছিল রন নদী আর অন্য দিকে জুরা পর্বত। যেরকম ভেবেছিলাম ফ্রাংকেনস্টাইন মোটেও সেরকম বই ছিল না। উপন্যাসটা চিঠির মতো ছিল। যেখানে আছে উন্মাদনা, রক্তাক্ত হত্যা। যেখানে আছে উদ্ভাবনের নৈতিক ও আইনগত বাধাবিপত্তি ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। ফলাফল হিসেবে জন্ম হয় অদমনীয় এক দানবের।

গোয়েন্দা এজেন্সিতেও 'ফ্রাংকেনস্টাইন ইফেক্ট' আছে। সেনাবাহিনীতে একে বলে 'Blowback'। এর মানে হলো আমেরিকার স্বার্থে এমন সব নীতি গ্রহণ করা যা উল্টো আমেরিকার অপূরণীয় ক্ষতি করে। এই 'ফ্রাংকেনস্টাইন ইফেক্ট' এর একটি উদাহরণ হলো, সোভিয়েতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুজাহিদীনদের আমেরিকা অর্থ সাহায্য ও প্রশিক্ষণ দেয়। ফলাফল হিসেবে, আবির্ভাব ঘটে ওসামা বিন লাদেন ও আল-কায়েদার। আর সাদ্দাম হোসেনের সময়কালীন ইরাকি মিলিটারিতে বাথ পার্টির বিরোধিতা করা হয়। যার ফলে উত্থান ঘটে আইএস-এর।

সন্দেহাতীতভাবে আমার ক্যারিয়ারে ফ্রাংকেনস্টাইন ইফেক্টের উদাহরণ হলো গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৈশ্বিক যোগাযোগ পুনর্গঠিত করা।

জেনেভা, সেই একই জায়গা যেখানে ম্যারি শেলির সৃষ্টি উন্মত্ততা প্রদর্শন করে। আমেরিকা এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করছিল যা মানুষের জীবনে ও তার নিজের মিশনে প্রভাব বিস্তার করবে। এর সাথে ব্যাপক ক্ষতি করবে এই নেটওয়ার্কের উদ্ভাবকদের, বিশেষ করে আমার জীবনের।

জেনেভার আমেরিকান দূতাবাসের সিআইএ স্টেশনটি এই দশকের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য অন্যতম প্রধান ইউরোপীয় ল্যাবরেটরি। এই শহরকে পারিবারিক ব্যাংকিংয়ের রাজধানী বলা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক গোপনীয়তা ও আন্তর্জাতিক ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক এখানেই লুকিয়ে আছে।

সিআইএ HUMINT বা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের ওপর জোর দিত। এরা গুপ্ত নজরদারি তথ্য সংগ্রহ করত ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি বা সরাসরি তারা তথ্য সংগ্রহ করত।

কেইস অফিসার বা CO ছিল মদ্যপ, সিগারেটখোর ও সুদর্শন মিথ্যেবাদী এরা মনে মনে SIGINT বা সিগনালস ইন্টেলিজেন্সের উপর বিরক্ত ছিল কারণ এগুলো প্রতিবছর তাদের সম্মান ও সুবিধা কমিয়ে দিচ্ছিল।

যদিও তারা ডিজিটাল প্রযুক্তিকে অবিশ্বাস করত তবুও তারা এর উপকারিতা জানত। কারণ এটি তৈরি করছিল পারস্পরিক আস্থা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শত্রুতা। খুব প্রতিভাবান সিও রাও কিছু আদর্শবানদের মুখোমুখি হয় যাদের আনুগত্যতা তারা খামের মধ্যে ক্যাশ ভরেও কিনতে পারে না। তারা তখন দাওয়াত দিয়ে, প্রশ্ন করে আমার মতো টেকনিক্যাল ফিল্ড অফিসারদের বাগে আনতে চাইত।

টেকনিক্যাল ফিল্ড অফিসারকে অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা হতে হয়। সিও-দেরকে নতুন জায়গার রীতিনীতি শিক্ষা দিতে হয়। এগুলো একজন আমেরিকানের জন্য সুইজারল্যান্ডের চব্বিশটা প্রদেশ ও চারটি অফিসিয়াল ভাষার মতোই ভিনদেশীয়।

সোমবারে একজন সিও আমার পরামর্শ চাইতে পারে গোপন অনলাইন যোগাযোগ চ্যানেল সেট আপ এর ব্যাপারে। মঙ্গলবারে আরেকজন সিও আমাকে ওয়াশিংটনের কোনো বিশেষজ্ঞের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। মূলত, এটা সেই একই সিও ছদ্মবেশে আমাকে পরীক্ষা করছে। বলতে লজ্জা লাগছে, সত্যি বলতে আমি একটুও সন্দেহ করিনি।

বুধবারে হয়তো জিজ্ঞেস করা হতো কীভাবে একটি ডিস্কের তথ্য স্থানান্তর করার পর তা নষ্ট করা যাবে। এই ডিস্কে ছিল কাস্টমারদের তথ্য। এটি অসাধু সুইসকম কর্মী থেকে একজন কেইস অফিসার সংগ্রহ করেছিল। বৃহস্পতিবারে সিওর কাছে সিকিউরিটি ভায়োলেন্স রিপোর্ট লিখতে হতো। রিপোর্টের কাজটি আমি খুব যত্নের সাথে করতাম।

এই রিপোর্টে খুব ছোট ছোট ভুলের উল্লেখ থাকত। যেমন, বাথরুমে যাবার সময় ভল্টের দরজার লক লাগাতে ভুলে যাওয়া। একবার আমি নিজেই এই ভুল করলাম। তাই নিজের ভুলের ওপর রিপোর্ট লিখতে হলো। শুক্রবারে চিফ অফ অপারেশনস হয়তো এসে আমাকে তার অফিসে ডেকে বলবেন, মনে করো সদর দপ্তর থেকে সমস্যাগ্রস্থ থাম্ব ড্রাইভ পাঠানো হয়েছে। এটা ব্যবহার করে জাতিসংঘের কূটনীতিকদের ব্যবহৃত কম্পিউটার কেউ হ্যাক করে ফেলল। যে হ্যাক করল তাকে কী ধরা যাবে?

আমি সেখানে কাজে থাকাকালীন বেশ দ্রুত পরিবর্তন আসছিল। এজেন্সি সিও অফিসারদের সাহায্য করার জন্য আমার মত টেকনিক্যাল ফিল্ড অফিসারদের নিয়োজিত করল। এটি আমাদের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল।

জেনেভাকে এই পরিবর্তন এর জন্য গ্রাউন্ড জিরো ভাবা হতো। ওখানে জাতিসংঘের সদর দপ্তরসহ এর বিভিন্ন এজেন্সির সদর দপ্তর ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এনজিওর অফিস ছিল।

ওখানে ছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটোমিক এনার্জি এজেন্সি। এটি পারমাণবিক শক্তি ও পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার এবং এসব থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করত। সেখানে ছিল আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন। এটি রেডিও থেকে স্যাটেলাইট সবকিছু থেকে কতটুকু ও কীভাবে যোগাযোগ পরিচালনা করা হবে তা নির্ধারণ করত। এছাড়াও ছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। এটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্রব্য, সেবা, সম্পত্তির নীতিমালা নির্ধারণ করত।

জেনেভা ছিল বেসরকারি অর্থায়নের রাজধানী।

কুখ্যাত ও সতর্ক গোয়েন্দারা এসব ব্যবস্থাকে আমেরিকার অনুকূলে ব্যবহার নিশ্চিত করত। সুইস ব্যাংক সেক্টরে সারা পৃথিবীর সাথে আমেরিকান নীতি প্রণেতারা যারা আইসি'র রিপোর্ট পড়ত তারাও বেশ আধুনিক হয়ে গেল।

পৃথিবীর সব গোপন তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষিত ছিল। তাই আমেরিকান গোয়েন্দা এজেন্সির উদ্দেশ্য ছিল তা চুরি করা। ইন্টারনেটের আগে এজেন্সি কোনো কম্পিউটারের তথ্য চুরি করতে চাইলে তা কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে করতে হতো। যে খুব বিপদ মাথায় নিয়ে ডাউনলোড করত এবং হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার প্রতিস্থাপনের কাজ করত। এতে এর রক্ষণাবেক্ষণকারীদের কাছে সিগন্যাল পৌঁছে যাবার আশঙ্কা ছিল।

কিন্তু বৈশ্বিক ডিজিটাল টেকনোলজি এ কাজকে সহজ করে দেয়। এই ডিজিটাল নেটওয়ার্ক নজরদারি বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক অপারেশনে সরাসরি মানুষের দরকার হতো না। HUMINT/SIGINT এর মধ্যে ভারসাম্য গড়ে ওঠে।

এতে গোয়েন্দারা তাদের টার্গেটকে কোনো ক্ষতিকর লিংক দিয়ে মেসেজ বা মেইল দিতে পারে। শুধু কম্পিউটার নয় বরং নেটওয়ার্কও টার্গেট করা যাবে। HUMINT টার্গেট খুঁজে বের করবে। আর SIGNIT বাকি কাজ করবে। সিও কাউকে ঘুষ দিয়ে তথ্য নেয়ার বিষয়টা ফেইল হতে পারে। তবে কিছু কম্পিউটার হ্যাক বেশ সুবিধাজনক।

সাইবার ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে পুরনো বিষয়গুলো আপডেট করা হলো। যেমন–অনলাইনে টার্গেটকে ছদ্মবেশে গবেষণা করা। এই বিষয়ের দরকার দেখা দেয় যখন সিও সংস্থার ডাটাবেসে চীন, ইরানের কাউকে খুঁজতে যায় কিন্তু খুঁজে পায় না। কারণ তাদের ডাটাবেস তাদের বিশেষ টার্গেটেড ব্যক্তি ও বন্ধুরাষ্ট্রের নাগরিকদের তথ্য দিয়ে ভরপুর যাদের তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে না পেলে পাবলিক ইন্টারনেটে টার্গেটকে খুঁজতে হতো। যেটা বেশ বিপজ্জনক। সাধারণত আপনি অনলাইনে কোনো ওয়েবসাইটে যেতে চাইলে

আপনার রিকোয়েস্টটি কম্পিউটারের সার্ভার হয়ে আপনার সেই রিকোয়েস্ট করা ওয়েবসাইটে পৌঁছে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় আপনার রিকোয়েস্ট ঘোষণা করে সে ইন্টারনেটের কোথা থেকে এসেছে আর কোথায় যাচ্ছে। এটা হয় সোর্স ও ডেস্টিনেশন হেডারের কারণে।

এটা অনেকটা পোস্টকার্ডে অ্যাড্রেস ইনফরমেশনের মতো। এই হেডারের জন্যই আপনার ওয়েব ব্রাউজিং অন্যরা, ওয়েবমাস্টার, নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বৈদেশিক গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো চিনে ফেলে। এই পরিস্থিতিতে একজন কেইস অফিসার কি করবে এর কোনো সদুত্তর নেই। তারা সিআইএ সদর দপ্তরকে তাদের তরফ থেকে সার্চ করতে বলে।

তখন ম্যাকলিনের মতো নির্দিষ্ট কম্পিউটার টার্মিনাল থেকে কাউকে অনলাইনে যেতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে নন-এট্রিবিউটেবল রিসার্চ সিস্টেম। এক্ষেত্রে মিথ্যা ঠিকানা ব্যবহার করা হয়। যদি কেউ দেখে কে সার্চ করেছে তাহলে সে দেখতে পাবে আমেরিকান কোনো সাধারণ ব্যাবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা নকল সেবা কোম্পানি যেগুলো সিআইএ আবরণ হিসেবে ব্যবহার করত। গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো জব সার্চ কোম্পানির নাম ব্যবহার করত কারণ এতে পাকিস্তানের কোনো নিউক্লিয়ার প্রকৌশলী এবং অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ জেনারেলকে খোঁজ করা সহজ হবে। তবে এগুলো ছিল অকার্যকর ও ব্যায়বহুল ব্যবস্থা। এধরনের কোনো কোম্পানি গড়তে হলে তাদেরকে কোম্পানির উদ্দেশ্য, নাম, আমেরিকায় কোম্পানির কোনো ঠিকানা, নিবন্ধনকৃত URL ঠিকানা, ওয়েবসাইট ঠিকানা ও কোম্পানির নামে সার্ভার তৈরি করতে হতো। সেসব সার্ভার থেকে সিআইএ নেটওয়ার্ক এর সাথে এমনভাবে সংযোগ তৈরি করতে হতো যাতে কেউ না জানে। এত টাকা পয়সা খরচ এবং পরিশ্রম করতে হতো শুধু গুগলে একটি নাম খুঁজে বের করার জন্য। তারপর সেই কোম্পানির সাথে সিআইএ'র সম্পৃক্ততা যাতে না পাওয়া যায় তাই সেই কোম্পানি নষ্ট করে দেয়া হতো। বিশ্লেষকরা তখন একই কম্পিউটার থেকে তাদের ব্যক্তিগত একাউন্টে লগ ইন করে।

সিআইএ সদরদপ্তরের কিছুসংখ্যক কর্মী আড়ালে থাকত। ফেসবুক একাউন্টে বলা থাকত, "আমি সিআইএ'র জন্য কাজ করি" বা "আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি কিন্তু ম্যাকলিনে।"

হাসতে থাকুন। তখন এরকমই হতো।

জেনেভাতে যখনই কোনো সিও আমার কাছে নিরাপদ, দ্রুত কোনো উপায় খুঁজত আমি তাদেরকে টরের কথা বলতাম।

'Tor' হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা নজরদারির সবচেয়ে কার্যকর, ফ্রি ও ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। এটি তার ব্যবহারকারীকে খুব নিখুঁতভাবে ছদ্মবেশ ধরে অনলাইন ব্রাউজ করতে সাহায্য করে। ১৯৯০ এর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এটি গড়ে ওঠে। ২০০৩ এর দিকে

এটি সাধারণ নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। তাদের ওপরই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। কারণ সারা বিশ্বে মানুষ টর সার্ভার ব্যবহার করে তাদের গ্যারেজ, বেসমেন্ট বা যেকোনো জায়গা থেকে। এতে সার্ভারে জ্যাম তৈরি হয়। সিআইএর Non-attributable Research ব্যবস্থার মতো টর এই জ্যামের উৎসকে নিরাপত্তা দেয়। আমি এতে বেশ সন্তুষ্ট ছিলাম কিন্তু অসভ্য সিও-দের বোঝানো ছিল অন্য ব্যাপার।

টর প্রটোকলের ক্ষেত্রে, টর সার্ভার থেকে টর সার্ভারে জ্যাম ছড়িয়ে পড়বে। এতে আপনার পরিচয় সার্ভার জ্যামে চাপা পড়বে ও অন্য টর সার্ভার দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে। একেকটা টর সার্ভারকে বলে Layers। কোনো লেয়ারই জ্যামের সূত্রপাত বা তথ্য জানে না। একেবারে প্রথম টর সার্ভারটা এই জ্যাম কোথায় যাচ্ছে তা জানে না। সহজভাবে, একেবারে প্রথম টর সার্ভার আপনাকে টর নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে দেয়। একে বলে গেটওয়ে। এই গেটওয়ে জানে আপনিই নেটওয়ার্কে রিকোয়েস্ট দিয়েছেন। কিন্তু এর অনুমতি নেই রিকোয়েস্ট পড়ার তাই এটি জানে না আপনি কোনো কুকুর বিড়ালের মিম খুঁজছেন নাকি কোনো প্রটেস্টের খবর পড়তে চাচ্ছেন। আর পরের টর সার্ভারটাকে বলে exit। এটি জানে আপনি কী জানতে চান। কিন্তু জানে না কে জানতে চাচ্ছে।

এর বিভিন্ন ধাপগত পদ্ধতিকে বলে Onion Routing। এটা থেকেই টরের নাম হয়েছে The Onion Router (TOR)। টর নেটওয়ার্কে নজরদারি করতে গিয়ে গোয়েন্দারা কেঁদে ফেলত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী দ্বারা গঠিত প্রযুক্তি সাইবার ইন্টেলিজেন্সকে একইসাথে কঠিন ও সহজ করে তোলে। এটি আইসি অফিসারদের পরিচয় গোপন রাখত। একই সাথে রক্ষা করত প্রতিপক্ষের ও সারা বিশ্বের ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা। আমার জন্য টর ছিল জীবন পরিবর্তনকারীর মতো। এটি আমাকে নজরদারির চিন্তা থেকে মুক্ত রেখে স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়ে দেয় ও শৈশবের সেই ইন্টারনেটে নিয়ে যায়।

***

SIGINT-এর ব্যবহার মানে এই নয় যে, HUMINT-এর ব্যবহার হতো না। বরং ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরে যেভাবে তারা HUMINT ব্যবহার করত ওভাবেই হতো। আমিও এতে জড়িত ছিলাম। যদিও আমার প্রথম স্মরণীয় কাজটা ব্যর্থ হয়। আমার ক্যারিয়ারে জেনেভাতেই প্রথম এক টার্গেটের সাথে আমি চোখে চোখ রেখে কথা বলি। খুঁটিনাটি জানার এই অভিজ্ঞতা ছিল খুব দুঃখজনক।

সরাসরি কারো ওপর নজরদারি কঠিন ও আবেগতাড়িত হয়। কিন্তু অনলাইনের নজরদারিতে এমন হয় না। একেবারে সামনে থেকে কারো জীবনে নজরদারি করা আমাদেরকে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে দিতে পারে।

সেই লোকটির সাথে দূতাবাসের এক অনুষ্ঠানে দেখা হয়েছিল। সিও'রা এসব অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য চাকরি প্রার্থীদের যাচাই করত। মাঝেমাঝে সিওরা আমাকেও নিয়ে যেত। আমি খুব লম্বা করে আমার কাজের বিশেষত্ব নিয়ে তাদেরকে লেকচার দিতাম। আমি এই নতুন গবেষকদের সাথে European Council for Nuclear Research-এ তাদের কাজ নিয়ে কথা বলতে পারতাম। যেটা এমবিএ ও পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়ালেখা করা সিও'রা করতে পারত না। একজন প্রযুক্তিবিদ হিসেবে আমার পরিচয় দেয়াটা সহজ ছিল, কেউ জিজ্ঞেস করলেই বলতাম আমি আইটিতে কাজ করি। ব্যস, এখানেই তাদের আগ্রহ শেষ হয়ে যেত। একজন নতুন কর্মী হিসেবে যখন আপনি আপনার ফিল্ড এর বাইরে কারো সাথে কথা বলবেন তখন তারা আপনাকে অনেক প্রশ্ন করবে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তারা সুযোগ পেলেই আপনাকে বোঝাবে আপনি যে কাজ করছেন তারা এর ব্যাপারে আপনার চেয়েও ভালো জানে।

আমি যে অনুষ্ঠানের কথা বলছি সেটা লেক জেনেভার পাশে একটি ক্যাফের ছাদে হয়েছিল। কিছু সিও আমাকে একা ফেলে কোনো সুন্দরী নারীর পাশে বসতে চলে যেত। আমি এতে কিছু মনে করতাম না। ফ্রি ডিনারের সাথে টার্গেটকে খুঁজে বের করা ছিল আমার শখের কাজ। আমি আমার প্লেট নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের এক পিংক শার্ট পরিহিত ব্যক্তির পাশে বসলাম। কেউ তার সাথে কথা বলছিল না। তাই আমি তার সাথে কথা বললাম। তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। এটি একটি সাধারণ পদ্ধতি। এতে তাদের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে হয় ও কথা বলতে দিতে হয়। লোকটি ছিল সৌদির। সে অনর্গল কথা বলেই যাচ্ছিল। সে বলছিল, জেনেভাকে তার খুব ভালো লাগে। আর ভালো লাগে সুইস সুন্দরী যার সাথে তার ডেটিং চলছে। সে একটি প্রাইভেট ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টে কাজ করত।

মুহূর্তের মধ্যেই বুঝলাম প্রাইভেট ব্যাংক কেন প্রাইভেট। তারা মার্কেট পরিবর্তন না করেই ইনভেস্ট করে কারণ তাদের ক্লায়েন্ট হলো সার্বভৌম রাষ্ট্র ও এর আর্থিক ফান্ড।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার ক্লায়েন্ট কারা?"

সে বলল, "আমি বেশিরভাগই সৌদি একাউন্টে কাজ করি।"

কিছু সময় পর আমি বাথরুমে যাবার বাহানা দিয়ে সরে গেলাম। বাথরুমে অযথা সময় নিয়ে চুল ঠিক করে লিন্ডসিকে মেসেজ দিলাম তারপর সিও'র কাছে গিয়ে সংগৃহীত তথ্যের কথা বললাম। সিও'র পাশে বসে আমার নতুন সৌদি বন্ধুকে হাত দিয়ে ইশারা করলাম। পরদিন সেই সিও, যাকে আমি 'কল' ডাকি, তিনি আমার খুব প্রশংসা করলেন।

সিও'রা সন্দেহজনক কোনো ব্যাপারে সদর দপ্তরে রিপোর্ট করে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত তথ্য প্রদর্শন করার ওপর তাদের পদোন্নতি নির্ভর করে।

অর্থনৈতিকভাবে সন্ত্রাসীদের সাহায্য করার ব্যাপারে সৌদিআরবকে সন্দেহ করা হচ্ছিল। কলের ওপর উপযুক্ত তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব ছিল।

কল নিয়মিত বার ও ক্লাবে গিয়ে ওই ব্যাংকারের ব্যাপারে অনুসন্ধান করত। কিন্তু ব্যাংকারের ব্যাপারে তথ্যবহুল কিছুই জানা যাচ্ছিল না। কল অধৈর্য হয়ে গেল। এক মাস ব্যর্থতার পরে কল সেই ব্যাংকারকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ছাড়ল। তারপর সেই লোকটাকে ক্যাব নিতে না দিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে যেতে বাধ্য করল। তারপর কল সেই লোকের গাড়ির নাম্বার জেনেভা পুলিশকে দেয়। তারা মিনিট পনেরো পরেই তাকে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য গ্রেপ্তার করে। তার জরিমানা হয়। এই জরিমানা টাকার পরিমাণ মোটেই অল্প কিছু নয়। বরং ইনকামের পার্সেন্টেজের ওপরে দিতে হতো। তিন মাসের জন্য তার ড্রাইভিং লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হলো। লোকটির অর্থসংকট দেখা দিলে কল আগে থেকেই বন্ধুবেশে লোন নিয়ে তৈরি ছিল। সেই ব্যাংকার তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেল। এটাই সব সিও'র স্বপ্ন।

কিন্তু লোকটা কলের সব দুষ্কর্ম জেনে গেল। সে জেনে গেল তাকে মদ্যপ করে ফাঁসানোর কথা। সে কলের সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। কল সব ঠিক করার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। লোকটা ভালোবাসার সুইজারল্যান্ড ছেড়ে চাকরি হারিয়ে নিজ দেশে চলে গেল। আর কলকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ক্ষতি বেশি হলো কিন্তু অর্জন হলো কম। এই ব্যর্থতার পর আমার কাছে HUMINT-এর চেয়ে SIGINT-এর গুরুত্ব ধরা পড়ে।

২০০৮ এর এক গ্রীষ্মে জেনেভায় আতশবাজি উৎসব হচ্ছিল। আমি লেক জেনেভার বাম দিকের তীরে স্পেশাল কালেকশন সার্ভিসের স্থানীয় কর্মীর সাথে বসেছিলাম। এটি ছিল সিআইএ-এনএসএ'র যুগ্ম কার্যক্রম। এতে বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপন করা হচ্ছিল যাতে আমেরিকান দূতাবাস বিদেশি সিগন্যালে নজরদারি করতে পারে। তারা আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। তাদের বেতন, দক্ষতা আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তারা এনএসএ'র অনেক যন্ত্রপাতির ব্যাপারে জানত ও ব্যবহার করতে পারত। এগুলো আছে বলে আমি জানতামও না।

তবু আমরা বন্ধুভাবাপন্ন ছিলাম। মাথার ওপর আতশবাজি বিস্ফোরণ হচ্ছিল। আমি তাদের সাথে ব্যাংকারের কেইসের ব্যর্থতার ব্যাপারে কথা বলছিলাম। একজন আমার দিকে ফিরে বলল, "এড, পরবর্তীতে কারো সাথে দেখা হলে আমাদেরকে শুধু তার ইমেইল অ্যাড্রেস দিবে। বাকিটা আমরা দেখব।"

আমি মাথা নাড়ালাম। কিন্তু তখন এই কথার মানে আমি বুঝতে পারিনি।

পরবর্তী এক বছর পার্টিতে না গিয়ে লিন্ডসির সাথে পার্কে, ক্যাফেতে ঘুরে বেড়াতাম। ফ্রান্স, ইতালি, স্পেনে ওর সাথে ছুটি কাটাতাম। তবু আমার মাথায়

কিছু বিষয় ঘুরপাক খেত। সেটা শুধু ব্যংকারের ব্যাপারটা নিয়েই নয় বরং ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ে। জেনেভা খুবই ব্যায়বহুল, ছিমছাম একটি শহর।

২০০৮ এ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও গালফ রাষ্ট্রসমূহ ও সৌদি আরব অতিরিক্ত তেলের দামের মাধ্যমে মুনাফা লাভ করছিল। আর এদিকে জেনেভায় আগমন ঘটছিল অত্যধিক ধনী লোকদের। এরা গ্র্যান্ড ফাইভ স্টার হোটেলের পুরো ফ্লোর বুকিং করত আর বিলাসবহুল দোকান থেকে প্রচুর জিনিসপত্র কিনত। তারা জেনেভার রাস্তায় তাদের লাম্বোরগিনি চালিয়ে বেড়াত। আর নামি-দামি রেস্টুরেন্টে লোভনীয় খাবার খেত।

এই অমিতব্যয়িতা ছিল খুব পীড়াদায়ক।

এমন না যে আমি আর লিন্ডসি কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমাদের বাসা ভাড়া আংকেল স্যাম দিতেন। কিন্তু আমরা যখন আমাদের পরিবারকে এসব কথা বলতাম তারা খুব কষ্ট পেতেন। কারণ আমাদের পরিবারে মার্কিন সরকারের জন্য কাজ করেছেন এমন অনেকেই আছেন। কিন্তু কোনো কারণে মর্টগেজ পেমেন্ট দিতে দেরি হলে ব্যাংক তাদের বাসা ছিনিয়ে নিত।

জেনেভার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সারা পৃথিবী যেখানে অনুন্নয়ন, দারিদ্রের দিকে যাচ্ছিল সেখানে জেনেভা উন্নত হচ্ছিল। কারণ সুইস ব্যাংক দেউলিয়া হতে হয় এমন রিস্কি কোনো ব্যাবসা বাণিজ্য করত না। যেসব মানুষ অন্যের ক্ষতি করে মুনাফা পেত কিন্তু এর জবাবদিহিতা করত না এদের টাকা খুশিমনে সুইস ব্যাংক লুকিয়ে রাখত। ২০০৮ এর অর্থনৈতিক দূরবস্থা এক দশক পর ইউরোপ, আমেরিকায় আসে। তখন বুঝতে পারি জনগণের জন্য যা ক্ষতিকর তা এলিটদের জন্য লাভজনক।

কয়েক বছর পর ভিন্ন পরিস্থিতিতে, ভিন্ন সময়ে মার্কিন সরকার তা আমার জন্য শিক্ষা হিসেবে নিশ্চিত করে।

টোকিও

১৯৮৯ সালে জেনেভার CERN রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব উদ্ভাবিত হয়। আমেরিকা এটিকে নিজেদের জন্য ব্যবহার করে। আমেরিকান গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো এই সুবিধা কাজে লাগায়। ইন্টারনেট মূলত আমেরিকান। ক্যাবল, স্যাটেলাইট, সার্ভার, টাওয়ারসহ ইন্টারনেট অবকাঠামোর বেশিরভাগই আমেরিকার দখলে। পৃথিবীর ৯০ শতাংশ ইন্টারনেট ট্রাফিক মার্কিন সরকার বা মার্কিন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় গঠিত ও পরিচালিত প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এগুলো আমেরিকায় অবস্থিত। চায়না ও রাশিয়া তাদের নিজস্ব সিস্টেম হিসেবে গ্রেট ফায়ার ওয়াল, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিধিবালা আরোপিত সার্চ ইঞ্জিন, বা রাষ্ট্রায়ত্ত স্যাটেলাইট গড়ে তুলেছে। কিন্তু আমেরিকা এক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। শুধু ইন্টারনেট অবকাঠামোই না বরং কম্পিউটার সফটওয়্যার (মাইক্রোসফট, গুগল, ওরাকল), হার্ডওয়্যার (এইচপি, অ্যাপল, ডেল)- এরাও আমেরিকান। Intel, Qualcomm-এর মতো কম্পিউটার চিপ, Cisco, Juniper এর মতো রাউটার, মডেম এসবও আমেরিকান। ওয়েব সার্ভিস, ইমেইল প্লাটফর্ম, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, ক্লাউড স্টোরেজ-এগুলোও আমেরিকান। গুগল, ফেসবুক, আমাজন মার্কিন সরকারকে ক্লাউড সার্ভিস প্রদান করে। এসব কোম্পানির কোনোটা হয়তো চায়নার মতো দেশেও ডিভাইস উৎপাদন করে। কিন্তু তারা আমেরিকান এবং আমেরিকান আইন দ্বারা পরিচালিত। সমস্যা হলো এরা আমেরিকান নীতি মানতে বাধ্য। যেসব নীতি ও বিকৃত কিছু আইনের কারণে মার্কিন সরকার ভার্চুয়ালি প্রতিটা পুরুষ, মহিলা, শিশুর ওপর নজরদারি করতে পারত। যারা ফোন ডায়াল করেছে বা কম্পিউটার ব্যবহার করেছে।

আমেরিকান কমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকলে স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা গণনজরদারির সাথে যুক্ত থাকার কথা। কিন্তু আমেরিকান সরকার বরাবরই কোর্ট ও মিডিয়ায় এই দায় অস্বীকার করেছে। আর যারা এই অভিযোগ করেছে তাদেরকে ষড়যন্ত্রকারী বলা হয়েছে।

আমাকে যে বিষয় পীড়া দেয় তা হলো ইরাক আক্রমণে সমর্থন দিয়ে আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছি। যখন আইসিতে যোগ দিলাম ভাবলাম এখানে জবাবদিহিতা আছে। কেনইবা সরকার তার গোপনীয়তা রক্ষাকারীদের থেকে কোনো কিছু গোপন করবে। ২০০৯ সালে আমেরিকার প্রধান সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এনএসএ'র জন্য কাজের উদ্দেশ্যে জাপান যাবার আগে পর্যন্ত আমি এসব কিছুই বুঝতে পারিনি। এটি আমার স্বপ্নের চাকরি ছিল। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত গোয়েন্দা এজেন্সি বলে নয়। এজন্য যে এটি ছিল জাপানে, যা আমাকে আর লিন্ডসিকে বরাবরই অভিভূত করত।

জাপান। যেন ভবিষ্যৎ পৃথিবী থেকে আসা কোনো এক দেশ। যদিও আমি সেখানে চুক্তিভিত্তিক কাজ করতাম তবু সেই দায়িত্ব ও স্থান আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। দুর্ভাগ্যবশত বেসরকারিভাবে আবার কাজ করতে গিয়ে আমি বুঝতে পারছিলাম আমার সরকার কী করছিল। কাগজ কলমে আমি ছিলাম Perot Systems-এর কর্মী। এটি প্রতিষ্ঠা করেন টেক্সাসের রস প্যারট যিনি রিফর্ম পার্টি গঠন করেন ও দুবার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াই করেন। কিন্তু আমি জাপানে আসার আগেই এটিকে ডেল তার অধীনে নিয়ে নেয়। তাই কাগজ অনুযায়ী আমি ডেলের কর্মী হয়ে গেলাম। সিআইএ'র মতো এনএসএ'তেও চুক্তিভিত্তিক কর্মী শুধু আনুষ্ঠানিকতা ছিল। আমি এনএসএ ফ্যাসিলিটিতেই কাজ করেছি।

এনএসএ'র Pasific Technical Center (PTC) ইয়োকোটা বিমান ঘাঁটির অভ্যন্তরে একটি ভবনের অর্ধেকটা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। US Forces Japan-এর সদর দপ্তরে মতোই ঘাঁটির চারপাশ ছিল উঁচু দেয়াল, প্রহরাপূর্ণ চেকপয়েন্ট ও স্টিলের গেইট দিয়ে ঘেরা. লিন্ডসি ও আমি ফুসা শহরের যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম সেখান থেকে ইয়োকোটা ও PTC ছিল বাইকের অল্প পথের দূরত্বে। ফুসা শহরটি টোকিওর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মেট্রোপলিটন শহর। PTC এনএসএ'র সম্পূর্ণ প্যাসিফিক অবকাঠামো সামাল দিত এবং আশপাশের দেশগুলোতে এনএসএ'র সাইটগুলোতে সহায়তা করত। সেসব প্যাসিফিক অঞ্চলে এনএসএ নজরদারি করত। সেসব সরকারের সাথে এর গোপন সম্পর্ক ছিল। এনএসএ গোপনে নজরদারি তথ্য তাদের সাথে শেয়ার করত। কমিউনিকেশন আটক করা একটি দরকারি মিশন। PTC কমিউনিকেশন আটক করে তা হাওয়াইতে পাঠাত। সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হতো।

সিস্টেম অ্যানালিস্ট হিসেবে আমি এনএসএ'র স্থানীয় সিস্টেম পরিচালনা করতাম। যদিও আমার বেশিরভাগ কাজ ছিল সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মতো। এনএসএ এবং সিআইএ'র সিস্টেম আর্কিটেকচারে সংযোগ ঘটাতাম। সেই অঞ্চলে সিআইএ আর্কিটেকচার সম্পর্কে একমাত্র আমিই জানতাম. তাছাড়া আমি জেনেভাতেও কাজ করেছি। ওখানে নজরদারি তথ্য শেয়ার করার এমন ব্যবস্থা গড়ে দিয়েছি যা আগে সম্ভব ছিল না। একটি সিস্টেম কীভাবে অভ্যন্তরীণভাবে কাজ করে ও বিভিন্ন সিস্টেমের সাথে কীভাবে কাজ করে তা জানা একমাত্র ব্যক্তি ছিলাম। তখনই নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে প্রথমবার বুঝতে পারলাম। পরবর্তীতে আমার পারদর্শিতা দেখে PTC প্রধান আমাকে নিজের ইচ্ছে অনুসারে প্রজেক্ট প্রস্তাব করতে বললেন।

এনএসএ'র কিছু বিষয় আমাকে আশ্চর্য করল। এটি সিআইএ'র চেয়ে টেকনোলজিক্যালি বেশ এগিয়ে ছিল। কিন্তু তথ্যকে নিরাপদ রাখা ও এনক্রিপ্টের ব্যাপারে তারা অল্পই সতর্কতা দেখাত। জেনেভাতে কম্পিউটারের

হার্ডড্রাইভ বের করে প্রতিরাতে তা লকারে রাখা হতো ও সেগুলো এনক্রিপ্ট করা হতো। এনএসএ খুব কমই এই কাজ করত। এটি বিস্মিত করার মতো বিষয় যে, এনএসএ সাইবার ইন্টেলিজেন্সে বেশ এগিয়ে ছিল। অথচ ব্যাকআপ, ডিজাস্টার রিকোভারির মতো সাধারণ সাইবার সিকিউরিটিতে তারা ছিল পিছিয়ে। প্রতিটা এনএসএ সার্ভারে তাদের তথ্য জমা থাকত। কিন্তু তথ্যের পরিমাণের ওপর সীমাবদ্ধতা থাকায় তা এনএসএ সদরদপ্তরের মূল সার্ভারে তথ্যের কপি পাঠাত না। তার মানে কোনো সাইটের কোনো তথ্য নষ্ট হয়ে গেলে এত কষ্টে অর্জিত তথ্য হারিয়ে যেত। আমার' উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই রিস্ক বুঝতে পেরে আমাকে এ সমস্যার সমাধান দেয়ার ও তা সদর দপ্তরে নীতি প্রণেতাদের কাছে পেশ করার দায়িত্ব দেন। এর ফলে ব্যাকআপ ও স্টোরেজ সিস্টেম তৈরি হয়। এতে এনএসএ'র সব তথ্যের সম্পূর্ণ, স্বয়ংক্রিয় ও প্রতিমুহূর্তে আপডেটকৃত কপি জমা থাকত। এতে ফোর্ট মিড ধ্বংস হয়ে গেলেও আর্কাইভ তথ্যগুলো এজেন্সি রিবুট করে পেয়ে যাবে।

একটি গ্লোবাল ডিজাস্টার রিকভারি সিস্টেম গড়ার মূল সমস্যা হলো এটির জন্য প্রচুর শক্তিশালী কম্পিউটার দরকার। যেগুলো নকল তথ্য নিয়ে কাজ করে। অর্থাৎ এক হাজার কম্পিউটারের সবগুলোতেই একই ফাইলের কপি আছে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যাতে একই ফাইল এক হাজার বার কপি না করেন। এতে এক হাজার গুণ বেশি স্টোরেজ স্পেস লাগবে। এছাড়া এজেন্সির বিভিন্ন সাইট থেকে ফোর্ট মিডে প্রতিদিনের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়। একই ফাইলের এক হাজার কপি তথ্যের গতি রোধ করে দেয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য Deduplication পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে তথ্যের বিশেষত্ব খুঁজে বের করা হতো।

আমি একটি সিস্টেম তৈরি করেছিলাম এতে এনএসএ'র প্রতিটা বিভাগে সাথে সাথেই প্রতিটি ফাইল স্ক্যান হতো। এই সিস্টেম প্রতিটি ব্লকের তথ্যের বিশেষত্ব খুঁজত। যদি সংস্থাতে একটি কপি কম থাকে তাহলে তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবাহিত হয়ে ট্রান্সপ্যাসিফিক ফাইবার অপ্টিক কানেকশনের জ্যামকে দূর করে।

ডিডুপ্লিকেশন আর স্টোরেজ টেকনোলজিতে উন্নয়নের কারণে এজেন্সি অনেক লম্বা সময়ের জন্য গোয়েন্দা তথ্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারত। আমার ক্যারিয়ারের সময়কালেই তারা দিন থেকে সপ্তাহ, মাস, পাঁচ বছর বা এর চেয়েও আরো বেশি সময় তথ্য জমা করে রাখতে পারত। এই বই প্রকাশ হতে হতে এজেন্সি হয়তো এখন কয়েক দশক ধরে তথ্য জমা রাখতে পারে। এনএসএ ভাবত প্রয়োজন না হলে কোনো কিছু জমিয়ে রেখে লাভ নেই। আর প্রয়োজন কখন পরে তা বলা যায় না। তাই এনএসএ'র উদ্দেশ্য ছিল চিরকালের জন্য তথ্য জমা রাখা। তারা চাইল পার্ফেক্ট মেমোরি। পার্মানেন্ট রেকর্ড।

আপনি যখন একটি প্রোগ্রামকে একটি কোড নাম দিবেন তখন আপনাকে এনএসএ'র একটি প্রটোকল অনুসরণ করতে হবে। এটি অনেকটা সূত্রের মতো প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে এলোমেলোভাবে দুটো কলাম থেকে শব্দ বাছাই করা হয়। এতে অভ্যন্তরীণ একটি ওয়েবসাইট কাল্পনিকভাবে গুটি ফেলে কলাম A থেকে একটি নাম বাছাই করে। তারপর আবার গুটি ফেলে কলাম B থেকে একটি নাম বাছাই করে। এভাবে আপনি কতগুলো নাম বাছাই করেন যেগুলোর কোনো অর্থ নেই। যেমন, FOXACID এবং EGOTISTICALGIRAFFE। কোড নামসমূহ প্রোগ্রামের কাজগুলো লুকিয়ে রাখে। যতটুকু জানা যায়, FOXACID এনএসএ'র একটি সার্ভারের নাম। এখানে পরিচিত কিছু ওয়েবসাইটের ক্ষতিকারক ভার্সন আছে। EGOTISTICALGIRAFFE এনএসএ'র একটি প্রোগ্রাম। এর কাজ কিছু ওয়েব ব্রাউজারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু এনএসএ'র গোয়েন্দারা তাদের ক্ষমতা ও এজেন্সির সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এত আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, তারা নিয়ম মানত খুব কম। তারা ধোঁকাবাজি করত ও পুনরায় ডাইস ফেলত। যতক্ষণ না তারা তাদের পছন্দসই নামের মিল পায়। যেটা শুনতে ভালো লাগে। যেমন TRAFFICTHIEF। এটি ছিল ভিপিএন অ্যাট্যাক অরক্যাস্ট্রাটর। আমি সত্যি বলছি, ব্যাকআপ সিস্টেমের জন্য নাম খুঁজতে গিয়ে আমি এরকম কিছুই করিনি। কিন্তু EPICSHELTER নাম কীভাবে যেন চলে আসে। পরবর্তীতে এজেন্সি এর নাম দেয় Storage Modernization Plan বা Storage Modernization Program.

**

২০১৩ সালে আমি সাংবাদিকদের হাতে যেসব তথ্য তুলে দিই তা হচ্ছে এনএসএ'র প্রযুক্তির দক্ষতাকে অপব্যবহারের প্রমাণ। অনেক গোয়েন্দা বা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পর্যন্ত এসবের অনেক কিছুই জানত না। কেউ সিস্টেমের অপব্যবহার করছে কি না তা জানার জন্য সার্চ করতে হতো। আর সার্চ করার জন্য এ ব্যবস্থা যে আছে সেটা আগে জানতে হবে। এক কনফারেন্সে আমি এ বিষয়ের ইংগিত পাই। এনএসএ'র কাজ নিয়ে আমার মনে সন্দেহ বাড়তে থাকে।

EPICSHELTER নিয়ে কাজ করার মাঝামাঝিতেই চায়নার ওপর PTC একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে। এটির আয়োজক ছিল Joint Counterintelligence Training Academy (JCITA)। তারা এর আয়োজন করে Defense Intelligence Agency (DIA)'র জন্য। এটি প্রতিরক্ষা বিভাগের সাথে জড়িত ছিল। এর কাজ হলো বৈদেশিক সামরিক বাহিনী ও সামরিক বিভিন্ন বিষয়ে নজরদারি নিয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান দেয়া এই কনফারেন্সে সেনাবাহিনী, এনএসএ, সিআইএ, এফবিআই-এর বিশেষজ্ঞরা

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। এতে তারা বলেন কীভাবে চায়নিজ গোয়েন্দাসংস্থা তাদের আইসিকে টার্গেট করছে ও আইসি তাদের ঠেকাতে কী কী করতে পারে। চায়না আমাকে আকর্ষণ করত। কিন্তু এধরনের কোনো কাজেই আমি জড়িত না থাকায় কনফারেন্সে মনোযোগ দিলাম না। শুধু শেষের দিকে শুনলাম টেকনোলজি নিয়ে একমাত্র বক্তা অনুপস্থিত. তার অনুপস্থিতির কারণ বুঝলাম না। কনফারেন্সের চেয়ারম্যান ঘোষণা করলেন, PTC থেকে কে এখানে এসে ব্রিফিং দিবে। একজন পরিচালক আমার নাম বলে দিলেন। তিনি আমাকে কিছু বলার অনুরোধ করেন। আমি রাজি হলাম। আমি আমার বসকে পছন্দ করতাম। তাই তাকে সাহায্য করতে চাইলাম। তাছাড়া আমি সুযোগ চাচ্ছিলাম এমন কিছু করার যেখানে তথ্য ডিডুপ্লিকেশন নিয়ে কিছু করতে হবে না।

পরের দিন ব্রিফিং ছিল। লিন্ডসিকে ফোন করে বললাম আমি রাতে বাসায় আসছি না। প্রেজেন্টশন তৈরি করতে হবে। প্রেজেন্টেশনের বিষয় ছিল কাউন্টার ইন্টিলিজেন্স ও সাইবার ইন্টিলিজেন্স এর মধ্যকার প্রতিবন্ধকতা। এই দুটি একত্রিত হয়ে প্রতিপক্ষকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে নজরদারি তথ্য সংগ্রহ রুখে দেয়ার চেষ্টা করছিল। চায়নিজরা অনলাইনে কী করতে চাচ্ছিল তা জানার জন্য আমি এনএসএ ও সিআইএ'র টপ সিক্রেট রিপোর্ট পড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নামমাত্র কিছু ইনট্রুশন সেট পড়তে হলো। ইনট্রুশন সেট হলো নির্দিষ্ট কিছু টার্গেট, অভিযান এসবের কতক ডাটা। এসব ইনট্রুশন সেট আইসি বিশেষজ্ঞরা ব্যবহার করত চাইনিজ হ্যাকার গ্রুপ ও চাইনিজ সেনাবাহিনীর সাইবার ইন্টেলিজেন্স সনাক্ত করার জন্য। ঠিক যেভাবে গোয়েন্দারা সন্দেহভাজন কাউকে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সনাক্ত করে। আমার মূল কাজ ছিল আমেরিকার অফিসার ও বিভিন্ন সম্পদ ট্র্যাক করার ক্ষেত্রে চায়নার ক্ষমতা নিয়ে আইসির মূল্যায়ন সংক্ষেপে পেশ করা। সবাই মনে করে তারা চায়নার ড্রাকোনিয়ান ইন্টারনেটের ব্যাপারে জানে। আর কিছু মানুষ মনে করে তারা জানে, ২০১৩ সালে আমি সাংবাদিকদের কাছে যে তথ্য ফাঁস করেছিলাম তা ছিল আমার দেশের ক্ষমতা সংক্রান্ত। জেনে রাখুন, তাত্ত্বিকভাবে একটি দেশের সরকার তার দেশের নাগরিকদের প্রতিটা কাজ দেখতে ও শুনতে পারে। বাস্তবে এরকম একটি সিস্টেম বাস্তবায়ন করা ভিন্ন জিনিস। যার জন্য মিলিয়ন ডলার যন্ত্রপাতি ও হাজার হাজার প্রযুক্তিবিদ দরকার।

বেসরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রে চায়নার নজরদারি ও কোটি কোটি ফোন নাম্বার ও ইন্টারনেট যোগাযোগ সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ, বিশ্লেষণের জন্য তাদের মেকানিজম ও যন্ত্রপাতি নিয়ে জানতে গেলে মাথা খারাপ হবার অবস্থা হয়। প্রথমে তাদের সিস্টেমের এত স্পর্ধা ও অর্জন দেখে অভিভূত হয়ে তাদের টোটালিটারিয়ান নিয়ন্ত্রণের ভয়াবহ দিক ভুলেই গিয়েছিলাম।

যেহেতু চায়নিজ সরকার অগণতান্ত্রিক একদলীয় সরকার। এনএসএ গোয়েন্দারা অন্যান্য আমেরিকানদের মতো একে স্বৈরাচারী নরক ভেবে তেমন

একটা গুরুত্ব দেয়নি। চায়নার নাগরিক স্বাধীনতা আমার ভাবার বিষয় নয়। আমি তাদের জন্য কিছুই করতে পারব না। আমি জানতাম আমি ভালো মানুষদের জন্য কাজ করছি যা আমাকে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচয় করায়। কিন্তু এসব বিষয় পড়ার সময় একটা জিনিস আমাকে বেশ ভাবায়, চায়নার ব্যাপারে এত তথ্য আমেরিকার কাছে থাকা মানে আমেরিকাও চায়নার মতো এরকম কোনো সিস্টেম ব্যবহার করছে। চায়না যে জিনিস প্রকাশ্যে তার নাগরিকের সাথে করছে, আমেরিকা হয়তো তা সারা পৃথিবীর সাথে গোপনে করতে পারে।

যাই হোক, আমি বিষয়টা এড়িয়ে গেলাম। চায়নার গ্রেট ফায়ারওয়াল ছিল দমনমূলক। আর আমেরিকার সিস্টেমগুলো ছিল অদৃশ্য ও সম্পূর্ণ নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থে। আমি ভাবছিলাম, পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে যার যখন ইচ্ছা আমেরিকান ইন্টারনেট ইনফ্রাস্ট্রাকচারের যেগুলোতে প্রবেশাধিকার আছে তাতে প্রবেশ করতে পারে ও যে কন্টেন্ট ইচ্ছা তা এক্সেস করতে পারে।

এভাবে আমি আমেরিকান নজরদারি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ভালোভাবে নিলাম, আমি পুরোপুরি নিরাপত্তার স্বার্থে নজরদারি ও লক্ষ্যবস্তু বানানোকে সমর্থন করি। আমি ভাবলাম এটা একটা ফায়ারওয়াল যা অপরাধীকে জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু আমার মন থেকে সন্দেহ যাচ্ছিল না। চায়না ব্রিফিং দেয়ার বেশ কিছুদিন পরে আমি এই ব্যাপারে আরো জানতে নেমে গেলাম।

***

২০০৯ সালে এনএসএ'তে কাজ শুরু করার পর থেকে আমি অন্যদের চেয়ে একটু বেশিই এর কাজ সম্পর্কে জানতাম। সাংবাদিকদের বিভিন্ন রিপোর্টের কারণে ৯/১১ পরে প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের নেতৃত্বে এই এজেন্সির অসংখ্য নজরদারি কার্যক্রম সম্পর্কে জেনেছি। ২০০৫ সালে নিউইয়র্ক টাইমস এ প্রকাশিত President Surveillance Program (PSP) এর মাধ্যমে টেলিফোনে আড়িপাতার খবরও জানতাম। ধন্যবাদ এনএসএ ও বিচারবিভাগের কিছু সৎসাহসী হুইসেলব্লোয়ারকে।

অফিসিয়ালি PSP একটি এক্সিকিউটিভ অর্ডার ছিল। প্রেসিডেন্টের নির্দেশকে সরকার নাগরিক আইনের মতোই বিবেচনা করে, এমনকি যদি তা গোপনীয়ও হয়। PSP এনএসএকে আমেরিকা ও সারা বিশ্বের টেলিফোন ও ইন্টারনেট যোগাযোগ সংগ্রহ করার অধিকার দেয়। পিএসপি এনএসএকে এই অনুমতি দেয় ফরেন ইন্টেলিজেন্স সারভেইলেন্স কোর্টের কোনো অনুমতি ছাড়াই। এটি ছিল গোপন ফেডারেল কোর্ট, যা ১৯৭৮ সালে গঠিত হয়। যাতে নজরদারি ক্ষমতা পাবার জন্য আইসির অনুরোধ তত্ত্বাবধান করা যায়। কারণ তখন এজেন্সিগুলো এন্টি ভিয়েতনাম ওয়ার ও সিভিল রাইট মুভমেন্ট এ গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে।

টাইমস এ পিএসপির ঘটনা ফাঁস হবার পর "আমেরিকান সিভিল লিবার্টি ইউনিয়নস" পিএসপির এই কাজের সাংবিধানিক যৌক্তিকতা জানতে কোর্টে চ্যালেঞ্জ করে। বুশ প্রশাসন দাবি করে এই কার্যক্রম ২০০৭ সালে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এটি ছিল একটি প্রহসন। বুশ প্রশাসনের শেষ দুই বছর কংগ্রেস পিএসপিকে বৈধ করার জন্য আইন পাস করতে থাকে। টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবাদাতা যারা এই কাজে অংশ নেয় তাদেরকে ব্যাপকভাবে শাস্তি থেকে বাঁচানোর কাজ করে ২০০৭ এর Protect America Act ও ২০০৮ এর FISA Amendment Act এ ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তিকর ভাষা ব্যবহার করা হয় আমেরিকান নাগরিকদের আশ্বস্ত করার জন্য যে, তাদের যোগাযোগকে টার্গেট করা হচ্ছে না। বাইরের দেশ থেকে আসা বিভিন্ন যোগাযোগের ওপর নজরদারির সাথে এনএসএ আমেরিকা থেকে অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগের উপরেও নজরদারি তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে।

এ বিষয়টি জানতে পারলাম জুলাই, ২০০৯ সালে ইস্যুকৃত রিপোর্ট Unclassified Report on President's Surveillance Program থেকে। এই রিপোর্ট প্রণয়ন করে পাঁচটি সংস্থার ইন্সপেক্টর জেনারেল (প্রতিরক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ, এনএসএ, সিআইএ, ও ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের পরিচালক পর্ষদ)। বুশ জমানায় এনএসএ'র কাজের ব্যাপারে কংগ্রেসের অনুসন্ধান হিসেবে এটি জনগণের সামনে পেশ করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ওবামা, যার জন্য লিন্ডসি খুব উদ্যমের সাথে প্রচারণা চালায়, তিনি কংগ্রেশনাল ইনভেস্টিগেশনকে নাকচ করে দেন। আমার কাছে মনে হলো অতীতের কাজের হিসেব না দিয়েই তিনি এগিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তার প্রশাসন পিএসপি সম্পর্কিত কাজকে পুনঃসম্মতি দিলে লিন্ডসি আর আমার তার প্রতি আশা ভুল প্রমাণিত হলো। যদিও আনক্লাসিফাইড রিপোর্টে পুরনো খবরাখবর ছিল। তাও আমার কাছে তা তথ্যবহুল মনে হয়েছে। এই রিপোর্টে এজেন্সির কার্যক্রম সমর্থন করে কিছু কথাবার্তা ছিল। খেয়াল করে দেখলাম, শাসন বিভাগের যারা এটি অনুমোদন দিয়েছিল তারা কেউই ইন্সপেক্টর জেনারেলদের কাছে সাক্ষাৎকার দেয়নি। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি ও তার উপদেষ্টা ডেভিড এডিংটন থেকে শুরু করে অ্যাটর্নি জেনারেল জন এশক্রফট এবং বিচার বিভাগের উকিল জন ইয়ুসহ প্রধান অনুমোদনকারীদের সবাই আইসির জবাবদিহিতার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইন্সপেক্টর জেনারেলরা তাদেরকে জোর করতে পারেনি। কারণ এটা কোনো আনুষ্ঠানিক অনুসন্ধান ছিল না। সেই রিপোর্টের অনেক গোয়েন্দা কার্যক্রমের কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না। প্রেসিডেন্ট বুশের যুদ্ধকালীন শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ছাড়া।

রিপোর্টে আমার মনে হয় না এমন কিছু ছিল যা সেই কাজকে বৈধতা দানের উপযুক্ত বলা যায়। পিএসপি'র কোনো কিছু পুনঃঅনুমোদিত হলে

অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস কমি ও এফবিআই পরিচালক রবার্ট মুলারের পদত্যাগ করার হুমকির কথা বাদই দিন।

এমনকি এজেন্সির পুরনো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সদস্যরা ও বিচার বিভাগীয় কর্মী কেউই সংবাদমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ করে পিএসপি'র বিভিন্ন কাজের অপব্যবহার নিয়ে তাদেরকে আশঙ্কা প্রকাশ করতেও দেখিনি।

এই সন্দেহ থেকে আমি এই রিপোর্টের ক্লাসিফাইড ভার্সন খুজলাম। কিন্তু কোথাও পেলাম না। ঠিক বুঝলাম না। ক্লাসিফাইড ভার্সনটা শুধু অতীতের পাপের কোনো রেকর্ড হলে এটা তো সহজে পাবার কথা। কিন্তু এটি কোথাও পাওয়া যায়নি।

আমি ভুল জায়গায় খুঁজছি কিনা ভাবছিলাম। কিছু না পেয়ে বিষয়টা নিয়ে ভাবাই বাদ দিলাম। জীবন চলছিল আর আমি কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। যখন আপনাকে বলা হবে কীভাবে আইসি গোয়েন্দাদের চায়নার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিভাগ থেকে গোপন করে রাখা যায়, তখন এমনিই আপনি এক সপ্তাহ আগে গুগলে কী সার্চ করছিলেন তা ভুলে যাবেন।

একদিন ক্লাসিফাইড ভার্সনটা আমার ডেস্কটপে পেলাম। আগে এটি পাইনি কারণ এটি Exceptionally Controlled Information (ECI)-এর ফাইলে ছিল। এটি এজেন্সির পরিচালকদের দ্বারাও পাওয়া সম্ভব ছিল না। গোয়েন্দা বিভাগের কারো চোখে না পড়ে এমন কোনো বিষয় এখানে গোপনে রাখা হতো। আমার পদের জন্য আমি এনএসএ'র ECI-গুলোর সাথে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু এই ECI এর কথা জানতাম না। এই রিপোর্টের পুরো নাম ছিল TOP SECRET//STLW//HCS/COMINT//ORCON/NOFORN যার অর্থ ছিল, বিশ্বের মাত্র কয়েক ডজন মানুষের এটি পড়ার অনুমতি আছে।

আমি অবশ্যই এই কিছু সংখ্যককের মধ্যে ছিলাম না। এনএসএ'র IG অফিসের কেউ ভুল করে এর ড্রাফট কপি কোনো সিস্টেমে রেখে দিয়েছিল যে সিস্টেমে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আমার প্রবেশাধিকার ছিল। এর সতর্কীকরণ STLW-এর অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। আমার সিস্টেমে সেটি খুব খারাপ শব্দ হিসেবে এলো। এটি একটি লেবেল যা আভাস দিত এই ডকুমেন্ট কম নিরাপত্তার সিকিউরিটি ড্রাইভে যাতে না থাকে।

এ ড্রাইভগুলোকে প্রতিনিয়ত চেক করা করা হয়। এতে কোনো খারাপ শব্দ পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্য। আমি এটা পেয়েই সাবধান হয়ে এই ডকুমেন্টটাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু এর আগে চেক করে নিলাম এই ডকুমেন্ট অন্য কোনো ফাইলকে সরিয়ে দেয়নি তো। সাধারণত আমি এক পলক দেখেই সরিয়ে দিই। কিন্তু এই ডকুমেন্ট ওপেন করার পর এর টাইটেল দেখে আমি বুঝলাম এটা আমার পুরোটা পড়তে হবে।

এ ফাইলে সেসব বিষয় ছিল যা আনক্লাসিফাইড ফাইলে ছিল না। এখানে সেসব তথ্য ছিল যা সাংবাদিকদের কাছেও ছিল না। এখানে এনএসএ'র

গোপন নজরদারি প্রোগ্রামের সব তথ্য ছিল যা কোর্টে অস্বীকার করা হয়। সংস্থার পরিচালকগণ ও বিচার বিভাগের নীতিকে আমেরিকার আইন ও সংবিধানের লঙ্ঘনে কীভাবে ব্যবহার করা হয় তা এখানে উল্লেখ আছে। এই ডকুমেন্ট পড়ে আমি বুঝতে পারলাম আইসির কোনো কর্মী তা সাংবাদিকদের কাছে ফাঁস করতে পারেনি আর কোনো বিচারকই তা সরকারকে জনসম্মুখে প্রকাশ করার কথা বলতে পারবে না। এ ডকুমেন্ট এত সুষ্ঠুভাবে আলাদা করা ছিল যে সিস্টেম অ্যাডমিন ছাড়া কেউ এই ডকুমেন্টে প্রবেশ করলে তাকে সনাক্ত করা হবে। আর এতে যেসব দুষ্কর্মের কথা লেখা ছিল তা কাটছাঁট না করে কোনো সরকারই প্রকাশ হতে দিতে চাইবে না।

আমি যে আনক্লাসিফাইড ভার্সন পড়েছি সেটা এই ক্লাসিফাইড ভার্সনের কাটছাঁট ছিল না। সেটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ডকুমেন্ট। ক্লাসিফাইড ভার্সন পড়েই বুঝলাম আনক্লাসিফাইডটা সাজানো মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

যখন একই ডকুমেন্টের দুটো ভার্সন নিয়ে কাজ করবেন তখন হয়তো খুব সামান্য পার্থক্য থাকবে দুটোতে। কমা বা কিছু শব্দের হেরফের থাকবে। কিন্তু এই দুটো ফাইলের শুধু টাইটেল এক ছিল। আনক্লাসিফাইড ভার্সনে উল্লেখ ছিল, ৯/১১ এর পর এনএসএ'কে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়। আর ক্লাসিফাইড ভার্সনে সেই ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহের স্বরূপ, প্রকৃতির উল্লেখ ছিল। এখানে টার্গেটেড তথ্য সংগ্রহ কথাটা ছিল না। এখানে ছিল গণহারে তথ্য সংগ্রহের কথা। আনক্লাসিফাইড ভার্সনে সন্ত্রাসবাদের ভয় দেখিয়ে গণনজরদারির যৌক্তিকতা দাড় করানো হয়। কিন্তু ক্লাসিফাইড ভার্সনে এটাকে বলা হয় প্রযুক্তির আইনসঙ্গত ব্যবহার।

ক্লাসিফাইড ভার্সনের এনএসএ আইজির অংশটি "কালেকশন গ্যাপ" বলে উল্লেখ করেছে। তারা উল্লেখ করে, বিদ্যমান নজরদারি আইন (বিশেষত বিদেশি গোয়েন্দা নজরদারি আইন) ১৯৭৮ সাল থেকে বহাল আছে, যখন বেশিরভাগ যোগাযোগ সংকেত রেডিও বা টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে প্রবাহিত হতো। তখন ফাইবার অপটিক ক্যাবল আর স্যাটেলাইটের ব্যবহার হতো না। সংক্ষেপে, এজেন্সিটি যুক্তি দিচ্ছিল যে, সমসাময়িক যোগাযোগের গতি ও পরিমাণ আমেরিকান আইনকে ছাড়িয়ে গেছে। কোনো আদালতই এমনকি গোপন আদালতও এর সাথে তাল মিলিয়ে যথেষ্ট ব্যক্তিকেন্দ্রিক ওয়ারেন্ট অনুমোদন করতে পারে না। তাই সত্যিই বিশ্বের জন্য একটি সত্যিকারের বিশ্ব গোয়েন্দা সংস্থা দরকার। ইন্টারনেট যোগাযোগের বাল্ক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে এটি ছিল এনএসএ'র যুক্তি। এ ব্যাপক সংগ্রহ প্রচেষ্টার কোড নাম ছিল STLW।

STELLARWIND-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। পিএসপি'র সব প্রোগ্রাম জনসম্মুখে প্রকাশ করার পর এই একমাত্র মূল প্রোগ্রামকে চুপিচুপি চালিয়ে যাচ্ছিল। STELLARWIND ছিল ক্লাসিইফাইড রিপোর্টের ও মূলত এনএসএ'র অতি

গোপন একটি বিষয়। এ প্রোগ্রামের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিলো আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়টি পরিবর্তন হয়ে প্রযুক্তিকে আমেরিকার নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল। আর এটা করা হচ্ছিল তাদের ব্যক্তিগত ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবহার করে। পুরো রিপোর্টজুড়ে প্রতারণা চলেছে। 2001 সালে পিএসপি-র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই STELLARWIND যোগাযোগ সংগ্রহ করে আসছিল। তবে ২০০৪-এ যখন বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা এ উদ্যোগের ধারাবাহিকতা অগ্রাহ্য করেছিলেন, তখন বুশ প্রশাসন মূল ইংরেজি শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে তার কাজকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

প্রতিবেদন অনুসারে, এনএসএ ওয়ারেন্ট ছাড়া যে কোনো যোগাযোগ ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে পারে। কারণ যদি কখনো এজেন্সি তাদের ডাটাবেজ থেকে ডকুমেন্ট চায় তাহলে তা বেআইনিভাবে সার্চ ও তথ্য সংগ্রহ না হয়ে বরং একে আইনি অর্থে 'অনুসন্ধান এবং পুনরুদ্ধার' বলা হবে। এসব শব্দের ব্যবহার আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হলেও তা আমার কাছে পীড়াদায়ক। কারণ আমি জানতাম এজেন্সি অনেক তথ্যকে চিরস্থায়ীভাবে জমা রাখার চেষ্টা করে আসছিল।

যদি শুধু যোগাযোগ রেকর্ড কাজের জন্য সংগ্রহ করাই হতো তাহলে কাজ শেষে তা সরিয়ে দেয়া হতো। কিন্তু সংগ্রহ করে স্টোরেজে রাখা মানে তা ভবিষ্যতে ব্যবহার করা যাবে। ডাটাবেজে প্রবেশ করে কারো ব্যক্তিগত কাজ ব্যাখ্যা করা, অনুসন্ধান করার জন্য মার্কিন সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দক্ষতা বাড়াচ্ছিল। এতে মার্কিন সরকার যে কারো অতীতের যোগাযোগ ব্যবহার করে তাকে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধের ভিক্টিম করতে পারত। এতে ভবিষ্যতে এনএসএ যেকোনো মানুষের ফোন, কম্পিউটারে ট্র্যাক করতে পারবে। জানতে পারত তারা কে, কোথায় থাকে, কার সাথে তারা কী করছে, অতীতে তারা কী করেছিল এসবকিছু জানতে পারবে।

***

গণনজরদারি কথাটা আমার কাছে স্পষ্ট। কিন্তু Bulk Collection কথাটা এজেন্সির কার্যক্রম সম্পর্কে মিথ্যে ছবি তৈরি করে। Bulk Collection কথাটি একটি ব্যস্ত পোস্ট অফিস বা স্যানিটেশন বিভাগের মতো শোনাচ্ছে এটি সব রকমের ডিজিটাল যোগাযোগের ওপর স্পষ্টতই দখল ও প্রবেশাধিকার অর্জনের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার বিপরীত।

একবার কোনো পরিভাষা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটি নিয়ে ভুল ধারণা প্রচুর পরিমাণে বাড়তে পারে। বেশিরভাগ লোকেরা আজও বিষয়বস্তুর নিরিখে গণনজরদারি করার কথা ভাবেন। তারা সরকারি নজরদারি সম্পর্কে তুলনামূলক কম চিন্তাভাবনা করেন।

আমাদের কণ্ঠের শব্দ, আমাদের থাম্বপ্রিন্টের মতোই ব্যক্তিগত। আমরা কখনো বা সেলফি তুলে টেক্সটের মাধ্যমে তা পাঠাচ্ছি। দুর্ভাগ্যজনক সত্যটি হলো আমাদের যোগাযোগের এসব অলিখিত বিষয়বস্তুও আমাদের অনেক তথ্য ও আচরণ প্রকাশ করতে পারে।

এনএসএ এটাকে বলে মেটাডাটা। এটি হলো তথ্যের ব্যাপারে তথ্য। সহজভাবে বললে, মেটাডাটা হলো আপনি ডিভাইসে যা করছেন আর আপনার ডিভাইস যে কাজ করছে এসব কার্যক্রমের তথ্য এতে থাকে।

একটি ফোনের মেটাডাটার কথাই ধরুন। এতে আপনার কলের তারিখ, সময়, কলের স্থায়িত্ব, যে নাম্বার থেকে কল দিয়েছেন, যে নাম্বারে কল দিয়েছেন, লোকেশনসহ সব তথ্য এখানে থাকবে। ইমেইলের মেটাডাটাতে থাকবে কখন, কোথায়, কার, কোনরকমের কম্পিউটার থেকে এটি পাঠানো হয়েছে। কে পাঠিয়েছে, কার কাছে পাঠিয়েছে, কখন কোথায় তা রিসিভ করা হয়েছে। প্রেরক ও প্রাপক ছাড়া আর কে এতে কখন, কোথায় প্রবেশ করেছে। আপনি যে যে জায়গায় যাবেন, যতক্ষণ ওখানে কাটাবেন সবই এটি ফাঁস করবে। কার সাথে আপনি যোগাযোগ করছেন, কে আপনার সাথে যোগাযোগ করছে সব এতে থাকবে।

মেটাডাটা দিয়ে সরাসরি যোগাযোগের উপাদানগুলোতে প্রবেশ করা যায় না সরকারের এই দাবি এক্ষেত্রে মিথ্যে প্রমাণিত হচ্ছে। পৃথিবীর এত বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল যোগাযোগ থেকে একসাথে প্রতিটি ফোন কলের কথা শোনার আর প্রতিটি ইমেইল পড়ার সাধারণত কোনো উপায় নেই। এটা যদি সহজলভ্যও হতো তাহলেও এর উপকারিতা নেই।

মেটাডাটাকে তাই গভীরতম তথ্য পাবার সহায়ক ভাবার দরকার নেই। আপনি যে নজরদারি তথ্য চাচ্ছেন এটি তার প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করে। আরেকটি বিষয় আছে। সেটা হলো কন্টেন্ট। এটি হলো আপনি জেনেশুনে যা কিছু উৎপাদন করছেন। আপনি ফোনকলে যেসব কথা বলছেন, ইমেইলে যেসব লিখে পাঠাচ্ছেন এসব। কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে গড়ে ওঠা মেটাডাটার ওপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এটি মেশিনে তৈরি হয়, সংগৃহীত হয়, জমা হয়। এ কাজটা হয় আপনার কোনো মতামত ছাড়াই। আপনি চান বা না চান আপনার ডিভাইস আপনার হয়ে যোগাযোগ করছে। এটি আপনার ব্যক্তিগত যোগাযোগকে ধরে রাখছে না বা কোড ওয়ার্ড ব্যবহার করছে না।

দুঃখের বিষয় হলো, আইন প্রযুক্তির উদ্ভাবন থেকে পিছিয়ে আছে। এটি যোগাযোগের মেটাডাটার চেয়ে কন্টেন্টের নিরাপত্তায় জোর দেয়। আর গোয়েন্দা এজেন্সি মেটাডাটাই চায়। তারা এর মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনের রূপরেখা তৈরি করে মানুষের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করে। মেটাডাটা গোয়েন্দাদেরকে আপনার ব্যাপারে সব তথ্য দিতে পারে যা তারা চায়। শুধু আপনার মস্তিষ্কে কী চলছে তা ছাড়া।

ক্লাসিফাইড রিপোর্ট পড়ার পর সপ্তাহ, মাস হতাশায় কাটালাম। জাপানে থাকার পুরোটা সময় আমার মাথায় যেসব চিন্তা-ভাবনা চলছিল তাকে সরিয়ে রাখতে চাইতাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি বাসা থেকে বহুদূরে আছি কিন্তু তবু আমার কাজকর্ম নজরদারি করা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল আমরা সবাই বড় হয়ে গেছি কিন্তু তবুও জোর করে বাবা-মা আমাদের প্রতিটি কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। লিন্ডসির কাছে আমার কষ্টের কথা কিছুই বললাম না। আমার কাছে নিজেকে বোকা মনে হচ্ছিল। কারণ মূল উদ্দেশ্যের কথা না জেনেই আমি সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তৈরি করতে সহায়তা করেছি। আমার মনে হচ্ছিল আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে।

আমি দেশের নিরাপত্তা না দিয়ে সরকারকে নিরাপত্তা দিয়েছি। জাপানে থাকার পুরো সময়টা আমার মনে হচ্ছিল আমার সাথে বেইমানী করা হয়েছে।

কমিউনিটি কলেজে থাকাকালীন জাপানি এনাইম ও ম্যাংগায় আমার আগ্রহের কারণে আমি একটু-আধটু জাপানি বলতে পারতাম। কিন্তু জাপানি পড়তে পারা ভিন্ন ব্যাপার। জাপানে প্রতিটা শব্দের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। একে বলা হয় কাঞ্জি। তাদের আছে দশ হাজারের মতো কাঞ্জি। আমি মাত্র কয়েকটা পারতাম। এগুলো তাদের ধ্বনিগত ব্যাখ্যা দিয়ে লেখা হতো। এর নাম ছিল ফুরিগানা। এটি ছিল বিদেশিদের ও ইয়ং রিডারদের জন্য। এগুলো জনগণের জন্য ব্যবহৃত হতো না।

রাস্তায় পুরোপুরি মূর্খের মতো চলাচল করতাম। ডানে না বামে যেতে বলা হয়েছে একেবারেই বুঝতাম না। লিন্ডসির সাথে মাঝেমধ্যে ওর ফটোগ্রাফির জন্য গ্রামগঞ্জে যেতাম। আশপাশের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। অথচ আমি কী করছি এসব তথ্যই আছে। সরকারের কাছে আমার জীবনের সবকিছুই একেবারে স্বচ্ছকাঁচের মতো। যে ফোন আমাকে সঠিক পথ দেখাত, ট্রাফিক সিগন্যাল ট্রান্সলেট করে দিত, বাসে-ট্রেনে আমাকে সময় বলে দিত সেই একই ফোন আমার নিয়োগদাতাদের কাছে আমার কাজকর্ম জানান দিত। আমি একেবারে ফোন না ধরে পকেটে রেখে দিলেও তা তাদেরকে জানাত আমি কখন, কোথায় আছি।

আমি আর লিন্ডসি একবার হাইক করতে গিয়ে হারিয়ে গেলাম। লিন্ডসির সাথে আমি কোনো কথাই শেয়ার করিনি, তবুও তখন মনের কষ্ট চেপে রেখে ওকে মজা করে বলছিলাম, "তুমি ফোর্ট মিডে মেসেজ দিয়ে আমাদেরকে খুঁজতে বলো।"

লিন্ডসি মজা করে বলল, "হ্যালো, আপনারা কী আমাদেরকে পথ খুঁজে দিবেন?"

পরবর্তীতে আমি পার্ল হারবারের কাছে হাওয়াইতে বসবাস করতে শুরু করলাম। পার্ল হারবারে আমেরিকার ওপর আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকা তার শেষ ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ করে বলে আমি মনে করি। জাপানে আমি থাকতাম

হিরোশিমা, নাগাসাকির কাছেই। এই দুটো জায়গায় কলংকজনকভাবে যুদ্ধের শেষ হয়।

আমি আর লিন্ডসি ওসব জায়গায় যেতে চাইতাম। কিন্তু প্রতিবারই কোনো না কোনোভাবে তা ক্যান্সেল হয়ে যেত। একবার হনশু থেকে হিরোশিমায় যাবার কথা ছিল। কিন্তু আমার কাজের জন্য উত্তর দিকে মিসাওয়া বিমানঘাঁটিতে যেতে হলো। আরেকবার যাবার আগে লিন্ডসি অসুস্থ হয়ে গেল, তারপর আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম।

শেষবার আমরা নাগাসাকিতে যাওয়ার আগের দিন রাতে বেশ বড়সড় ভূমিকম্প হলো। আমরা দৌড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামলাম। বাকি রাতটুকু প্রতিবেশীদের সাথে রাস্তায় কাটাতে হলো।

আফসোস আমরা আর কখনোই যেতে পারিনি। সেই জায়গাগুলো দুই লাখ পুড়ে মারা যাওয়া মানুষ ও অগণিত মানুষ যারা এর বিষাক্ত পরিণাম এখনো ভুগছে তাদের স্মৃতি বহন করে। আর আমাদেরকে জানান দেয় প্রযুক্তির নীতিহীন ব্যবহারের।

ফিজিক্সের ভাষায় অ্যাটোমিক মোমেন্ট বলে একটা কথা আছে। তখন নিউক্লিয়াস প্রোটন ও এর আশপাশের নিউট্রনকে একত্রিত করে পরমাণুতে পরিণত করে। এর আবির্ভাব ঘটে চিকিৎসা, কৃষি, বিদ্যুৎ, পানি এসবকিছুতে উন্নয়নের জন্য। এটি তৈরি করে পারমাণবিক বোমা।

শিল্পবিপ্লবের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, সামরিক বাহিনী, সরকার যে যেভাবে পারে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে শুরু করে। মূলত যেভাবে উচিত সেভাবে করছিল না। আমি পারমাণবিক অস্ত্র ও সাইবার নজরদারিকে তুলনা করছি না। কিন্তু বিস্তার ও নিরস্ত্রীকরণ এর ক্ষেত্রে এ দুটি ধারণার মিল আছে।

নাৎসি জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গণনজরদারি ব্যবহার করেছিল। এটা তারা করে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত ও প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য পাবার জন্য। ১৯২৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব জোটের প্রথম আদমশুমারি হয়। এটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রকাশ্যে সোভিয়েত নাগরিকদের জাতীয়তা অনুসন্ধান করা। এথনিক রাশিয়ান এলিট যারা ছিল সংখ্যালঘু তাদের জন্য এটি ছিল সুবিধাজনক। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের শিকড় মূলত ছিল এশিয়ায়। তারা ছিল উজবেক, কাজাখ, তুর্কমেনীয়, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান। এর ফলে স্টালিন এসব সংস্কৃতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি মুছে দিয়ে তাদেরকে মার্ক্সীয়, লেনিনীয় শিক্ষা দেয়ার ভিত্তি রচিত করেন।

১৯৩৯ সালে নাৎসি জার্মানরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই রকম কার্যক্রম হাতে নেয়। যাতে রাইখস্ট্যাগের ইহুদি ও রোমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করতে পারে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাইখস্ট্যাগের সহায়তা করে দেহোমাগ। এটি আমেরিকান আইবিএম এর জার্মান সম্পূরক প্রতিষ্ঠান। দেহোমাগের কাছে একটি এনালগ কম্পিউটারের স্বত্ব ছিল। এর মাধ্যমে কার্ডের

ছেদগুলো গণনা করা হতো। দেশের প্রতিটা নাগরিককে একটি কার্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হতো। কার্ডের নির্দিষ্ট দাগ নির্দিষ্ট জাতিসত্তার পরিচয় বহন করত। দাগ এক ছিল প্রোটেস্টেন্ট, দাগ দুই ক্যাথলিক, দাগ তিন জিউইশ।

এই শুমারির পরপরই ইউরোপের ইহুদিদের জায়গা হয় ক্যাম্পে। রাইখস্টাগ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধকালীন যন্ত্রপাতির মিলিত ক্ষমতার চেয়ে এখন স্মার্টফোনের গণনা ক্ষমতা অনেক বেশি। আধুনিক আমেরিকার গোয়েন্দা এজেন্সির প্রযুক্তির ওপর আধিপত্যের সাথে এটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার ওপরেও মারাত্মক হুমকি। বিগত শতকে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে কিন্তু ততটা এর অপব্যবহার দমনের জন্য আইনি উন্নতি হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যই একটি আদমশুমারি রয়েছে। প্রতিটি রাজ্যের জনসংখ্যার হিসেব করে প্রতিনিধি সভায় আনুপাতিক প্রতিনিধি নির্ধারণের জন্য আমেরিকার সংবিধান আদমশুমারি ব্যবস্থা প্রচলন করে। ব্রিটিশ রাজতান্ত্রিক উপনিবেশে ঐতিহ্যগতভাবে শুল্ক নির্ধারণের জন্য এবং সামরিক লোকবল নিয়োগের জন্য উপযুক্ত যুবকদের সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতি হিসেবে আদমশুমারিটি ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি ছিল স্বৈরাচারী শাসকদের সংশোধনবাদী নীতির অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। সংবিধান প্রণেতারা গণতন্ত্রকে নিপীড়নের এ প্রক্রিয়াকে নতুন রুপ দান করেন। সিনেটের অধীনে দশ বছর পর এই আদমশুমারি হতো। ১৭৯০ সালে প্রথম আদমশুমারি হয়। ১৮৯০ সালে প্রথমবার কম্পিউটার ব্যবহার করে আদমশুমারি হয়। পরে এধরনের কম্পিউটার আইবিএম নাৎসি জার্মানির কাছে বিক্রি করে দেয়। কম্পিউটিং টেকনোলজির উন্নতির সাথে এর প্রক্রিয়াকরণের সময়ও কমে আসে।

গণনজরদারিকে চলমান শুমারি বলা যায়। আমদের ফোন, কম্পিউটার যা নিয়ে আমরা ঘুরছি তা মূলত ছোট গণনাযন্ত্র যা সব মনে রাখে। কিছুই ক্ষমা করে না।

জাপানে আমি বুঝতে পারলাম এই নতুন প্রযুক্তি যে পথে এগোচ্ছিল তা আমাদের প্রজন্ম হস্তক্ষেপ না করলে চলতেই থাকবে। আমরা অবশেষে প্রতিরোধের সংকল্প করলেও যদি এ ধরনের প্রতিরোধ নিরর্থক হয়, তাহলে এটি ট্রাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়। অনাগত প্রজন্মকে এমন এক পৃথিবীতে অভ্যস্ত হতে হবে যেখানে নজরদারিকে তারা ভাববে নিয়মিত ও ন্যায়সঙ্গত পরিস্থিতিতে পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। তখন মানুষের জীবনে এটির চলমান এবং নির্বিচার উপস্থিতি থাকবে। চলমান নজরদারি; যে কান যে সর্বদা শোনবে, যে চোখ সর্বদা দেখবে। স্মৃতি হয়ে যাবে চিরস্থায়ী।

তথ্য চিরস্থায়ীভাবে স্টোরেজে একবার একত্রিত হয়ে গেলে, সরকার যে কাউকেই বলির পাঠা বানানোর জন্য কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বেছে নিয়ে অনুসন্ধানে চালাতে পারবে। ঠিক যেভাবে অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণের জন্য আমি এজেন্সির ফাইলগুলোতে অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলাম।

মেঘের উপর বাড়ি

২০১১ সালে আবার আমেরিকা চলে আসি। ডেলের জন্য কাজ করা শুরু করলাম। এক বসন্তে আমাব নতুন কর্মস্থলে প্রথম দিন কাটিয়ে বাসায় ফিরে আসলাম। যে বাসায় আমি উঠেছি সেখানে একটি মেইলবক্স চোখে পড়ে। মেইলবক্স দেখে খুব খুশি হলাম। যদিও এটা খুব স্বাভাবিক বিষয় তবু আমি খুশি হই। বেশ কয়েক বছর ধরে আমার কোনো মেইল বক্স ছিল না আর তাই তা চেক করারও সুযোগ ছিল না। আমি হয়তো এটা খেয়ালও করতাম না যদি না প্রচুর মেইল জমা হবার কারণে মেইল বক্স খুলে না পড়ত। এক গাদা মেইলের ঠিকানায় লিখা ছিল 'মিস্টার এডওয়ার্ড জে স্নোডেন'। খামগুলো ছিল গৃহস্থালি জিনিসপত্রের কুপন ও বিজ্ঞাপন সম্বলিত। তার মানে কেউ জানত আমি এখানে থাকি।

তখন আমার ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ল। আমি মেইল চেক করে আমার বোনের কাছে আসা একটি মেইল পেলাম। সেটা আমি খুলতে চেয়েছিলাম কিন্তু মা তা করতে দেননি। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, 'এটি তোমার উদ্দেশ্যে আসেনি'।

তিনি বোঝালেন অন্য কারো মেইল পড়া একটি অপরাধ। হোক তাতে কোনো বার্থডে কার্ড বা সাধারণ কিছু। অন্যের মেইল পড়া কোনো ভালো কাজ নয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম কোন রকম অপরাধ। মা বললেন, 'বেশ বড় অপরাধ। রাষ্ট্রীয় অপরাধ'।

আমি পার্কিং লটে দাড়িয়ে খামগুলো অর্ধেক ছিড়ে ময়লায় ফেলে দিলাম। আমার রাল্ফ লরেন স্যুটের পকেটে একটি নতুন আইফোন ছিল। আমার চোখে বারবেরি গ্লাস ছিল। মাথায় ছিল নতুন হেয়ারকাট। সাথে ছিল ম্যারিল্যান্ডের কলম্বিয়ার নতুন বাড়ির চাবি। ম্যারিল্যান্ড, সবচেয়ে বড় জায়গা যেখানে আমি থেকেছি। এই জায়গাকে আমার নিজের জায়গা মনে হতো। আমি বড়লোক ছিলাম বা বন্ধুরা তাই ভাবত। নিজেকে খুব কমই চিনতে পারতাম।

সত্যকে উপেক্ষা করে জীবন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম নিজের আপনজনদের জন্য টাকা কামাই করব, তাদের জীবন সুন্দর করব। অন্যরা তো এটাই করত তাই না? কিন্তু এটা বলা খুব সহজ। সত্যকে উপেক্ষা করে কত সহজে টাকা কামাই করছিলাম। আর কত সহজে নিজেকে অপরাধী ভাবছিলাম।

আমি আমেরিকা ফিরে আসি চার বছর পর। যে আমেরিকায় ফিরে আসি তা অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এমন না যে আমেরিকায় ফিরে এসে আমার নিজেকে বিদেশি মনে হচ্ছিল। তবে কিছু বিষয়ের আলাপচারিতা মোটেও বুঝতাম না। এসব ছিল কোনো টিভি বা মুভি কিংবা সেলিব্রিটি

স্ক্যান্ডালের খবরাখবর। এসব খবর আমি কখনোই রাখতাম না। আমার মাথায় বিপরীত চিন্তভাবনা ঘুরপাক খেত। আমি সহজ সরল মানুষদের কথা ভাবতাম, তাদের সব কার্যক্রম সরকারের নজরদারির অধীনে ছিল।

তারপর আবার নিজের ভাবনাকে থামিয়ে দিতাম। বলতাম, চুপ করো এত নাটুকেপনার দরকার নেই। তারা ভালো আছে, তাদের কোনো চিন্তা নেই তোমারও চিন্তা করার দরকার নেই। নিজের কাজ করো, বিল দাও। এটাই জীবন।

লিন্ডসি ও আমি একটি সাধারণ জীবন চাইতাম। আমাদের ব্যাকইয়ার্ডে চেরী গাছ ছিল। এটা দেখে আমার জাপানের কথা মনে পড়ত। তামা নদীর ধারে একটি জায়গায় আমি আর লিন্ডসি খোশগল্প করতাম। টোকিওতে মাটিতে ছড়িয়ে থাকা সুগন্ধিযুক্ত ফুলের উপর ঘুরঘুর করতাম। আর সাকুরা জলপ্রপাত দেখতাম। লিন্ডসি যোগ ব্যায়ামের প্রশিক্ষক হিসেবে সার্টিফিকেট পায়। আর আমি আমার নতুন চাকরিতে সেলস ডিপার্টমেন্টে নতুন পদবির সাথে অভ্যস্ত হচ্ছিলাম। EPICSHELTER এ আমি একজন বিক্রেতার সাথে কাজ করতাম। সে ডেলের জন্য কাজ করা শুরু করল। সে আমাকে জানায়, ঘণ্টা হিসেবে কাজের বেতন পেয়ে আমি মূলত আমার সময়কে নষ্ট করছি। আমার উচিত ডেলের সেলসে যোগ দেয়া। সেখানে আমি EPICSHELTER-এর মতো আইডিয়া দিয়ে নিজের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনতে পারি। এতে আমি কর্পোরেট জগতে আরোহণ করে উন্নতির শিখরে পৌছতে পারব আর সে পাবে রেফারাল বোনাস। আমি এই সুযোগ নিতে চাইলাম। কারণ আমার মাথায় যে অস্বস্তি চলছিল তা আমাকে বিপদে ফেলে দেবে। এখানে আমার জব টাইটেল ছিল সল্যুশন কনসাল্টেন্ট। অর্থাৎ আমার নতুন পার্টনার যেসব সমস্যা তৈরি করবে এর সমাধান দেয়া। সে ছিল একাউন্ট ম্যানেজার। তাকে আমি ক্লিফ ডাকতাম।

তার কাজ ছিল ডেলের যন্ত্রপাতি যেকোনো উপায়ে বিক্রয় করা। আমার কাজ ছিল বিশেষজ্ঞদের একটা দলকে নেতৃত্ব দেয়া। মিথ্যে বলে বেচাকেনা করে ক্লিফ যেসব সমস্যা তৈরি করত তা আমাদেরকে দূর করতে হতো যাতে জেলে না যেতে হয়। আমাদের কাজ ছিল সিআইএকে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করা বা এনএসএর সাথে পাল্লা দিয়ে তাদের নিজেদের একটি প্রাইভেট ক্লাউড তৈরি করে দেয়া। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এটিকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে কেউ সিআইএ সদর দপ্তরে বসে যে কাজ করে আফগানিস্তানের কোনো তাবুতে বসেও একই কাজ করতে পারে। আইসির প্রযুক্তিবিদরা 'Silos'-এর ব্যাপারে অভিযোগ করে আসছিলেন। এতে বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি ডাটাকে তারা অনুসরণ করতে সমস্যা হচ্ছিল। তাই আমি ডেলের সবচেয়ে মেধাবীদের নিয়ে একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম এমন একটি উপায় তৈরির জন্য যাতে যে কেউ যে কোনো জায়গায় বসে যে কোনো কিছু জানতে পারে। কাজ চলাকালীন সময়ে ক্লাউডের নাম ছিল 'Frankie'.

আমরা এটাকে বলতাম 'The Private Cloud'। ক্লিফ এর নাম দিয়েছিল। সে বলত, সিআইএ আমাদের ছোট ফ্রাংকেন্সটাইনকে পছন্দ করবে। কারণ এটি সত্যিকার মনস্টার। ক্লিফ যত বেশি ওয়াদা করতে লাগল আমি ততই ব্যস্ত হতে থাকলাম।

লিন্ডসি আর আমি সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া আমাদের পরিবার ও বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারতাম না। আমাদের নতুন বাসা ফার্নিচার দিয়ে সাজাতে চাচ্ছিলাম। আমরা বাসনপত্র, ছুরিকাচি, চেয়ার, টেবিল সব কিনলাম। কিন্তু আমরা মাটিতে ম্যাট্রেসে ঘুমাতাম। ক্রেডিট কার্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য আমার ভালো লাগত না। তাই টাকা দিয়ে সব কিনলাম। ৩০০০$ ডলার ক্যাশ দিয়ে আমি 98 Acura Imtegra গাড়ি কিনলাম। আমি আর লিন্ডসি কোনো উৎসব ছাড়া বা কম্পিউটার জিনিসপত্র কেনা ছাড়া টাকা খরচ করতে পছন্দ করতাম না।

ভ্যালেন্টাইন্স ডে'তে লিন্ডসিকে রিভলবার গিফট দিলাম যা সে সবসময় চাইত। আশপাশের মল থেকে আমাদের কন্ডোমিনিয়ামে আসতে লাগত ২০ মিনিট। কলম্বিয়া মল ১.৫ লক্ষ স্কয়ার ফিটের একটি শপিং মল। এতে ছিল দুশো দোকান, ১৪টি স্ক্রিনের মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল আর চাইনিজ চিজ ফ্যাক্টরি। এই পথ দিয়ে যাতায়াতকালে আমি আশ্চর্য হতাম। আমার অনুপস্থিতিতে কত উন্নতি হয়েছে।

৯/১১ পরে সরকার স্থানীয় পকেটে প্রচুর টাকা ঢালছিল। আমেরিকা ফিরে এসে বুঝতে পারলাম এই অংশ কত বিত্তশালী হয়ে গেছে। নামিদামি শোরুমগুলো প্রেসিডেন্ট ডে, মেমোরিয়াল ডে, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, লেবার ডে, কলম্বাস ডে, ভেটেরান্স ডেতে ডিস্কাউন্ট দিত। এক বিকেলে আমরা বেস্ট বাইতে গেলাম। একটা মাইক্রোয়েভ কিনলাম। তারপর লিন্ডসির জোরাজুরিতে ব্লেন্ডার দেখছিলাম। লিন্ডসি তার ফোন বের করে কোনটির ভালো রিভিউ আছে তা দেখতে লাগল। আমি কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে কম্পিউটার দেখছিলাম। এটা ছিল শোরুমের একেবারে শেষ মাথায়।

কিচেনওয়্যার সেকশনের শেষ মাথায় একটি রেফ্রিজারেটর দেখে চমকে উঠলাম। এটা একটা স্মার্ট ফ্রিজ। এটায় নাকি ইন্টারনেট সংযোগ আছে।

একজন সেলসম্যান এসে বলল, 'এটা খুব সুন্দর তাই না?'

সে এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বলে যাচ্ছিল। ফ্রিজের দরজায় একটি স্ক্রিন ছিল. স্ক্রিনের পাশে একটি স্টাইলাস ছিল। এর মাধ্যমে স্ক্রিনে মেসেজ লিখা যেত। লিখতে না চাইলে অডিও বা ভিডিও মেমো রেকর্ড করা যাবে। এই স্ক্রিনকে কম্পিউটারের মতো ব্যবহার করা যাবে। কারণ এতে ওয়াইফাই আছে। এতে আপনি ইমেইল চেক করতে পারবেন, ক্যালেন্ডার দেখতে পারবেন। আপনি ইউটিউবে ভিডিও দেখতে পারবেন, গান শুনতে পারবেন। আপনি ফোনও দিতে পারবেন। আমার লিন্ডসিকে ফোন দিয়ে খুব জানাতে ইচ্ছে করছিল- 'লিন্ডসি আমি ফ্রিজ থেকে ফোন দিচ্ছি।' কিন্তু নিজেকে

থামালাম। সেলসম্যান বলতে থাকল, ফ্রিজের কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ট্র্যাক করে, বারকোড স্ক্যান করে খাবার টাটকা রাখে। এটি নিউট্রিশনাল তথ্য দেয় ও রেসিপি সাজেস্ট করে।

আমার মনে হয় ডেলিভারি চার্জসহ এর দাম ৯০০০$ ডলারের উপর, সেলসম্যান বলল। আমি সংশয় ও নীরবতা নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। এরকম আকর্ষণীয় প্রযুক্তির ওয়াদা তো আমরা করিনি। আমি ভাবছিলাম, ওটা ইন্টারনেট বেষ্টিত ছিল যাতে এর উৎপাদনকারীকে এর ব্যবহারকারীর ব্যবহারের তথ্য ও গৃহস্থালি তথ্য দিতে পারে, যা খুব সহজেই অর্জন করা যায়। উৎপাদনকারী এই তথ্য বেঁচে টাকা আয় করবে। আর আমরা এই সুবিধার জন্য তাদেরকে টাকা দিব।

আমি ভাবছিলাম সরকারি নজরদারি নিয়ে এত ভেবে আমার কী লাভ। যেখানে আমার বন্ধু, প্রতিবেশী, নাগরিকরা তাদের ঘরে বাণিজ্যিক নজরদারি নিজে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসছে। ডমোটিক্স রিভলুশউনের অর্ধদশক আগে মানুষ আমাজান ইকো ও গুগল হোমকে নিজেদের বেডরুমে সাজিয়ে রাখত। তাদের কাজকর্ম রেকর্ড হবার সুযোগ দিত। তারপর এসব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্যাশে পরিণত হতো। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য নিয়ে প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজগুলো একদিকে লাভবান হচ্ছিল আর আমরা নিঃস্ব হচ্ছিলাম। সরকারি নজরদারি জনগণকে প্রজায় পরিণত করছিল আর বাণিজ্যিক নজরদারি ভোক্তাকে পরিণত করছিল দ্রব্যে। যেটা তারা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছে বেঁচে দিত।

এদিকে ডেলের মতো টেকনোলজিক্যাল কোম্পানি ক্লাউড তৈরির জন্য চেষ্টা করছিল। আমি আশ্চর্য হলাম মানুষের নিজেদের ছবি, ভিডিও, ই-বুক প্রতিনিয়ত ব্যাকআপ হচ্ছিল কিন্তু তারা এ নিয়ে চিন্তিত ছিল না। কেন তাদের সুবিধাজনক স্টোরেজ সমাধান ফ্রিতে দেয়া হচ্ছিল এটা তারা ভাবেনি। ডেলের জন্য ক্লাউড সিআইএ'র কাছে বেঁচে দেয়া সহজ ছিল। যেমন সহজভাবে আমাজন, অ্যাপল, গুগল তাদের ব্যবহারকারীদের কাছে এটা বেঁচে দিত। ক্লিফ সিআইএ-কে বলত, কে বিশ্বের কোন প্রান্তে কোন ফাইল পড়ছে তা সিআইএ ট্র্যাক করতে পারবে। মেঘ সাদা, তুলোর মতো, প্রশান্তিদায়ক ও আকাশে ভাসমান। যদিও কিছু মেঘ ঝড় নিয়ে আসত। কিছু মেঘ আসত ছায়া নিয়ে। এটি ছিল নিরাপদ। আমার মনে হয় সবাই এটাকে স্বর্গের মতোই ভেবেছে।

আমাজন, অ্যাপল ও গুগলের সাথে ডেল ছিল ক্লাউডভিত্তিক বৃহৎ প্রাইভেট কোম্পানি। তারা ক্লাউডকে কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত বলে ভাবত। কিন্তু আসলে এটা পুরনো মেইনফ্রেম কম্পিউটারের পুনরাগমন বলা যায়। যেখানে সকল ব্যবহারকারী একটি ক্ষমতাধর কেন্দ্রীয় কোরের ওপর নির্ভর করত। যেগুলো পরিচালনা করত প্রফেশনালরা। ডেল স্বল্পমূল্যের ব্যক্তিগত কম্পিউটার বাজারে আনার পর মানুষ মেইনফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহার

ছেড়ে দেয়। আগমন ঘটে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, ট্যাব, স্মার্টফোনের। এতে মানুষ অনেক সৃজনশীল কাজ করার স্বাধীনতা পায়। সমস্যা ছিল এসব কাজ কীভাবে জমা রাখবে?

এটাই ছিল 'ক্লাউড কম্পিউটিং' এর শুরু। আপনি কী রকমের ব্যক্তিগত কম্পিউটার ব্যবহার করছেন তা কোনো ব্যাপার না। কারণ মূল যেসব কম্পিউটারে আপনি নির্ভর করেছেন সেগুলো অগণিত ডাটা সেন্টারে রাখা হয়েছে। যেগুলো ক্লাউড কোম্পানি তৈরি করেছে। এগুলো ছিল নতুন মেইনফ্রেম কম্পিউটার। প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে তাদের নিজস্ব সার্ভার সংযোগ দেয়া ছিল। এমনভাবে সংযোগ ছিল যে প্রতিটি কম্পিউটার সমন্বিত কম্পিউটিং সিস্টেমে একত্রে কাজ করত। একটি সার্ভার বা ডাটা সেন্টারের ক্ষতি হলেও কোনো সমস্যা নেই। কারণ বৈশ্বিক ক্লাউডে তারা বিন্দু ছাড়া আর কিছুই না।

ক্লাউড হলো একটা স্টোরেজ ম্যাকানিজম যেখানে ডাটা জমা হয়। মূলত এটি বিভিন্ন সার্ভারে জমা হচ্ছে, যা বিভিন্ন কোম্পানি ব্যবহার করতে পারে। এতে আপনার তথ্য আর আপনার থাকছে না। কোম্পানিগুলো যেকোনো সময় যেকোনো কাজে তা ব্যবহার করতে পারে। ক্লাউড স্টোরেজের সার্ভিস চুক্তিগুলো পড়ে দেখবেন। প্রতি বছর এগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। বর্তমানগুলো ছয় হাজার শব্দের ওপরে। এ বইয়ের যেকোনো অধ্যায়ের দ্বিগুণ।

যখন অনলাইনে আমাদের ডাটা সংরক্ষণ করছি তখন মূলত আমরা এর ওপর আমাদের স্বত্ব পরিত্যাগ করছি। কোম্পানি সিদ্ধান্ত নেয় তারা কোন ডাটা রাখবে আর কোনটা বাদ দিবে। আমরা যদি আমাদের ডিভাইসে বা ড্রাইভে আলাদা কপি না রাখি তাহলে এটা চিরতরে মুছে যাবে। যদি কোম্পানি আমাদের ডাটা আপত্তিকর মনে করে বা ক্ষতিকর মনে করে তাহলে তারা নিজেদের কাছে এক কপি রেখে আমাদের ডাটা একতরফাভাবে ডিলিট করে দিতে পারে। তারা ভবিষ্যতে এই ডাটা আমাদেরকে না জানিয়েই কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত আমাদের তথ্যের গোপনীয়তা নির্ভর করছে তথ্যের মালিকানার ওপর। সব সম্পত্তিই এখানে সুরক্ষিত কিন্তু কোনোটাই আর অধিক গোপনীয় নয়।

আমি যে ইন্টারনেটের সাথে বেড়ে উঠেছি তা হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে আমার তারুণ্যও। যে অনলাইনে প্রবেশ করা আগে এডভেঞ্চার মনে হতো তা এখন অগ্নিপরীক্ষা মনে হয়। নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশের সাথে এখন দরকার পড়ছে নিজস্ব নিরাপত্তা। কারণ স্বাধীনতা, আনন্দ এসব হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা যোগাযোগের জন্য এখন নিরাপত্তার দরকার হচ্ছে। প্রতিটা তথ্য আদান-প্রদান এখন বিপজ্জনক। এদিকে প্রযুক্তির ওপর আমাদের নির্ভরতাকে পুঁজি করে বেসরকারি সেক্টর মুনাফা অর্জন করছে। আমেরিকার বেশিরভাগ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তাদের সারাটা জীবন ইমেইল, ই-কমার্স প্লাটফর্ম ও সোশ্যাল

মিডিয়াতে কাটাচ্ছে। এগুলোর ওপর আছে গুগল, ফেসবুক, আমাজনের আধিপত্য। আমেরিকান গোয়েন্দা এজেন্সি এই সুযোগের ব্যবহার করে এসব কোম্পানির নেটওয়ার্কে প্রবেশ করছে। কখনোবা সরাসরি আদেশের মাধ্যমে আর কখনোবা গোপনে। আমাদের ইউজার ডাটা কোম্পানিগুলোর জন্য মুনাফা বয়ে আনছিল। আর সরকার ফ্রিতে তা লুট করছিল। আমার মনে হয় না এর আগে কখনো নিজেকে এত ক্ষমতাহীন মনে হয়েছে। আমার গোপনীয়তা ভঙ্গ হচ্ছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আমি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

আমেরিকার মৌলিক আইন, আইন প্রয়োগের কাজটিকে সহজ নয় বরং আরো কঠিন করে। এটি কোনো ত্রুটি নয়, এটি গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। আমেরিকান ব্যবস্থায়, আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকদেরকে একে অপরের হাত থেকে রক্ষা করবে বলে আশা করা হয়। আদালতের কাজ হলো যখন ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় তখন সেই ক্ষমতাটিকে নিয়ন্ত্রণ করা। আর যাদের কাছে মূল ক্ষমতা তাদেরকে আটক, গ্রেপ্তার, এবং বল প্রয়োগ করতে বাধা দেয়া হয়। এসব বিধি-নিষেধের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আইন প্রয়োগকারী কর্তৃক বেসামরিক নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর নজরদারি করা এবং ওয়ারেন্ট ছাড়াই তাদের ব্যক্তিগত তথ্য দখল করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এর মধ্যে আমেরিকার বিপুল সংখ্যক রাস্তা এবং ফুটপাত রয়েছে।

জনগণের সম্পত্তিতে নজরদারি ক্যামেরার ব্যবহার করা হয় অপরাধ সনাক্তকরণের জন্য। যাতে তদন্তকারীরা সাহায্য পেতে পারে। কিন্তু এগুলোর মূল্য কমার সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী আইনপ্রণয়নকারী সংস্থাগুলো এগুলোকে যথেচ্ছা ব্যবহার করতে লাগল। সেই মানুষদেরকেও ট্র্যাক করতে লাগল যারা অপরাধ করেনি ও সন্দেহভাজন নয়। আরো বড় বিপদ আসে চেহারা এবং নমুনা সনাক্তকরণ সিস্টেম তৈরির সাথে। এগুলো অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পুলিশের মতো যা, সন্দেহজনক কাজকর্ম সনাক্ত করে। যেমন ড্রাগ ডিলিং সনাক্ত করা (কেউ হয়তো কারো সাথে হাত মিলাচ্ছে)। বিভিন্ন দল সনাক্ত করা (নির্দিষ্ট রং বা ব্রান্ডের পোশাক পরিহিত লোকজন)। প্রযুক্তি আমাদেরকে এমন পথে পরিচালিত করছিল যা নিয়ে কোনো গণবিতর্ক নেই। সম্ভাব্য নজরদারির অপব্যবহার আমার সামনে নিকট ভবিষ্যতের ছবি ফুটিয়ে তুলল। এমন এক পৃথিবী গড়ে উঠছিল যেখানে কম্পিউটার আইন প্রয়োগকারী হয়ে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম আমেরিকার শপথের কথা–আইনের চোখে সবাই সমান। কত অদ্ভুতভাবে স্বয়ংক্রিয় আইন প্রয়োগ ব্যবস্থার কারণে নির্যাতনের ক্ষেত্রে সবাই সমান হয়ে যাবে।

আমি আমার রান্নাঘরে একটি স্মার্টফ্রিজের কথা ভাবলাম। আমার সব কাজ, অভ্যাস এটি নজরে রাখছে। আমি হাত না ধুয়ে আসলে কিংবা আমার আরো বদঅভ্যাসের কারণে এটি আমাকে বর্বর ভাববে।

এরকম একটি বিশ্ব এক সময় অসহনীয় হয়ে যাবে যেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইন প্রয়োগ হয়। তীব্রভাবে ন্যায় করতে গিয়ে তীব্র অন্যায় হয়ে যাবে। শুধু আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে শাস্তির তীব্রতার কারণে নয়। বরং কতটুকু দৃঢ়তার ও ব্যাপকভাবে সেই আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে তার ওপর এটি নির্ভর করে। প্রায় সব সমাজেরই অলিখিত আইন আছে যা অনুসরণ করতে হয়। লাইব্রেরিতে কত বিশাল লিখিত নিয়ম থাকে এসব কেউ তেমন পালনও করে না আর মনেও রাখে না। ম্যারিল্যান্ড অপরাধ আইন সেকশন ১০-৫০১ অনুযায়ী ব্যভিচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এর জন্য ১০ ডলার ফাইন দিতে হবে। নর্থ ক্যারোলিনার সংবিধি ১৪-৩০৯.৮ অনুযায়ী পাঁচ ঘণ্টার বেশি বিংগো গেম খেলা অপরাধ। আমাদের জীবনে আমরা প্রায়ই আবর্জনা ঠিকভাবে ফেলি না, সাইকেল ভুল লেনে চালিত করি, একটি বই ডাউনলোড করতে অপরিচিত ব্যক্তির Wi-Fi ব্যবহার করি। সহজ কথায় বলতে গেলে, এমন একটি পৃথিবী যদি হয় যেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে আইন সর্বদা প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সেই পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকেই অপরাধী।

আমি লিন্ডসিকে খুব কথা বলার চেষ্টা করেছি। যদিও সে আমার উদ্বেগের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, কিন্তু এতটা সহানুভূতিশীল নয় যে সে ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম বাদ দিতেও প্রস্তুত হবে।

সে বলল, 'আমি যদি এমন করি তাহলে, আমার আর্ট ছেড়ে দিতে হবে এবং আমার বন্ধুদের সাথেও যোগাযোগ ছেড়ে দিতে হবে। তুমি তো আগে মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখতে পছন্দ করতে।'

সে সঠিক ছিল। সে আমাকে নিয়ে চিন্তিত ছিল। সে ভাবছিল আমি হয়তো খুব স্ট্রেসে আছি। আমি কাজের কারণে স্ট্রেসে ছিলাম না। বরং তাকে সত্য না বলতে পারার কারণে ছিলাম। আমি তাকে বলতে পারছিলাম না, এনএসএ'তে আমার সহকর্মীরা তার আমাকে পাঠানো ভালোবাসাপূর্ণ মেসেজ পড়ছে। তাকে বলতে পারছিলাম না তারা শুধু ওর পাবলিক ছবিতেই প্রবেশ করছে না বরং একান্ত গোপনীয় ছবিতেও প্রবেশ করছে। আমি বলতে পারছিলাম না সবার তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

এটি ছিল সরকারের হুমকির মতো। তুমি যদি সীমালঙ্ঘন করো তাহলে আমরা তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করব। আমি তাকে উপমা দিয়ে বোঝাতে চাইলাম। বললাম কল্পনা করো যে, তুমি ল্যাপটপ খুলে তার ডেস্কটপে স্প্রেডশিট পেয়েছ।

'কেন? আমি স্প্রেডশিট পছন্দ করি না।'

আমি তার এই উত্তর আশা করিনি। কিন্তু সাথে সাথেই বললাম, 'কেউই করে না। কিন্তু এটি হচ্ছে দ্য এন্ড।'

'ওহ, রহস্যজনক।'

'ধরো তোমার মনে নেই তুমি কবে এই স্প্রেডশিট তৈরি করেছ। কিন্তু এর বিষয়বস্তু তুমি জানো। এর মধ্যে যা আছে তা তোমাকে শেষ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

লিন্ডসি হেসে বলল, 'আমি কী তোমারটা দেখতে পারি।'

সে মজা করছিল কিন্তু আমি না। একটি স্প্রেডশিটে আপনার ব্যাপারে সব তথ্য থাকে। যা আপনার সংসার, চাকরি, সম্পর্ক সব শেষ করে দিতে পারে। আপনাকে বন্ধু-বান্ধবহীন ও একা করে দিতে পারে বা জেলে নিয়ে ফেলতে পারে। হয়তো আপনি এক সপ্তাহ আগে বন্ধুর বাসায় সিগারেট খেয়েছেন বা কলেজ লাইফে কোকেন খেয়েছিলেন। কিংবা আপনার বন্ধুর গার্লফ্রেন্ডের সাথে মাতাল হয়ে অবৈধ সম্পর্ক করেছিলেন। যে এখন আপনার বন্ধুর স্ত্রী। আপনারা দুজনই হয়তো এখন অপরাধবোধ করছেন। যেটা আপনারা কাউকে জানাননি। কিংবা আপনি কৈশোরকালে এবরশন করেছিলেন। আপনার বাবা-মা ও আপনার স্বামী থেকে তা লুকিয়ে রেখেছেন। হয়তো কোনো পিটিশন সাইন করেছিলেন বা কোনো আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

সবারই কোনো না কোনো গোপন তথ্য থাকে যা লুক্কায়িত থাকে ফাইলে নয়তো ইমেইলে, ইমেইলে না হলে ব্রাউজিং হিস্ট্রিতে। আর এখন সেসব তথ্য আছে আমেরিকান সরকারের কাছে।

আমাদের কথাবার্তার পর লিন্ডসি আমার কাছে এসে বলল, 'আমি জানি আমার ব্যাপারে স্প্রেডশিটে কী থাকতে পারে যা আমাকে শেষ করে দিতে পারে।'

কী? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বলব না।'

ওর উত্তরে আমি খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুদিন পর অদ্ভূত আচরণ করতে শুরু করি। দেখা যেত সিড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছি, বা দরজার সাথে আঘাত পাচ্ছি, বা হাত থেকে চামচ পরে যাচ্ছে, পানি খেতে গিয়ে নিজের উপর ফেলে দিচ্ছি। মাঝেমধ্যে লিন্ডসি আমাকে কিছু হয়তো বলছে কিন্তু আমি তা শুনতাম না। হয়তো জিজ্ঞেস করছে আমি কোথায় গিয়েছি কিন্তু আমি তখন অন্য জগতে হারিয়ে গিয়েছি।

একদিন লিন্ডসির ফিটনেস ক্লাসের পর তার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমার মাথা হুট করে ঝিমঝিম করতে শুরু করল। আমি ও লিন্ডসি দুজনই ভয় পেলাম। বিষয়টা আমার মানসিকতায় খুব প্রভাব বিস্তার করে। আমি এসবের পেছনে নিজস্ব যুক্তি দাড় করালাম। সিড়ি পিচ্ছিল ছিল তাই পড়ে গিয়েছি, ঘুম কম, দুর্বল ডায়েট, এক্সারসাইজ কম ইত্যাদি। আমার সাথে যা

হচ্ছিল তা স্বাভাবিক ছিল না, মনো দৈহিক ছিল। ডাক্তারের অ্যাপোয়েন্টমেন্ট নিতে চাইলাম কিন্তু তা কয়েক সপ্তাহের আগে সম্ভব নয়।

এক বা কিছুদিন পর আমি ডেলের এক সিকিউরিটি অফিসারের সাথে ফোনে কথা বলছিলাম। হঠাৎ আমার মাথা ঝিম করে উঠল। আমি ফোন রেখে দিলাম। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি মরে যাব। এতো অকস্মাৎ এটি আক্রমণ করে যে অসহায়ত্ব ছাড়া আর কোনো অনুভূতি কাজ করে না। আমি ঠাস করে চেয়ারে বসলাম। তারপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম।

ঘড়িতে তখন ১টা বাজে। আমার জ্ঞান ফিরল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি সজাগ ছিলাম। ফোনের কাছে গেলাম কিন্তু সেটা ধরতে পারছিলাম না। যখন ধরতে পারলাম তখন লিন্ডসির নাম্বার মনে করতে পারছিলাম না। খুব ধীরে দেয়ালে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসি।

ফ্রিজ থেকে বের করে জুস খেলাম। তারপর মাটিতেই ঘুমিয়ে থাকলাম। লিন্ডসি এসে আমাকে এভাবেই খুঁজে পেল। আমারটা এপিলেপ্টিক সিজার হয়েছিল। আমার মায়েরও এই রোগটা ছিল। আমি আমার মায়েরটার সাথে আমার সিম্পটম কখনো মিলাইনি। মা আমাকে আর বোনকে বলতেন এটা বংশগত না। আমি জানি না এটা তার ডাক্তার তাকে বলেছিল, নাকি তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করছিলেন যাতে তার ভাগ্য আমাদের না হয়। এপিলেপ্সির মেডিকেল চিকিৎসা নেই। ঔষধ খুব কম কাজ করে। ডাক্তাররা এপিলেপ্সির কথা বলেন না। তারা সিজারের কথা বলেন। লোকালাইজড আর জেনেরালাইজড। প্রথমটা ব্রেইনের নির্দিষ্ট অংশে ইলেক্ট্রিক্যাল মিস ফায়ারের মতো। এটি ছড়িয়ে পড়ে না। পরেরটা ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ধারাবাহিকভাবে এ মিস্ফায়ার ব্রেইনে ঘুরতে থাকে। ব্রেইনের মোটর ফাংশনকে হারিয়ে মানুষ পরিণামে অজ্ঞান হয়ে যায়। এপিলেপ্সির উপসর্গ খুব আজব। এটি নির্ভর করে ব্রেইনের কোন অংশে ইলেক্ট্রিক্যাল বিচ্ছুরণ ঘটছে। যারা এর ভুক্তভোগী তারা শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে, চোখে অন্ধকার দেখে ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

আমার ব্রেইনের গভীরে হয়েছিল। সেটা ভার্টিগো তৈরি করতে পারে। এর ওয়ার্নিং সাইনকে বলে 'AURAS'। আমি অনেক এপিলেপ্সি ডাক্তারের সাথে কথা বললাম। ডেলের কর্মকর্তা হবার কারণে চিকিৎসা ইন্সুরেন্স পেলাম। CAT স্ক্যান, MRI করলাম। আমার সাহসী লিন্ডসি আমাকে অ্যাপোয়েন্টমেন্টে নিয়ে আসত, নিয়ে যেত। সে গুগল করে এর সিন্ড্রোম জানতে লাগল। হোমিও, এলোপ্যাথি সবরকম চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজ নিল। তার জিমেইল এসব ওষুধের বিজ্ঞাপনে ভরে গেল। আমার নিজেকে পরাজিত মনে হচ্ছিল। আমার দেশ ও ইন্টারনেট দুটোই বেইমানি করেছে। আমার শরীরও কাজ করছিল না। আর আমার ব্রেইনে শর্ট সার্কিট হচ্ছিল।

মনের চিকিৎসা

১ মে, ২০১১। আমার ফোনে একটি নিউজ এলার্ট এলো। তাতে লেখা ছিল- পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে নৌবাহিনীর বিশেষ ফোর্স 'SEAL' এর হাতে ওসামা বিন লাদেন আটক ও নিহত।

আমেরিকায় সন্ত্রাসী আক্রমণের মূল পরিকল্পনাকারী এই ব্যক্তির কারণেই আমি সেনাবাহিনীতে যোগদানে উৎসাহী হয়েছিলাম। তারপর সেখানে থেকে একেবারে গোয়েন্দা বিভাগে। পাকিস্তানের প্রধান সেনা একাডেমির পাশে নিজ বাসগৃহে ডায়ালাইসিসের রোগী এই ব্যক্তিটিকে হত্যা করা হয়েছে. একেবারে সামনে থেকে হত্যা করা হয়েছে তাকে। বিভিন্ন সাইটের মানচিত্রে অ্যাবোটাবাদের অবস্থান দেখাচ্ছিল। আর দেখাচ্ছিল নিউইয়র্ক সহ গোটা আমেরিকার মানুষের উল্লাস।

আমি ফোন বন্ধ করে দিলাম। আপনারা আবার ভুল বুঝবেন না। আমি সেই হতভাগার মৃত্যুতে খুব খুশি হয়েছিলাম। দশ বছর আগের স্মৃতিচারণা করে আমার মনে বিষন্নতা ছেয়ে গেল।

দশ বছর। টুইন টাওয়ার হামলার দশ বছর হয়ে গেছে। এই সময়টুকুতে আমরা কী অর্জন করেছি?

আমার মায়ের কন্ডোমিনিয়াম থেকে নিয়ে আসা চেয়ারের উপর বসে জানালার বাইরে চোখ রাখলাম। একজন প্রতিবেশী তার পার্কিং-এ রাখা গাড়িটার হর্ন বাজাচ্ছিল। আমার জীবনের এই দশকটা আমি শুধু শুধু নষ্ট করেছি। এটা আমার মানতে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

বিগত এই দশকে আমেরিকা কতগুলো ট্রাজেডির জন্ম দিয়েছে। আফগানিস্তানের যুদ্ধ, ইরাকে আকস্মিক শাসনক্ষমতার পরিবর্তন, গুয়ান্তানামো বে'তে অসংখ্য আটককৃত মানুষ, সন্দেহভাজন আসামিকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় প্রেরণ, নির্যাতন, ড্রোন পাঠিয়ে সাধারণ জনগণের উপর, এমনকি আমেরিকান নাগরিকের ওপর টার্গেট কিলিং। জন্মভূমির নিরাপত্তা প্রতিদিন কোনো না কোনো নতুন হুমকির জন্ম দিচ্ছিল। স্বদেশপ্রেমের নামে সংঘটিত কার্যক্রম নাগরিক স্বাধীনতা বিঘ্নিত করছিল। যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমরা সংঘর্ষ করে যাচ্ছিলাম। অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি, বেআইনি কাজকর্মের মধ্যেও আমরা আশ্চর্যজনকভাবে আনন্দোৎসব করছিলাম। আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে আমেরিকার মাটিতে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হামলা ঘটে। অবশ্যই সন্ত্রাসবাদের কারণে নজরদারি কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। তবে মূল সন্ত্রাসবাদ ছিল আতঙ্ক। যার রচয়িতা ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এটি শক্তি প্রদর্শনকে

অনুমোদন করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি দেখাচ্ছিল। আমেরিকার রাজনীতিবিদরা সন্ত্রাসবাদকে এত ভয় পেত না যতটা তারা তাদের দলের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পেত। তারা ভয় পেত ক্যাম্পেইন ডোনারদের। বিভিন্ন প্রচারণায় অর্থ ঢেলে দেয়া এই দাতারা সরকারের বিভিন্ন চুক্তি ও মধ্যপ্রাচ্যের তেলের জন্য যথেষ্ট ক্ষুধার্ত ছিল।

সন্ত্রাসবাদের চেয়েও রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ বা Politics of Terror অধিক ক্ষমতাধর হয়ে গেল। এর ফল ছিল 'Counter Terror'। যেসব দেশ শক্তিতে অসমান, যাদের নিয়মনীতি দুর্বল ও যারা আইনের শাসন সম্পর্কে অজ্ঞ তারা আতংকে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করল।

৯/১১ পরে গোয়েন্দা সংস্থা এমন কোনো মিশন হাতে নেয়নি যা তারা সম্পূর্ণ করতে পারবে না। এক দশক পরে একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সন্ত্রাস দমনের আহ্বান কোনো হুমকির প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছিল না। এটা ছিল সন্ত্রাসবাদকে চিরস্থায়ী বিপদ হিসেবে রাখার প্রচেষ্টা। এটি তাদেরকে প্রশ্নাতীতভাবে ক্ষমতাশালী করবে।

এক দশক পর এটাই প্রমাণিত হলো যে, প্রযুক্তি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কোনো অস্ত্র হিসেবে নয় বরং এটি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। নজরদারি কার্যক্রমের মাধ্যমে ও প্রতিনিয়ত মিথ্যে বলে আমেরিকা খুব কমই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছিল। কিছুই অর্জন করতে পারেনি। হারিয়েছেই বরং বেশি। যতক্ষণ পর্যন্ত ৯/১১ পরবর্তী 'আমরা এবং তারা'- এই পার্থক্য বজায় থাকবে ততক্ষণ তা চলতে থাকবে।

***

২০১১ এর বাকি অর্ধেকটা আমার কেটেছে ডাক্তারের চেম্বারে ও হাসপাতালে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মেডিটেশনের ফলে শরীর ঠিক হচ্ছিল। কিন্তু মানসিক অস্থিরতার কারণে আমি কোনো কাজেই মন দিতে পারতাম না। ডেলে সিআইএ'র জন্য কাজ করা শীর্ষ প্রযুক্তিবিদ হিসেবে আমি বেশ সুবিধা ভোগ করতাম। বাসায় বসেই ফোনে কাজ করতে পারতাম। কিন্তু মিটিংগুলো হতো ভার্জিনিয়ায়। আর আমি থাকতাম ম্যারিল্যান্ড। ম্যারিল্যান্ডে এপিলেপ্সি আক্রান্ত রোগীদের গাড়ি চালনো আইনত নিষিদ্ধ ছিল। তাই আমি ধরা পড়লে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হতে পারে আর মিটিং-এ উপস্থিত হওয়াও সম্ভব হবে না। তাই আমি ডেল থেকে স্বল্পকালীন অক্ষমতাজনিত ছুটি নিলাম। আমার মায়ের সেকেন্ড হ্যান্ড কোচের সাথে সখ্যতা গড়ে তুললাম। এটা আমার জন্য বেশ আরামদায়ক ছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমি এখানেই ঘুমিয়েছি, খেয়েছি, আবার ঘুমিয়েছি। এটি আমার অস্তিত্বের সাথে জুড়ে গিয়েছিল। আমি কী কী বই পড়েছি মনে নেই। কিন্তু এক পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারতাম না। কোনো

কাজেই মন বসাতে পারতাম না। অন্ধকার রুমে মোবাইলের আলো ছাড়া আর কোনো আলোই ছিল না।

মোবাইলে স্ক্রল করতাম, তারপর ঘুমাতাম, আবার স্ক্রল করতাম। আর এদিকে তিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, ইয়েমেন, আলজেরিয়া, মরক্কো, ইরাক, লেবানন, সিরিয়াতে আন্দোলনকারীদের জেলে আটক করা হচ্ছিল, নির্যাতন করা হচ্ছিল। তাদেরকে রাস্তায় গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছিল। আর এ সবকিছুর পেছনে ছিল হিংস্র শাসকদের রাষ্ট্রীয় গুপ্তচররা। বেশিরভাগ শাসকদের ক্ষমতাসীন থাকার পেছনে ছিল আমেরিকার হাত।

মানুষ এর ভুক্তভোগী ছিল। তাদের মধ্যে ছিল হতাশা। এই হতাশার সামনে আমার হতাশা নিতান্তই তুচ্ছ। মধ্যপ্রাচ্যে নিরপরাধ নাগরিকরা সীমাহীন অত্যাচারের সাথে বাস করছিল। স্কুল, অফিস ছিল বন্ধ। বিদ্যুৎ ছিল না, পানি ছিল না। অনেক জায়গায় চিকিৎসা সেবা পর্যন্ত ছিল না।

আরব বসন্ত ও ইরানিয়ান গ্রিন মুভমেন্টে কায়রো, সানা, বৈরুত, দামেস্ক, আহভাজ, খুজেস্তানসহ আরো বিভিন্ন শহরে আন্দোলনকারীরা অত্যাচারী শাসকদের অবসান চাচ্ছিল। তারা চাচ্ছিল এমন সমাজ যেখানে জনগণ সরকারের নিকট জবাবদিহি করবে না। সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে।

সবার চাওয়া ছিল স্বৈরশাসনের অবসান। তারা চাচ্ছিল মানুষের জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি। স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রই অধিকারের উৎস ও রাষ্ট্রই মানুষের অধিকার স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু মুক্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ অধিকারের উৎস ও তারা রাষ্ট্রকে অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। প্রথমটিতে জনগণ হলো প্রজা। তারা সম্পদ ভোগ থেকে শুরু করে শিক্ষা, কর্ম, ধর্ম, কথা বলার অধিকার তখনই পায় যখন সরকার এর স্বীকৃতি দেয়। দ্বিতীয়টায় জনগণ হলো নাগরিক। তারা মতৈক্যের মাধ্যমে গড়া চুক্তির ভিত্তিতে সরকারকে তাদেরকে শাসন করার স্বীকৃতি দেয়। এই চুক্তি সাংবিধানিকভাবে বাতিলও হতে পারে আবার নির্দিষ্ট সময় পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

আমার সময়ে সবচেয়ে বড় আদর্শগত দ্বন্দ্ব হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র ও মুক্ত গণতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ক্রিশ্চিয়ান ও মুসলমানদের দ্বন্দ্ব নয়। স্বৈরতান্ত্রিক সরকার আইন দ্বারা পরিচালিত সরকার নয়। এ সরকার নেতাদের দ্বারা পরিচালিত। তার তাদের প্রজাদের থেকে আনুগত্য দাবি করে ও ভিন্নমত পোষণকারীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। অন্যদিকে মুক্ত গণতন্ত্র নির্ভর করে নাগরিকদের ওপর। নাগরিকরা যোগ্যতা, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে নিজেদের ও তাদের আশপাশের সবার স্বাধীনতা রক্ষা করবে। তারা সবার সম্মতির ভিত্তিতে সমষ্টিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। যদিও গণতন্ত্র মাঝেমধ্যে তার আদর্শ থেকে দূরে সরে যায়। তবুও এখানে বিভিন্ন পরিবেশের মানুষ একসাথে থাকতে পারে। এখানে আইনের চোখে সবাই সমান।

এ সমতার সাথে অধিকার ও স্বাধীনতা জড়িত। গণতন্ত্রে নাগরিকের অনেক অধিকারের অস্তিত্ব আছে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার কারণে। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় আমাদের বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে কারণ সরকার এতে হস্তক্ষেপ করে কোনো আইন প্রণয়ন করা নিষিদ্ধ। আমাদের সভা করার স্বাধীনতা আছে কারণ একে নিষিদ্ধ করে কোনো আইন তৈরি করার ক্ষমতা সরকারের নেই।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এমনই একটি বিষয় যেখানে সরকার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করতে পারবে না। সবার ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য জানা সমর্থনযোগ্য নয়। যেভাবে মার্কিন সরকার গণনজরদারির মাধ্যমে সবার ব্যক্তিগত তথ্যে নজরদারি চালাচ্ছিল। যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনে নজরদারি চালানো যায়। গোপনীয়তা অবশ্যই সবার জীবনে গুরুত্ব বহন করে। প্রযুক্তিনির্ভর বহুত্ববাদী গণতন্ত্রে মানুষ তাদের গোপনীয়তাকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করে সেটাকে অধিকার হিসেবে রূপ দেয়। নিজের গোপনীয়তার অধিকার দাবি না করা মানে নিজেকে সংবিধান উপেক্ষাকারী সরকারের কাছে সমর্পণ করে দেয়া বা বেসরকারি ব্যবসার কাছে সমর্পণ করে দেয়া। তাই গোপনীয়তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। নিজের গোপনীয়তাকে সমর্পণ করে দেয়া মানে অন্যের গোপনীয়তাকেও সমর্পণ করে দেয়া।

আপনি হয়তো বলবেন গোপনীয়তা তারই দরকার যার লুকানোর কিছু আছে। আপনার গোপন রাখার কিছুই নেই বলে আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন কারোরই গোপনীয়তা দরকার নেই। এমনকি অভিবাসী স্ট্যাটাস, কাজ, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থাও গোপন করা দরকার নেই। আপনি বুঝাতে চাচ্ছেন আপনি বা কেউই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক সমর্থন, যৌন কার্যক্রম, পছন্দের মুভি-গান কোনো কিছুই লুকানো উচিত নয়। আপনার লুকানোর কিছুই নেই তাই গোপনীয়তা দরকার নেই এর মানে কী এই নয় যে, আপনার বাক-স্বাধীনতার দরকার নেই কারণ আপনার বলার কিছুই নেই, বা আপনার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দরকার নেই কারণ আপনি সংবাদপত্র পড়েন না। আপনার ধর্মীয় স্বাধীনতার দরকার নেই কারণ আপনি নাস্তিক বা আপনি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ পছন্দ করেন না কারণ আপনি ভিড় ভয় পান।

আজ আপনার কাছে এই স্বাধীনতার মূল্য নেই এর মানে এই না যে, কাল আপনার বা আপনার প্রতিবেশী বা বাকিদের কাছে কিংবা সেই লোকদের কাছে যাদেরকে আমি ফোনের স্ক্রিনে আন্দোলন করতে দেখছিলাম তাদের কাছে স্বাধীনতার মূল্য থাকবে না।

আমি তাদের সাহায্য করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু পারছিলাম না। আমার খুব অসহায়ত্ব বোধ হচ্ছিল। আমি চেয়ারে বসে ঠান্ডা রেঞ্চ ডরিটো খাচ্ছি আর ডায়েট কোক পান করছি। আর এদিকে পৃথিবী দাউদাউ করে জ্বলছে।

মধ্যপ্রাচ্যের মানুষেরা দ্রব্যমূল্য কমানো, অবসর ভাতা বৃদ্ধি, অধিক বেতনের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছিল। তারা আরেকটা বিষয়ে আন্দোলন করছিল, সেটা হলো ইন্টারনেট। ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনী বিভিন্ন হুমকিযুক্ত ওয়েব কন্টেন্ট ব্লক করছিল। অনলাইনে বিভিন্ন প্লাটফর্ম ও সার্ভিস বন্ধ করছিল। আর কিছু বিদেশি আইএসপি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। মিশরে হুসনি মোবারক সারা দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে রাস্তায় নেমে আসে।

জেনেভায় টর প্রজেক্টের সাথে পরিচিত হবার পর এই ব্রাউজার ব্যবহার করে আমি আমার নিজের টর সার্ভার পরিচালনা করি। আমি চাইতাম বাসায় বসেই আমি পেশাগত কাজ করি ও আমার ব্যক্তিগত ওয়েব ব্রাউজিং যাতে সবার অলক্ষ্যে থাকে। আমি হতাশা বাদ দিয়ে আমার বাসার অফিসে গিয়ে একটি সংযোগ তৈরি করলাম। এটি ইরানের ইন্টারনেট অবরোধ উপেক্ষা করবে। তারপর এটির সাংকেতিক কনফিগারেশন টরের মূল ডেভেলাপারদের কাছে বিতরণ করে দিলাম। আমি এতটুকুই করতে পারলাম। যদি একটি বাচ্চাও ফিল্টার এবং সব বাধা উপেক্ষা করে টর সিস্টেমের নিরাপত্তার মাধ্যমে ও আমার টর সার্ভারের পরিচয়হীনতার জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করে, আমার মাধ্যমে যোগাযোগ করে তাহলে এটাই আমার সার্থকতা। আমি কল্পনা করছিলাম কেউ ইমেইল চেক করছে বা স্যোশাল সাইটে গিয়ে তাদের পরিবারের কেউ গ্রেপ্তার হলো কি না তা জানছে। আমার এটা জানার কোনো উপায় ছিল না কেউ এরকম করেছে কি না বা কেউ ইরান থেকে আমার সার্ভারে সংযোগ দিয়েছে কিনা। এটাই ছিল আমার পয়েন্ট। আমি যে সহায়তা পাঠিয়েছি তা ছিল একান্ত গোপনীয়।

আরব বসন্তের শুরু যে ব্যক্তির হাত ধরে সে প্রায় আমারই বয়সি একজন ফল ও সবজি বিক্রেতা। কর্তৃপক্ষের দ্বারা বারবার হয়রানি ও চাঁদাবাজির শিকার হয়ে সে প্রতিবাদ করে স্কয়ারে দাঁড়ায় ও নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে শহিদ হয়। যদি নিজেকে পুড়িয়ে মারা বেআইনি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শেষ উপায় হয় তাহলে আমিও চেয়ার থেকে উঠে কিছু বাটনে ক্লিক করতেই পারি।

৩য় অধ্যায়

সুড়ঙ্গ

মনে করুন, আপনি একটি সুড়ঙ্গতে প্রবেশ করছেন। দীর্ঘ সুড়ঙ্গে আপনার দৃষ্টিসীমা যতদূর যায় দেখবেন সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে আলোর বিন্দুর মতো দেখা যায়। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তের এই আলো যেন আশার আলো। যারা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে আসে তারা এরকম সুড়ঙ্গে হারিয়ে যাবার কথা বলে। তারা এই আলো অনুসরণ করে এই পথ ধরে হাঁটতে থাকে।

আমি যে সুড়ঙ্গের কথা বলছি সেটি পার্ল হারবারের সময়কালের একটি বিমান কারখানা ছিল। এটির অবস্থান হাওয়াইয়ের ওয়াহু দ্বীপপুঞ্জের কুনিয়াতে একটি আনারস বাগানের নিচে। পরবর্তীতে এটি এনএসএ'র ফ্যাসিলিটিতে পরিণত হয়। এটি একটি পাহাড়ের পাদদেশে কংক্রিটের তৈরি এক কিলোমিটার লম্বা ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের তিনটি গুহার মতো কক্ষে এনএসএ'র সার্ভার ভল্ট ও অফিস। সুড়ঙ্গটি তৈরি করার সময় পাহাড়টির বালি, মাটি ও শুষ্ক আনারস পাতা এবং ঘাস দিয়ে সুড়ঙ্গটিকে জাপানিজ বোমারুদের থেকে লুকিয়ে রাখা হতো। এখন ষাট বছর পর এই জায়গাটা অনেকটা হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার সমাধিক্ষেত্র মনে হয়। এর অফিসিয়াল নাম হলো "কুনিয়া রিজিওনাল সিকিউরিটি অপারেশনস সেন্টার"। আমি ২০১২-তে এনএসএ'র হয়ে ডেলের সাথে চুক্তিতে সেখানে কাজ করতে যাই।

এক গ্রীষ্মে, আমার জন্মদিনে আমি সিকিউরিটি চেক পেরিয়ে সুড়ঙ্গের নিচে যাচ্ছিলাম আমি তখন থমকে গেলাম। আমার সামনে ছিল আমার ভবিষ্যৎ। আমি হুটহাটভাবে জীবনের কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি। জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এভাবে নেয়া হয় না। সিদ্ধান্তগুলো অবচেতনভাবে নেয়া হয়। তা বাস্তবায়ন হবার পরই প্রকাশ হয়। আপনি তখন শক্তভাবে স্বীকার করেন যে, ভাগ্য এটিই আপনার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছে। আমার নিজের উনত্রিশতম জন্মদিনে এটি ছিল আমার নিজেকে দেয়া উপহার। আমি বুঝতে পারলাম আমি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছি। এই সুড়ঙ্গ আমার জীবনকে সংকীর্ণ, দিশেহারা করে দিবে।

ঐতিহাসিকভাবে হাওয়াই মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সেনাবাহিনীর নৌযান ও বিমানে জ্বালানি সরবরাহকেন্দ্র ছাড়াও মার্কিন গোয়েন্দা যোগাযোগের সুইচপয়েন্ট হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। এখান থেকে আমেরিকার ৪৮টি প্রদেশ, জাপান ও এশিয়ার আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলের গোয়েন্দা তথ্য প্রবাহিত হতো। আমি এখানে যে পদে ছিলাম তা ছিল আমার ক্যারিয়ার সিড়ির এক ধাপ নিচের অবস্থান। কাজের চাপ কম ছিল। ইনফরমেশন শেয়ারিং অফিসের আমি

প্রধান কর্মী ছিলাম। আমি ছিলাম SharePoint এর সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেট। SharePoint হলো মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট। এটি অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্ট পরিচালনা করে। হাওয়াইয়ের SharePoint সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদের মাধ্যমে এনএসএ আমাকে ডকুমেন্ট পরিচালক বানিয়ে দিল।

আমি মূলত সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাসিলিটির চিফ রিডার ছিলাম। প্রথমদিকে স্ক্রিপ্ট লিখে আমার কাজকে সহজ ও স্বয়ংক্রিয় করার চেষ্টা করলাম যাতে খুব অভিনব কাজ করার জন্য অবসর সময় পেতে পারি। ২০০৯ এ টোকিওতে এনএসএ'র যেসব অপকর্ম সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল তা নিশ্চিতভাবে জানার জন্য আমি ভালো করে ডকুমেন্টগুলো পড়তে লাগলাম। তিন বছর পর, নিজেকে সংকল্প করলাম আমেরিকার গণনজরদারির কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা আর থাকলেও তা কীভাবে কাজ করে তা জানতে হবে।

***

আমি আর লিন্ডসি অবশ্য এজন্য হাওয়াই আসিনি। আমরা নতুনভাবে জীবনটাকে শুরু করতে এসেছিলাম। ডাক্তার বলেছিলেন হাওয়াইয়ের আবহাওয়া ও জীবনযাত্রা আমার এপিলেপ্সি ভালো হবার জন্য উপকারী হবে। তাছাড়া হাওয়াইয়ের শুষ্ক, শান্ত কুনিয়া অঞ্চলের অল্পসংখ্যক লোকালয় থেকে সুড়ঙ্গতে বাইসাইকেল দিয়ে যাওয়া যেত। এটি আমার ড্রাইভিং সমস্যা সমাধান করে দিল।

শান্ত আখক্ষেতের পথ ধরে সূর্যোদয় দেখে সাইকেল চালিয়ে কাজে যেতাম। যেতে বিশ মিনিট সময় লাগত। আমার এই কয়েক মাসের মানসিক হতাশা এই সুউচ্চ পাহাড় আর নীল আকাশের মিতালীর মধ্যে হারিয়ে গেল।

ওয়াইপাহুর রয়্যাল কুনিয়ার এলেউ স্ট্রিটে আমি আর লিন্ডসি একটি সুন্দর বাংলো পেলাম। ম্যারিল্যান্ডের বাসার সব ফার্নিচার দিয়ে বাসাটি সাজালাম। ডেলই এসব পুনঃস্থাপনের খরচ বহন করেছে। ফার্নিচারগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়নি। কারণ সূর্যের উত্তাপে আমরা দরজার সামনে এয়ার কন্ডিশনারের নিচে কার্পেটে কাপড় খুলে শুয়ে থাকতাম। লিন্ডসি গ্যারেজকে ওর ফিটনেস স্টুডিও বানিয়ে ফেলল। সেটা কলম্বিয়া থেকে নিয়ে আসা ইয়োগা ম্যাট ও স্পাইনিং পল দিয়ে সাজাল।

আমি একটি নতুন টর সার্ভার স্থাপন করলাম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট জ্যামের কারণে আমার ইন্টারনেট অ্যাক্টিভিটি লুকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল। যে রাতে আমার উনত্রিশ বছর হয় সেই রাতে লিন্ডসি আমাকে তার সাথে লুয়াউ এ যেতে বলল। এটি হাওয়াই এর একটি অনুষ্ঠান। তার কিছু ফিটনেস বন্ধুরা হুলা নৃত্য জানত।

হাওয়াইয়ের সংস্কৃতি প্রাচীন ও জীবিত। শেষ পর্যন্ত আমি লিন্ডসির কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। ওখানে গিয়ে ভালোই করেছি। লুয়াউ আমার খুব ভালো

লাগলো। একজন স্থানীয় হাওয়াইয়ান জ্ঞানী বৃদ্ধ খুব সুন্দর কণ্ঠে হাওয়াইয়ের আদিবাসীদের উত্থানের গল্প বলে যাচ্ছিল।

একটি গল্প ছিল ঈশ্বরদের বারোটি দ্বীপ নিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের সুন্দর ও স্বচ্ছ, পবিত্র পানির দ্বীপকে তারা মানুষ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইল। কারণ মানুষ তা নষ্ট করে ফেলবে। এর মধ্যে তিনটি দ্বীপ ছিল–কানি উনা মকু, কাহিকি ও পালি উলি। যে দেবতাদের অধীনে এগুলো ছিল তারা তা লুকিয়ে রাখতে চাইল। যাতে এসবের সৌন্দর্যে মানুষ পাগল না হয়ে যায়। এটি লুকিয়ে রাখার জন্য তারা পরিকল্পনা করে দ্বীপগুলোকে তারা সাগরের রঙে মিশিয়ে দিবে, বা সাগরের নিচে ডুবিয়ে দিবে। শেষ পর্যন্ত তারা তা বাতাসে ভাসমান করে দেয়। বাতাসে ভাসমান হবার পর দ্বীপগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে বেড়াত।

আমি যা খুঁজছিলাম তা এই দ্বীপগুলো গল্পের মতো। শাসকরা যা গোপনে মানুষ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছিল। আমি জানতে চাচ্ছিলাম এনএসএ'র নজরদারি কার্যক্রম কী রকম ছিল। কতটুকু এর বিস্তার ছিল। কারা এতে অনুমোদন দিয়েছিল। কারা এটির ব্যাপারে জানত এবং টেকনিক্যালি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এটি কীভাবে কাজ করত।

যখনই আমার মনে হতো আমি কোনো 'দ্বীপ' খুঁজে পেয়েছি। তখনই কোনো না কোড নাম আসত যা আমি বুঝতামও না। কখনো দেখা যেত রিপোর্টের নিচে কোনো প্রোগ্রাম মেনশন করা আছে। আমি সেগুলোর অনুসরণ করে বিভিন্ন ডকুমেন্টে যেতাম কিন্তু কিছুই পেতাম না। আমি যা খুঁজছিলাম তা আমার থেকে দূরে হারিয়ে যাচ্ছিল বা ভেসে যাচ্ছিল। তারপর দিন, মাস যাওয়ার পরে সেটা অন্য ডিপার্টমেন্টের অন্য কোনো ডকুমেন্টে ভেসে উঠত। মাঝেমাঝে আমি পরিচিত নামের কোনো প্রোগ্রাম খুঁজে পেতাম কিন্তু ব্যাখ্যা পেতাম না। আবার কখনো ব্যাখ্যা পেতাম কিন্তু নাম পেতাম না। এভাবে আমি কম্পার্টমেন্ট থেকে কম্পার্টমেন্ট, প্রোগ্রাম থেকে প্রোগ্রাম ঘুরে বেড়াতাম। এটিই ছিল এনএসএ'র বৈশিষ্ট্য। এর বাম হাত জানত না ডান হাত কী করছে। তখন আমার দেখা এক ডকুমেন্টারির কথা মনে পড়ল। সেটি ছিল জিপিএস উদ্ভাবনের আগে নৌ চলাচলের জন্য মানচিত্র কীভাবে তৈরি করা হতো এর উপর। নাবিকরা কোনো নোট বা লগ রেখে দিত। এগুলো মানচিত্র তৈরিকারকরা ব্যাখ্যা করত। শত বছর ধরে তথ্যের এরকম বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রশান্ত মহাসাগর চেনাজানা হয়ে গেল এবং এর দ্বীপগুলো সনাক্ত করা হলো।

কিন্তু আমার কাছে শত শত বছর বা শত শত জাহাজ ছিল না। আমি ছিলাম একা। যে নীল সাগরে এক খন্ড শুকনো ভূমি পেতে সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। আমি চাচ্ছিলাম একটি তথ্য যা ছিল সবার সাথে সম্পর্কিত।

হার্টবিট

২০০৯ এ জাপানে থাকাকালীন চায়নাকে নিয়ে যে কনফারেন্সে বক্তা হিসেবে যাই, সেখানে আমার বেশ কজন বন্ধু হয়।

তারা ছিলেন বিশেষ করে Joint Counter Intelligence Training Academy (JCITA) ও এর মাতৃসংস্থা Defense Intelligence Agency থেকে। JCITA আমাকে DIA-তে বেশ কটি সেমিনার ও লেকচারে আমন্ত্রণ জানায়। আমেরিকান গোয়েন্দা এজেন্সি চায়নিজ হ্যাকারদের থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করবে, কীভাবে তাদের হ্যাককৃত তথ্য নষ্ট করে পাল্টা হ্যাক করবে এসবের উপর ক্লাস নিতাম। ক্লাস করাতে খুব মজা পেতাম। বরাবরই আমি এমন একটা অবস্থানের আশা করতাম যেখানে আমার আদর্শের সাথে সমঝোতা করতে হবে না। JCITA এই পথ খুলে দেয়। তাছাড়া আপনি যখন শিক্ষাদান করবেন তখন আপনাকে আপডেট থাকতে হবে। বিশেষ করে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আপনার শিক্ষার্থীরা যাতে আপনার আগে না যায়।

আমাকে প্রতিদিন এনএসএ'র 'Readboards' পড়তে হতো। এগুলো হল ডিজিটাল বুলেটিন। অনেকটা নিউজ ব্লগের মতো। এনএসএ'র প্রতিটা সাইট নিজেদের ব্লগ পরিচালনা করত। প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ সব ডকুমেন্ট ও সংবাদ আপডেট করা হতো। হাওয়াই'তে আমার বিরক্তিকর সময়টায় নিজের সাইটের রিডবোর্ডের সাথে টোকিও ও ফোর্টমিডের রিডবোর্ডগুলো পড়তাম। এই চাকরিতে চাপ কম থাকায় যত সময় ইচ্ছে পড়ালেখা করা যেত। আমি ছিলাম ইনফরমেশন শেয়ারিং অফিসের একমাত্র কর্মী। তাই আমার কাজ ছিল শেয়ার করার মতো কোনো ইনফরমেশন আছে কি না দেখা। তখন বিরতির সময় সুড়ঙ্গে আমার অন্যান্য কলিগরা ফক্স নিউজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত।

আমার ব্যক্তিগত রিডবোর্ডে বিভিন্ন রিডবোর্ড থেকে ডকুমেন্ট এনে জমা করে রাখতাম। এতে এখানে ফাইলের স্তূপ হয়ে গেল। ডিজিটাল স্টোরেজের দায়িত্বে থাকা মহিলা আমার ফোল্ডার সাইজ নিয়ে অভিযোগ করলেন। বুঝতে পারলাম আমার পার্সোনাল রিডবোর্ড সংবেদনশীল ডকুমেন্টের আর্কাইভ হয়ে গেছে। এটাকে ডিলিট করা বা এটাতে আর কিছু অ্যাড না করে আমি সবার সাথে শেয়ার করতে শুরু করলাম। আমার বসের অনুমতি নিয়ে অটোমেটেড রিডবোর্ড তৈরি করি। এটা কারো পোস্ট করার অপেক্ষায় থাকত না. নিজে নিজেই এডিট হতো।

EPICSHELTER-এর মতো এটি নাম নতুন ও বিশেষ ডকুমেন্টকে স্ক্যান করত। এটি এনএসএ নেটওয়ার্ক ছাড়াও সিআইএ ও এফবিআই এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের টপ সিক্রেট 'ইন্ট্রানেট' Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS) এর নেটওয়ার্কের সাথে পিয়ারিং

করত। এনএসএ'র অফিসাররা তাদের ডিজিটাল আইডেন্টিটি ব্যাজ বা যেটাকে বলে PKI সার্টিফিকেট, এটা ব্যবহার করে নিজের রিডবোর্ড তৈরি করত, নিজেদের অফিসের কার্জবিবরণ, ডকুমেন্টের শ্রেণিবিভাগ করতে পারত। অর্থাৎ এটি হলো রিডবোর্ডের রিডবোর্ড। সব অফিসারের নিউজফিডকে এটি সংযোগ করবে। এতে প্রত্যেক অফিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত খবরাখবর প্রকাশ হবে।

এটিকে পরিচালনাকারী সার্ভার অবস্থিত ছিল আমার হলের নিচে। এই সার্ভার আমি পরিচালনা করতাম। এই সার্ভার প্রত্যেক ডকুমেন্টের একটা কপি সংরক্ষণ করত। এতে বিভিন্ন সংস্থার সার্চ সম্পাদনা করতে পারতাম। এটি অনেক এজেন্সির প্রধানগণ শুধু কল্পনাই করতে পারত। আমি এই সিস্টেমকে বলতাম হার্টবিট। কারণ এটি এনএসএ ও বৃহত্তর আইসি'র পালসের মতো ছিল। প্রচুর পরিমাণ তথ্য এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিংয়ের কার্যবিবরণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাইটের সাংকেতিক গবেষণা প্রজেক্ট, বিশেষ খবরের আপডেট এতে প্রকাশিত হতো। আমি এটি এমনভাবে তৈরি করেছিলাম যাতে এটি হাওয়াই থেকে ফোর্ট মিডের মধ্যে সাগরের নিচ দিয়ে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ওপর আধিপত্য বিস্তার না করে। কিন্তু হার্টবিট যে পরিমাণ ডকুমেন্ট সংগ্রহ করেছে তা কোনো মানুষও করতে পারবে না। এটি NSAnet-এর সবচেয়ে বড় রিডবোর্ড হয়ে গেল

এর শুরুর দিকে আমি একটি ইমেইল পাই। এ কারণে হার্টবিট প্রায় বন্ধ হবার অবস্থা হয়। সম্পূর্ণ আইসির সেই একজন মাত্র কর্মকর্তাই জানতে চেয়েছিলেন তার ডাটাবেজের সব তথ্য হাওয়াইয়ের একটি সিস্টেম কেন কপি করে যাচ্ছে। তিনি আমাকে সাথে সাথে ব্লক করে দিয়ে কারণ জানতে চাইলেন। তাকে সব বুঝিয়ে বলার পর তিনি বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি একজন ব্যক্তিকে সন্দেহ করলেও মেশিনকে সন্দেহ করলেন না। বেশ অভিভূত হয়ে আমাকে তার তথ্যভাণ্ডার থেকে আনব্লক করলেন। তিনি হার্টবিট থেকে তার কলিগদের কাছে তথ্য সরবরাহের ব্যাপারেও আমাকে সাহায্য করার কথা জানান।

আমি সাংবাদিকদের কাছে যেসব তথ্যফাঁস করেছিলাম তার বেশিরভাগই পেয়েছিলাম হার্টবিট থেকে। এটি আমাকে আমেরিকান নজরদারি ব্যবস্থার ক্ষমতা জানতে সাহায্য করে। ২০১২ এর মাঝামাঝি সময়ে কীভাবে গণনজরদারি ব্যবস্থা কাজ করে এটি জানতে চাইলাম।

পরবর্তীতে সাংবাদিকেরা এ বিষয়ে যেসব রিপোর্ট করত তার বেশিরভাগই ছিল গণনজরদারির টার্গেটদের নিয়ে। এ টার্গেটরা ছিল আমেরিকান নাগরিক বা আমেরিকার বন্ধুদেশের নেতারা। সাংবাদিকরা নজরদারির মূল উৎসের চেয়ে এর টার্গেট নিয়ে আগ্রহী ছিল। আমি তাদের আগ্রহের সম্মান করি। আমি নিজেই তা শেয়ার করেছিলাম।

কিন্তু আমার মূল কৌতূহল ছিল টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে। একটি প্রোগ্রামের চেয়ে এর কলাকৌশল নিয়ে জানলে আপনি এর অপব্যবহারের সম্ভাব্য সুযোগ আছে কিনা তা জানতে পারবেন। আমার ফাঁসকৃত ফাইলের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো ২০১১ এর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। এতে ছয়টি প্রোটোকলের প্রেক্ষিতে এনএসএ'র নতুন নজরদারি ব্যবস্থার হালচাল উল্লেখ ছিল। এ ছয়টি হলো- "Sniff it All, Know it All, Collect it All, Process it All, Exploit it All, Partner it All"। এগুলো হলো মার্কেটিং শব্দ। এগুলো আমেরিকার বন্ধুরাষ্ট্র–অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ইউকে'কে আকৃষ্ট করার জন্য ছিল। এদেরকে আমেরিকা গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করত। এদেরকে একত্রে বলা হতো Five Eyes।

Sniff it All মানে তথ্য খোঁজ করা। Know it All মানে কিসের তথ্য তা জানা। Collect it All মানে তথ্য সংগ্রহ করা। Process it All মানে গোয়েন্দা কাজে ব্যবহারযোগ্য তথ্য বাছাই করা। Exploit it All মানে গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমে সংস্থার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কর। Partner it All মানে বন্ধুরাষ্ট্রের সাথে সেই তথ্য ভাগাভাগি করা। এ থেকে আমেরিকান গোয়েন্দা এজেন্সির উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অন্যান্য সরকারের সাথে তার গোপন আঁতাত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন প্রযুক্তিগতভাবে কতটুকু তা বুঝতে পারিনি।

একদিন FISA কোর্টের একটি নির্দেশ চোখে পড়ে। এতে একটি প্রাইভেট কোম্পানির কাস্টমারদের ব্যক্তিগত তথ্য তলব করা হয়েছিল। গণ আদালতে তা ইস্যু করা হলেও এর কন্টেন্ট, অস্তিত্ব সব ছিল টপ সিক্রেট। Patriot Act, section 215, "Business Record" নীতিমালা অনুযায়ী, ফিসা কোর্ট থেকে অনুমতি নিয়ে সরকার থার্ড পার্টি থেকে তথ্য নিয়ে বিদেশি গোয়েন্দা ও সন্ত্রাসী অনুসন্ধান করতে পারবে। কিন্তু গোপনে এনএসএ এই অনুমোদনকে বিজনেস রেকর্ড বা মেটাডাটা সংগ্রহ করতে ব্যবহার করছিল। এই মেটাডাটা প্রতিদিন আমেরিকান টেলিকম যেমন–Verizon ও AT&T থেকে রেকর্ড সংগ্রহ করত। আমেরিকান নাগরিকদের টেলিযোগাযোগে এভাবে আড়িপাতা অবশ্যই অসাংবিধানিক ছিল। FISA সংশোধনী আইন ৭০২ এর কারণে আইসি যেকোনো বিদেশি নাগরিক যাদের সাথে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার যোগসূত্র থাকতে পারে তাদেরকে টার্গেট করে নজরদারি করতে পারত। এদের মধ্যে ছিল সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সমাজকর্মী ও আরো অগণিত নিরপরাধ মানুষ।

এ আইনের মাধ্যমে এনএসএ তাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্টারনেট নজরদারি পদ্ধতিকে সমর্থন করত। এগুলো হলো PRISM প্রোগ্রাম ও প্রতিপক্ষের তথ্য সংগ্রহ। PRISM এর ব্যবহার করে এনএসএ Microsoft, Google, Yahoo!, facebook, Paltalk, YouTube, Skype, AOL, Apple

থেকে অডিও, ভিডিও চ্যাট, ইমেইল, ছবি, ওয়েব ব্রাউজিং কন্টেন্ট, সার্চ ইঞ্জিন ও ক্লাউডে সংরক্ষিত ডাটা নিয়মিত সংগ্রহ করত। এ কোম্পানিগুলো জেনেশুনে ষড়যন্ত্রকারীতে পরিণত হচ্ছিল। আপস্ট্রিম কালেকশন ছিল আরো আক্রমণাত্মক। এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতের ইন্টারনেট অবকাঠামো, বিভিন্ন সুইচ ও রাউটার স্যাটেলাইট এবং সাগরের নিচের ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া বৈশ্বিক ইন্টারনেট থেকে তথ্য আত্মসাৎ করা হতো। এনএসএ'র Special Source Operations Unit এসব সংগ্রহের ব্যাবস্থাপনা নিশ্চিত করত। এটি বিভিন্ন ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে গোপন ওয়ারটেপ স্থাপন করে। PRISM (ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহ), ও Upstream Collection (সরাসরি ইন্টারনেট অবকাঠামো থেকে তথ্য সংগ্রহ) এ দুটি বিশ্বের গোয়েন্দা কার্যক্রম উপযোগী তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করত। আমার পরবর্তী অনুসন্ধান ছিল কীভাবে তারা এই বিশাল সব তথ্যভান্ডার থেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তাদের দরকারি তথ্যকে বাছাই করত। কারণ এসব তথ্য থাকত ইঞ্জিনিয়ারিং ডায়াগ্রামে। কোনো প্রেজেন্টেশনে না। এটি খুঁজে বের করা ছিল খুব জরুরি। কারণ সিস্টেম নিয়ে কাজ করার সুবাদে আমি জানতাম এজেন্সিগুলো মাঝেমাঝে কোনো প্রযুক্তি উদ্ভাবনের আগেই তার ঘোষণা দিত।

এ ক্ষেত্রে Upstream কালেকশনের প্রযুক্তির অস্তিত্ব ছিল। আর এগুলো ছিল এনএসএ'র গণনজরদারি ব্যবস্থার সবচেয়ে আক্রমণাত্মক উপাদান।

মনে করুন, আপনি কম্পিউটারের সামনে বসে একটি ওয়েবসাইটে যেতে চান। আপনি ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে URL এ টাইপ করলেন ও Enter চাপলেন। URL হলো একটি রিকুয়েস্ট আর এই রিকুয়েস্টটি তার ডেস্টিনেশন সার্ভারকে সার্চ করে। তার এই যাত্রার মাঝপথেই আপনার রিকুয়েস্ট সার্ভারে পৌছানোর আগেই তা এনএসএ'র সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র TURBULENCE-কে পার করে যেতে হবে।

সুনির্দিষ্টভাবে বললে, আপনার রিকুয়েস্টকে ধাপে ধাপে সাজানো কয়েকটি কালো সার্ভারকে অতিক্রম করতে হয়। এগুলো আমেরিকার বন্ধুরাষ্ট্রসমূহের বেসরকারি টেলিযোগাযোগ ভবন, সেনাঘাঁটি, আমেরিকান দূতাবাসসমূহের বিশেষ কক্ষে ইন্সটল করা আছে। আর তাতে দুটি জটিল যন্ত্র আছে। প্রথমটা হলো, TURMOIL। এতে আগত তথ্যকে কপি করা হতো। আর অন্যটি, TURBINE। এটি ব্যবহারকারী থেকে অবৈধভাবে তথ্য সংগ্রহ করে।

অদৃশ্য ফায়ারওয়াল যেখান দিয়ে ইন্টারনেট যাতায়াত করে। TURMOIL-কে কল্পনা করতে পারেন অদৃশ্য ফায়ারওয়ালের গার্ড হিসেবে। এটি বিভিন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী আপনার রিকুয়েস্টকে তদন্ত করবে, এর মেটাডাটা চেক করবে। এই তদন্ত এনএসএ'র ইচ্ছামতো যেকোনো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে হতে পারে। হতে পারে এটি কোনো ইমেইল অ্যাড্রেস, ক্রেডিট কার্ড, ফোন

নাম্বার, আপনার সার্চ ডেস্টিনেশন কিংবা 'anonymous internet proxy' বা Protest এর মতো কোনো শব্দ।

TURMOIL-এর কাছে আপনার সার্চ সন্দেহজনক মনে হলে এটি তা TURBINE-এর কাছে হস্তান্তর করবে। এটি আপনার সার্চকে পাঠাবে এনএসএ সার্ভারের কাছে। সেখানে এলগরিদম সিদ্ধান্ত নিবে আপনার বিরুদ্ধে সংস্থার কোন ক্ষতিকর প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা যায়। আর এটি নির্ভর করবে আপনার কম্পিউটার সফটওয়্যার, ইন্টারনেট কানেকশন ও আপনি যে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন তার ওপর। তারপর তা TURBINE এ পাঠানো হবে। TURBINE এই ক্ষতিকর প্রোগ্রামটি আপনার ও আপনার রিকুয়েস্টকৃত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করিয়ে দিবে। সবশেষে আপনি যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে যাবেন। কিন্তু সাথে পাবেন আপনাকে নজরদারি করার সব সাজসরঞ্জাম। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটি ঘটে মাত্র ৬৮৬ মিলি সেকেন্ডে। সম্পূর্ণ আপনার অজান্তে। একবার আপনার কম্পিউটারে এসব কার্যক্রম সেট হয়ে গেলে এনএসএ আপনার মেটাডাটা, ডাটা সবকিছুতে প্রবেশ করতে পারবে। তখন থেকে আপনার সম্পূর্ণ ডিজিটাল লাইফ তাদের অধীনে।

হুইসেলব্লোয়িং

আমি এনএসএ SharePoint সফটওয়্যার পরিচালনা করতাম যারা SharePoint নিয়ে কাজ করেনি তারাও এর ক্যালেন্ডার সম্পর্কে জানত। এটি সাধারণ নন-গভর্নমেন্ট গ্রুপ ক্যালেন্ডারের মতোই তবে ব্যয়বহুল। হাওয়াইতে এনএসএ কর্মী কখন, কোথায় মিটিংয়ে উপস্থিত হবে এসব সময়সূচি এতে উল্লেখ ছিল। এটি নিয়ে কাজ করা ছিল খুব চমকপ্রদ। আমি চাইতাম এতে সব ধরনের হলিডে রিমাইন্ডার থাকুক। শুধু সরকারি ছুটিই নয় বরং রশ হাশানাহ, ঈদ উল ফিতর, ঈদ উল আযহা, দিওয়ালি সব।

১৭ সেপ্টেম্বর ছিল আমার প্রিয় হলিডে। সংবিধান দিবস ও নাগরিক দিবস। ১৭৮৭ সালের এই দিনে সাংবিধানিক সম্মেলনের প্রতিনিধিরা সংবিধান অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেন। সংবিধান দিবস কোনো সরকারি ছুটির দিন না। হয়তো সরকার আমাদের দেশের সংবিধানকে এতটা গুরত্বপূর্ণ মনে করে না যে মানুষকে এর জন্য একদিন ছুটি দিতে হবে। গোয়েন্দা এজেন্সির জন্য এ দিনটি খুব অস্বস্তিকর। এদিন তারা পরিচালকদের কাছে ছাপানো ইমেইল সাইন করাত আর ক্যাফেটেরিয়ার কোনো একটি টেবিলে ছাপা সংবিধানের কিছু কপি রাখত। এই ছাপা সংবিধান Cato Institute ও Heritage Foundation সরকারকে দান করত। কারণ গোয়েন্দা এজেন্সি এসব কাগজের মাধ্যমে নাগরিক স্বাধীনতা প্রচারের পেছনে তাদের কোটি কোটি টাকা খরচ করতে পারবে না। আইসিতে আমি সাতটি সংবিধান দিবস পালন করেছি। আমার মনে হয় না আমি ছাড়া আর কেউ টেবিল থেকে কোনো কপি নিয়েছে। আমি একসাথে কয়েকটি কপি নিতাম। একটি আমার জন্য আর বাকিগুলো আমার সহকর্মীদের জন্য। টেবিলে রুবিকস কিউবের নিচে কপিটা রেখে লাঞ্চের সময় পড়তাম। আর চেষ্টা করতাম যাতে ক্যাফেটেরিয়ার পিৎজার চর্বি 'We the People' কথাটায় না লাগে।

আমার সহকর্মীরা বিরক্ত হতো। অফিসে সব কাগজই কাজ শেষে ছিড়ে ফেলা হতো। কেউ টেবিলের উপর কোনো হার্ডকপি দেখলে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করত, "এটা কী নিয়ে এসেছ?"

"সংবিধান।"

তারা চেহারাটি বিরক্তিকর বানিয়ে ধীরে ধীরে কেটে পড়ত।

২০১২ এর সংবিধান দিবসে সংবিধানের আর্টিকেল থেকে সংশোধনী পর্যন্ত পড়লাম। দেখে অবাক হলাম, সংবিধানের প্রথম দশটি সংশোধনী, Bill of Rights-এর ৫০ ভাগে আইন প্রয়োগের কাজ কিছুটা কঠিন করা হয়েছে। চতুর্থ থেকে অষ্টম সংশোধনীতে সরকারের ক্ষমতার ব্যবহার ও গণ-

নজরদারির ক্ষমতাকে ব্যাহত করা হয়েছে। চতুর্থ সংশোধনী মানুষ ও তাদের সম্পদকে সরকারের অপ্রয়োজনীয় তদন্ত থেকে নিরাপত্তা দিয়েছে।

এতে বলা আছে-ব্যক্তি, বাসস্থান, নথিপত্রকে সরকারি যাচাই-বাছাই ও অযৌক্তিক অনুসন্ধান এবং আটক থেকে সুরক্ষিত থাকার অধিকার লঙ্ঘিত করা হবে না এবং শপথ বা নিশ্চিতকরণের মতো সম্ভাব্য কারণ ছাড়া এবং অনুসন্ধানের স্থান এবং আটককৃত ব্যক্তির বর্ণনা ছাড়া কোনো ওয়ারেন্ট জারি করা হবে না।

অর্থাৎ কোনো আইন প্রয়োগকারী আপনার জীবন নিয়ে অনুসন্ধান করতে চাইলে তাকে বিচারকের কাছে সম্ভাব্য কারণ বলতে হবে। কোনো অপরাধের সাথে আপনার সম্পৃক্ততার উপযুক্ত কারণসহ তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তারপর তাদেরকে শপথ করে বলতে হবে এই প্রমাণ তারা সততার সাথে দেখিয়েছে। তারপর বিচারক ওয়ারেন্ট অনুমোদন করলে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা অনুসন্ধান চালাতে পারে।

সংবিধানটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল, যখন কেবল অ্যাবাকাস কম্পিউটার, গিয়ার ক্যালকুলেটর ও তাঁতের প্রচলন ছিল। বিভিন্ন খবরাখবর জাহাজে সাগর পাড়ি দিয়ে পৌছতে কয়েক সপ্তাহ বা মাস সময় লেগে যেত

কম্পিউটার ফাইল ও সেগুলোর বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন তা কাগজপত্রের মতোই। ডাটা হলো সমস্ত স্টাফের জন্য একটি সম্ভাব্য টার্ম। ডাটা হলো আমরা যা কিছু তৈরি করি ও অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় করি। এর মধ্যে আছে মেটাডেটা এতে অনলাইনে করা আমাদের প্রতিটা ক্রয়-বিক্রয়, প্রতিটা কাজ ও মালিকানার সমস্ত তথ্য থাকে। এটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের নিখুঁত বই।

এখন ক্লাউড, কম্পিউটার, ফোন আমাদের অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ জিনিস হয়ে গেছে। আপনারাই বলুন কাউকে দশ মিনিটের জন্য আপনার আনলক ফোনের সাথে কাটাতে দিবেন?

এনএসএ'র নজরদারি প্রোগ্রাম চতুর্থ সংশোধনীর সাথে বিদ্রুপ করেছে। এজেন্সির অভ্যন্তরীণ নীতি আপনার তথ্যকে আইন দ্বারা নিরাপত্তা দানকৃত কোনো কিছু ভাবছে না। আর এসব তথ্য সংগ্রহকে তথ্য আটক বলেও ভাবছে না। সাংবিধানিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাগুলো যদি সঠিকভাবে কাজ করে, তবে চতুর্থ সংশোধনীর এই চরমপন্থি ব্যাখ্যা কার্যকরভাবে প্রমাণ করে যে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আপনার গোপনীয়তার অধিকারকে সমর্পণ করে দিচ্ছেন। আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতগণ ছিলেন রাজনৈতিক ক্ষমতার দক্ষ প্রণেতা। তারা সংবিধানের প্রথম তিনটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত একটি সিস্টেম ডিজাইন করেছিলেন, যা মার্কিন সরকারের তিনটি সমান ক্ষমতার অধিকারী শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এদের মধ্যে "চেক এন্ড ব্যালেন্স" থাকার কথা ছিল।

কিন্তু যখন ডিজিটাল যুগে আমেরিকান নাগরিকদের গোপনীয়তা রক্ষার কথা এলো, তখন এই শাখাগুলোর প্রতিটি ব্যর্থ হয়।

কংগ্রেসের দুটি কক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ধীরে ধীরে ছেড়ে দিচ্ছিল। যদিও গোয়েন্দা এজেন্সিতে সরকারি ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা বাড়ছিল কিন্তু কমছিল কংগ্রেসের সেসব সদস্যদের সংখ্যা যারা আইসি'র কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। বিশেষ কমিটির কিছু সংখ্যক সদস্যরা আইসির কাজ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

আইসির ওপর কোনো মোকদ্দমার শুনানি থাকলে এনএসএ'র অবস্থান পরিস্কার বোঝা যেত। এনএসএ কখনোই সততার সাথে এক্ষেত্রে সহায়তা করত না। উল্টো আমেরিকার কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যদেরকে তাদের মিথ্যাচারে সামিল করত।

২০১৩ এর শুরুর দিকে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান জেমস ক্ল্যাপার 'US Senate Select Committee of Intelligence' এর কাছে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন, এনএসএ আমেরিকান নাগরিকদের যোগাযোগের উপর নজরদারি করে তথ্য সংগ্রহ করছে না।

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এনএসএ কী লক্ষ-কোটি আমেরিকান নাগরিকদের কোনো প্রকার ডাটা সংগ্রহ করছে?"

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "নো, স্যার। অসতর্কতাবশত হতে পারে তবে জেনেশুনে নয়।" এই সজ্ঞানে বলা নগ্ন মিথ্যা শুধু কংগ্রেসের উদ্দেশ্যেই নয়, বরং সম্পূর্ণ আমেরিকার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে ছিল। কংগ্রেসের অনেক সদস্যই জানতেন ক্ল্যাপার মিথ্যে বলছেন কিন্তু তাদের কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না।

বিচার বিভাগের ব্যর্থতা আরো হতাশাব্যাঞ্জক ছিল। The Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) একটি বিশেষায়িত সংস্থা। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা নজরদারির তত্ত্বাবধান করে। এটি বৈদেশিক তথ্য সংগ্রহের জন্য অনুমোদন দিয়ে থাকে এবং এনএসএ'কে বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এনএসএ'র ৯৯ শতাংশ আবেদনই তারা মঞ্জুর করেছে। ৯/১১ এর পরে PRISM Upstream Collection এর ব্যবহার শুধু বিদেশি সন্ত্রাসী, বিদেশি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহতেই সীমিত ছিল না। এর ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে গণনজরদারি শুরু হয় কোনো রকম পরামর্শ ছাড়াই।

ACLU'র মতে, গোপন কোর্ট করে গোপন কার্যক্রমকে অনুমোদন দিয়ে তারা গোপনে আইনের পুনঃব্যাখ্যা দিচ্ছিল। ACLU'র মতো আমেরিকান সিভিল সোসাইটি এনএসএ'কে সাধারণ আদালতে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এ গণনজরদারি কার্যক্রম আইনত ও সাংবিধানিক কি না এ ব্যাপারে সরকার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো চেষ্টা করেনি। সরকার উল্টো ঘোষণা দিল, ACLU ও তার সেবাগ্রহীতাদের কোনো

অধিকার নেই সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার। কারণ তাদের ওপর নজরদারির বিষয়টি তারা প্রমাণ করতে পারবে না। ACLU মামলার মাধ্যমে কোনো প্রমাণ তল্লাশি করতে পারবে না। কারণ এটা রাষ্ট্রীয়ভাবেই গোপন আর সাংবাদিকদের কাছে ফাঁসকৃত তথ্য গণনায় ধরাই হয় না। অর্থাৎ সরকার স্বীকৃতি না দিলে মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছানো তথ্যকে আদালত প্রমাণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে না। এর অর্থ ACLU বা কেউই আদালতে চ্যালেঞ্জ ছুড়তে পারবে না।

ন্যাক্কারজনকভাবে, ২০১৩ এর ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট ACLU ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গণনজরদারির উপর করা মামলা বরখাস্ত করে ও সরকারের পক্ষাবলম্বন করে।

তারপর আসে শাসন বিভাগ। সংবিধান লঙ্ঘনের মূল হোতা ৯/১১ এর পর বিচার বিভাগের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে গণনজরদারির ব্যাপারে গোপনে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছিল। শাসন বিভাগে উভয় দলের প্রশাসকরাই এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে চাচ্ছিলেন যাতে তা চ্যালেঞ্জ করা না যায়। সাংবিধানিক ব্যবস্থা সফল তখনই হবে যখন সরকারের তিনটি বিভাগই সঠিকভাবে কাজ করবে। তারা যদি জেনেশুনে একত্রে ব্যর্থ হয় তাহলে এটি বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।

আমিই বোকার মতো ভেবেছিলাম সুপ্রিম কোর্ট বা কংগ্রেস কিংবা প্রেসিডেন্ট ওবামা অন্তত বুশ প্রশাসন থেকে ভিন্ন হবে। তারা আইসি থেকে জবাবদিহিতা চাইবে।

আইসি একটা সময় নিজেকে আইনের উর্ধ্বে ভাবতে শুরু করল। তারা নীতিপ্রণেতাদের চেয়েও বেশি নীতি সম্পর্কে জানত। আর তারা এই সুযোগটাই গ্রহণ করে। তারা সংবিধানকে হ্যাক করে।

***

আমেরিকার জন্ম হয় বিদ্রোহ থেকে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছিল ব্রিটেনের আইনের মারাত্মক লঙ্ঘন। নীতিপ্রণেতাদের মতে এখানে প্রাকৃতিক আইনের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেছে। এখানে বিবেকের তাড়নায় আদর্শের ওপর ভিত্তি করে অপশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা আছে।

প্রথম আমেরিকান যারা এই অধিকারের ব্যবহার করেন, আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম তথ্য ফাঁসকারীদের বা Whistleblowers'দের উত্থান ঘটে ১৭৭৭ সালে। এ মানুষগুলো বেশিরভাগই ছিলেন নাবিক, কন্টিনেন্টাল নেভি অফিসার। এই কন্টিনেন্টাল নেভির কমান্ডার ইন চিফ, সেনাপতি ইসেক হপকিনস এর অধীনে ৩২টি গোলাসমৃদ্ধ রণতরী USS Warren এ তারা যুদ্ধ করে। হপকিনস একজন অলস, অবাধ্য কমান্ডার ছিল। সে তার জাহাজকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিতে চাইত না। তাছাড়া সে ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দিদের অত্যাচার করত ও তাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখত বলেও অনেক অফিসার অভিযোগ করেছেন।

Warren-এর দশজন অফিসার তাদের বিবেকের সাথে বোঝাপড়া করার পর মেরিন কমিটিতে ঊর্ধ্বতনদের উদ্দেশ্যে লিখে অভিযোগ দায়ের করেন। তারা লিখেন,

> Much Respected Gentlemen,
> We who present this petition are engaged on board the ship Warren with an earnest desire and fixed expectation of doing our country some service. We are still anxious for the Weal of America & wish nothing more earnestly than to see her in peace & prosperity.
>
> We are ready to hazard every thing that is dear & if necessary sacrifice our lives for the welfare of our country. We are desirous of being active in the defence of our constitutional liberties and privileges against the unjust cruel claims of tyranny & oppression; but as things are now circumstanced on board this frigate, there seems to be no prospect of our being serviceable in our present station. We have been in this situation for a considerable space of time. We are personally well acquainted with the real character & conduct of our commander, Commodore Hopkins, & we take this method not having a more convenient opportunity of sincerely & humbly petitioning the honorable Marine Committee that they would inquire into his character & conduct, for we suppose that his character is such & that he has been guilty of such crimes as render him quite unfit for the public department he now occupies, which crimes, we the subscribers can sufficiently attest.

এ চিঠি পাবার পর মেরিন কমিটি হপকিনসের ব্যাপারে তদন্ত করে। সে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অফিসার ও ক্রু'কে পদচ্যুত করে। নৌ কর্মচারী স্যামুয়েল শাও ও থার্ড লেফট্যানেন্ট রিচার্ড মারভেনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী মামলা দায়ের করে। তারা অভিযোগপত্রের প্রধান রচয়িতা ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে রড আইল্যান্ডের আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। এই আইল্যান্ডের শেষ কলোনিয়াল গভর্নর ছিল স্টিফেন হপকিনস। স্বাধীনতা সনদের অন্যতম স্বাক্ষরকারী ও কমান্ডার ইন চিফ এর ভাই। এই গভর্নর মামলার বিচারক নির্ধারণ করে দেয়। মামলা শুরু হবার আগেই আরেকজন নৌ অফিসার জন গ্রানিস সরাসরি কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে শাও ও মারভেনের মামলা তুলে ধরে তাদেরকে রক্ষা করেন। ৩০ জুলাই, ১৭৭৮ সালে কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস সেনাপতি হপকিনসকে আটক করে

ও কোষাগারকে নির্দেশনা দেয় শাও ও মারভেনের আইনি ফিস দেয়ার জন্য। সর্বসম্মতিক্রমে আমেরিকার প্রথম তথ্যফাঁসকারী নিরাপত্তা আইন পাশ হয়।

এ আইনে উল্লেখ করা হয়, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত প্রতিটি ব্যক্তি ও অন্যান্য অধিবাসীদের দায়িত্ব হলো কংগ্রেস বা যেকোনো ক্ষমতাসীন প্রতিষ্ঠানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো অফিসার বা ব্যক্তির দুর্নীতি, অপকর্মের তথ্য প্রদান করা।"

এ আইন আমাকে বরাবরই আশা দেখায়। বিপ্লবের চরম মুহূর্তেও কংগ্রেস এরকম একটি আইনকে স্বাগত জানিয়েছে ও তার দায়িত্ব পালন করেছে। ২০১২ এর শেষ দিকে আমি নিজেই এরকম দায়িত্ব পালনের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি জানতাম আমি একটি ভিন্ন সময়ে কিছু বিষয় ফাঁস করতে যাচ্ছি। এ আমেরিকান আদর্শের জন্যই আইসিতে আমার উর্ধতন কয়েকজন কর্মকর্তা হয়তো তাদের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছেন। এই আদর্শের জন্যই সেনারা জীবন দেয়।

আর আমার উর্ধতন কর্মকর্তারা এজেন্সির কাজের ব্যাপারে শুধু জানতই না বরং তারা এ কুকর্মের সমর্থনও করত। এনএসএ'র মতো এজেন্সিতে কুকর্ম যেখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে সেখানে উর্ধতনদের কাছে যাওয়া মানে জালে পা দেয়া। ওয়ারেন্টন, জেনেভা উভয় জায়গাতেই আমি চেইন অব কমান্ডের এই ব্যর্থতা দেখেছি। ওয়ারেন্টনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুরাবস্থা নিয়ে আমি রিপোর্ট করেছিলাম। এতে আমার সুপারভাইজাররা খুশি হননি। কারণ তাদের সুপারভাইজাররা খুশি ছিলেন না। চেইন অব কমান্ড সত্যিই একটি শিকল যেখানে নিচের দিকটা তখনই উঠবে যখন ওপরের দিকটা তাকে টেনে তুলবে।

বায়ুচালিত নৌযানের পরিবর্তে যখন স্টিম ইঞ্জিনের নৌযানের প্রচলন হয় তখন সমুদ্র থেকে নৌযান হুইসেল বাজাত। একটি হুইসেল বাজাত যখন তারা নৌবন্দর পাড়ি দিত, দুটি বাজাত যখন তারা মোড় নিত, পাঁচটি বাজাত সতর্কতা হিসেবে।

ফরাসি ভাষায় dénonciateur কথাটা ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর lanceur d'alerte কথাটা ব্যবহৃত হতো অর্থাৎ যে সতর্কবার্তা পাঠায়। Hinweisgeber বলতে বোঝায়, যে কোনো ধরনের আভাস প্রদান করে ও Enthueller হচ্ছে প্রকাশকারী ও Skandalaufdecker হলো স্ক্যান্ডাল থেকে পর্দা উন্মোচনকারী। জার্মানরা এসব কিছু শব্দ অনলাইনে ব্যবহার করে। বর্তমানে অনলাইন ভিত্তিক তথ্যফাঁসের ক্ষেত্রে হুইসেলব্লোয়ার শব্দ ব্যবহার করা হয়। রাশিয়া ও চীন তথ্য চোর ও বিশ্বাসঘাতক এসব নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহার করে। সেসব দেশে শক্তিশালী স্বাধীন গণমাধ্যমের প্রয়োজন এটি বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যে তথ্য ফাঁস কোনো বিশ্বাসঘাতকতা নয় বরং সম্মানের কাজ। ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে Leak শব্দটা এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যেনো Leaker বা

সংবাদদাতা কোনো কিছুর ক্ষতি করে ফেলেছে। বর্তমানে, 'লিকিং' এবং 'হুইসেলব্লোয়িং' প্রায়ই একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে আমার মনে হয়, 'লিকিং' শব্দটি সাধারণত যেভাবে ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে ভিন্নভাবে ব্যবহার করা উচিত। লিকিং জনস্বার্থে নয় বরং ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রাতিষ্ঠানিক বা রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য সুরক্ষিত তথ্যের কিছুটা প্রকাশ করা হয়। কিছু 'নামহীন' বা 'বেনামী' প্রবীণ সরকারি কর্মকর্তা নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য কোনো সাংবাদিককে কিছু তথ্য ফাঁস করেন।

২০১৩ সালে গণনজরদারির সমালোচনাকে দূর করার জন্য ও সন্ত্রাসবাদের ভয় বাড়ানোর জন্য আইসি অফিসাররা আল-কায়েদা নেতা আয়মান আল জাওয়াহিরি ও তার বৈশ্বিক সহযোগীদের সাথে কনফারেন্স কল ফাঁস করে। এই নামমাত্র কনফারেন্স কলে জাওয়াহিরি সাংগঠনিক সহযোগিতার ব্যাপারে কথা বলে আল-কায়েদার ইয়েমেন শাখার প্রধান নাসের আল উহায়শি ও তালিবান এবং বোকো হারামের প্রতিনিধিদের সাথে।

কনফারেন্স কলের ওপর নজরদারির ক্ষমতা প্রকাশ করে আইসি সর্বোচ্চ সন্ত্রাসী নেতাদের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সবাইকে অবহিত করছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য। কিন্তু তারা এভাবে ফাঁস করে সন্ত্রাসীদের পরিকল্পনা গোপনে জানার সুযোগ হাতছাড়া করছিল। আল কায়েদার হটলাইনে আড়িপাতার কারণে আমেরিকাকে এর মূল্য দিতে হতে পারে এটা ভেবে কাউকেই বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি।

আমেরিকার রাজনৈতিক শ্রেণি এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। এমনকি তারা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থে কিছু সংবাদ ফাঁস করার জন্য তৈরি করত। আইসি পরিণামের কথা না ভেবেই নিজেদের সফলতার কথা প্রকাশ করত।

ইয়েমেনে আমেরিকান বংশোদ্ভূত আনোয়ার আল আওলাকিকে বিচারবহির্ভূতভাবে ড্রোন হামলা দিয়ে হত্যা করা পরে ওবামা প্রশাসন তাদের ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমসে সিআইএ'র ড্রোন প্রোগ্রাম ও হত্যা তালিকা প্রকাশ করছিল। এগুলো অফিসিয়ালি টপ সিক্রেট। আর এর সাথে সরকার আমেরিকান নাগরিকদের ওপর তার টার্গেটেড গুপ্তহত্যা ক্ষমতার জানান দিচ্ছিল। এসব কর্মকাণ্ড পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমেরিকার গোপনীয়তাকে মারাত্মকভাবে প্রকাশ করছিল। সরকার প্রশংসা পাবার জন্য এমন সব বিষয় প্রকাশ করছিল যা সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রয়োজন। সরকারের সেসব অনুমোদনহীন ফাঁসকে মাফ করে দেয়া হয়েছে যেগুলো সুফল এনে দিয়েছে। আর অনুমোদনকৃত কিন্তু ক্ষতি নিয়ে এসেছে এমন সব ফাঁসকে ভুলে যাওয়া হয়েছে।

একটি তথ্য ফাঁসকে কখন সমর্থন করা হয় আর কখন হয় না? এর উত্তর হল ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ। তথ্য ফাঁসকে তখনই সমর্থন করা হয় যখন তা প্রতিষ্ঠানের মূল ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে না।

যদি সংগঠনের সব বিভাগকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একই ক্ষমতা দেয়া হয় তাহলে এর মূল ক্ষমতাসীনদের হাতে তথ্য নিয়ন্ত্রণের কোনো ক্ষমতা থাকে না। সংগঠনের কার্যক্রম তখন ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়। হুইসেলব্লোয়িং আইসির জন্য হুমকিস্বরূপ। আইসি আইনসম্মতভাবে গোপনীয়তা বজায় রাখে ও তার বিভাগসমূহকে কঠোরভাবে পৃথক রাখে। হুইসেলব্লোয়াররা একটি প্রতিষ্ঠানের নীতি আদর্শের সাথে নিজেদের নীতি আদর্শের খাপ খাওয়াতে পারে না।

কারণ বৃহত্তর সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের আনুগত্য থাকে সমস্যাগ্রস্ত। হুইসেলব্লোয়াররা জানে তারা প্রতিষ্ঠানের ভেতর থাকতে পারবে না আর প্রতিষ্ঠানকেও ভাঙতে পারবে না। তবে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা যেতে পারে। আর তাই তারা হুইসেল বাজায় আর জনগণকে অবহিত করে। এই হলো আমার পরিস্থিতির উপযুক্ত বর্ণনা।

আমি যেসব তথ্য ফাঁস করতে চেয়েছিলাম তা টপসিক্রেট ছিল। গোপন প্রোগ্রামের ব্যাপারে হুইসেল বাজিয়ে আমি সম্পূর্ণ একটি সিস্টেমের উপরেও হুইসেল বাজাতে যাচ্ছিলাম। এটি সরকারের চরম ক্ষমতার উন্মোচনই ছিল না বরং বিশেষ সুবিধার অপপ্রয়োগ করে আইসি গণতন্ত্রকে লঙ্ঘন করছিল এটিও উন্মোচন করতে যাচ্ছিলাম। সম্পূর্ণ সিস্টেমের গোপনীয়তার ওপর আলো না ফেলে জনগণ ও তাদের শাসনকার্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য পুনরুদ্ধার সম্ভব ছিল না। এই পুনরুদ্ধারকে আমি হুসেলব্লোয়িংয়ের জন্য প্রয়োজন মনে করি। এর মানে এই নয় যে তথ্য ফাঁস কোনো উগ্র কাজ। বরং এটি একটি নিয়মমাফিক কাজ জাহাজকে বন্দরে নিয়ে আসার। যেখানে তাকে মেরামত করা হবে। তার ফুটো ঠিক করে দেয়া হবে। গণনজরদারির সম্পূর্ণ উন্মোচন আমি না বরং মিডিয়া করেছে।

কার্যত এটি সরকারের চতুর্থ ব্রাঞ্চ। বিল অফ রাইটসের মাধ্যমে একে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। আমি আলোকপাত করতে চাইলাম নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যে, আমার সরকার তার নাগরিকদের মতামত না নিয়েই বিশ্বে গণনজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল।

পরিস্থিতিই হুইসেলব্লোয়ারদের নির্ধারণ করে। আইসিতে কম্পিউটার-ভিত্তিক নিচু পদগুলো আমার মতো বহুসংখ্যক প্রযুক্তিবিদ নিয়ে গড়ে উঠেছে। আমার মতো লোকেরা যা জানতে চায় এবং আমরা যা জানতে পারি তার মধ্যে সাধারণত একটি ভারসাম্যহীনতা পাওয়া যায়। আমাদের সামান্য শক্তি থাকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন করার। যদিও এ ধরনের প্রযুক্তিগত সুবিধাগুলো অবশ্যই আপত্তিজনকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যেহেতু বেশিরভাগ সিস্টেম-লেভেল প্রযুক্তিবিদের সবকিছুর মধ্যে একসেস রয়েছে। এই অধিকারের

সর্বাধিক অনুশীলন হলো প্রযুক্তিটির সাথে জড়িত ক্ষেত্রে। বিশেষজ্ঞরা প্রযুক্তিগত অপব্যবহারের বিষয়ে জনগণের কাছে রিপোর্ট করার চাইতেও বেশি কিছু করতে হবে। তাদেরকে রহস্য উন্মোচন করতে হবে। এই কাজটি পৃথিবীতে যারা ভালোভাবে করতে পারে এমন ডজনখানেক লোক আমার সাথে সুড়ঙ্গতে কাজ করত। তারা প্রতিদিন টার্মিনালে বসে দেশের জন্য কাজ করত। তারা অপব্যবহার সম্পর্কে জানার কোনো আগ্রহ দেখাত না। এটি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, তারা দেশের জন্য আইসিতে কাজ করতে এসেছে না সুযোগ পেয়ে এসেছে। একবার তারা যন্ত্রের সাথে কাজ শুরু করার পর নিজেও যন্ত্র হয়ে যেত।

ফোর্থ এস্টেট

কাউকে বলা যায় না এমন গোপন কথার সাথে বেঁচে থাকাটা খুব কষ্টের। কাউকেই বলা যায় না যে আপনার অফিস একটি আনারস ক্ষেতের নিচে পৃথিবীর সবচেয়ে গোপনীয় জায়গা। সান্ত্বনা এটুকুই যে আপনি একটি দলের সাথে কাজ করছেন। তাই গোপনীয়তার বোঝা সবাই ভাগাভাগি করে নিচ্ছেন। এতে কষ্ট আছে সাথে আছে আনন্দ।

আপনি যখন গোপন কথা লালন করেন তখন আপনার হাসিটাও মিথ্যে হয়। আমি হয়তো আমার দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে পারি কিন্তু এই দুশ্চিন্তা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা প্রকাশ করতে পারি না। আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন আমার মনেই তা থাকবে। আমার সহকর্মীদেরকে আমি বুঝিয়েছিলাম, আমাদের কাজ দেশের প্রতি আমাদের শপথের লঙ্ঘন করছে। জবাবে তারা বলতো, "তুমি আর কীই-বা করতে পারবে?"

এ প্রশ্ন আমি ঘৃণা করতাম। কিন্তু এতে নিজেকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাই, "সত্যিই, কী করবো?"

আমি উত্তর পেয়ে গেলাম। তথ্য ফাঁস করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ভালোবাসা লিন্ডসিকে এ ব্যাপারে কিছুই বললাম না। আমার সাথে সেও ভুক্তভোগী হোক তা আমি চাইনি। আমি নীরব থাকলাম। সেই নীরবতায় আমি সম্পূর্ণ একা ছিলাম।

আমি ভেবেছিলাম এই একাকিত্ব আমার জন্য সহজ হবে আমার পূর্বসূরি তথ্য ফাঁসকারীদের মতোই। আমার জীবনে প্রতিটা পদক্ষেপও কী এর প্রস্তুতি ছিল না? এতগুলো বছর নিস্তব্ধভাবে কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে কাটিয়ে আমার একাকিত্বে কী আমি অভ্যস্ত হইনি? আমি একজন হ্যাকার ছিলাম, নাইট শিফট কর্মকর্তা ছিলাম। একটি জনশূন্য অফিসের চাবি আমার কাছে রাখার দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু আমি তো একজন মানুষও। একাকি প্রতিটা সময় ছিল খুব কষ্টকর। প্রতিবারই আমি আমার নীতি ও আইন, কর্তব্য ও বাসনার মধ্যে সংযোগ ঘটাতে চেষ্টা করছি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। আমার সবই ছিল- ভালোবাসা, পরিবার, সফলতা সব।

আমি আমার সিদ্ধান্তের ভয়াবহতার কথা জানতাম। তবু আমি নিজের অবস্থানের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, আমেরিকান জনগণের কাছে এসব তথ্য ফাঁস করার আমি কে?

আমি দেশের গণনজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে যে তথ্য ফাঁস করতে যাচ্ছিলাম এটি টেকনোলজিক্যাল ছিল। এতে মানুষ আমাকে সন্দেহ করবে ও ভুল বুঝতে

পারে এই ভয় পাচ্ছিলাম। তাই জনগণের সামনে উপযুক্ত দলিল প্রমাণসহ যেতে চাইলাম। কোনো গোপন কার্যক্রমের ব্যাপারে তথ্য ফাঁস করা মানে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানান দেয়া। কিন্তু একটি কর্মসূচির কাজকর্মের ব্যাপারে ফাঁস করতে হলে দরকার ডকুমেন্ট। যতটা পারা যায় এই অপব্যবহার সম্পর্কে সংস্থার মূল ফাইলগুলো সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানতাম একটি মাত্র পিডিএফ ফাঁস করাও আমাকে জেলে নেয়ার জন্য যথেষ্ট।

শাস্তির কথা চিন্তা করে আমি সেলফ পাবলিশিং এর সিদ্ধান্ত নিলাম। ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে অনলাইনে পোস্ট করে এর ছড়িয়ে দেয়া সবচাইতে নিরাপদ হবে। কিন্তু এই উপায় অনুসরণ করলাম না। কারণ অনলাইনে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ও আজগুবি তথ্যের ভিড়ে এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে যাবে।

আমি চাচ্ছিলাম কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ সত্যের সাক্ষী হোক। তাছাড়াও আমি একজন পার্টনার চাচ্ছিলাম যে এ তথ্য ফাঁসের সাথে আসা বিপত্তিগুলো টেকনোলজিক্যালি ও আইনিভাবে মোকাবিলায় সহায়তা করতে পারবে। আমি নিজেই এই গণনজরদারির সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারব। কিন্তু আমার ভরসার যোগ্য আরো কাউকে দরকার ছিল। এক্ষেত্রে কোনো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা আমার উপর আসা অভিযোগ মোকাবিলায় সাহায্য করবে। তাছাড়া আমি জেনে না জেনে, ব্যক্তিগত বা প্রফেশনাল ভাবে কোনো পক্ষপাতিত্ব করলে তা শুধরে দেবে। এ তথ্যের উপস্থাপন আমার রাজনৈতিক মতামত দ্বারা প্রভাবিত হোক তা চাইনি। যে দেশের নাগরিকদের নজরদারির আওতায় রাখা হচ্ছে সেই দেশে আর কোনো বিষয়ই জরুরি নয়।

আমার এই আদর্শগত বিশুদ্ধতার খোঁজ করার ক্ষেত্রে লিন্ডসির প্রভাব আছে। লিন্ডসি আমাকে ধৈর্য সহকারে এমন শিক্ষা দেওয়ার জন্য বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছিল। আমার আগ্রহ এবং উদ্বেগ এবং তাঁর আগ্রহ এক নাও হতে পারে। অবশ্যই সারা বিশ্বেরও আমার সাথে আগ্রহের মিল নাও থাকতে পারে। আমি সবার সাথে নিজের জ্ঞান ভাগ করে নিচ্ছি তার অর্থ এই নয় যে তাদেরকে আমার মতামত মানতে হবে। এমন না যে, গোপনীয়তার ওপর আক্রমণের বিরোধিতা করা প্রত্যেকেই ২৫৬-বিট এনক্রিপশন মান গ্রহণ করবে বা পুরোপুরি ইন্টারনেট ছাড়তে প্রস্তুত হবে। কারো কাছে হয়তো কোনো কাজ সংবিধানের লঙ্ঘন, আবার এই একই কাজ অন্য ব্যক্তির কাছে হয়তো তাদের গোপনীয়তা বা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের গোপনীয়তার লঙ্ঘন। লিন্ডসি এই সত্যকে বুঝতে পারার চাবিকাঠি। সে কিছু না জেনেও আমার সংশয় দূর করেছে ও অন্যান্য লোকের কাছে পৌঁছানোর আত্মবিশ্বাস দিয়েছে।

কোন লোকেরা? কে? আমি যখন প্রথম এগিয়ে আসার কথা ভেবেছিলাম তখন হুইসেলব্লোয়ারের পছন্দের ফোরামটি ছিল উইকিলিক্স। এটি প্রচলিত প্রকাশকের মতোই ছিল। যদিও এটি রাষ্ট্র ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয়ে ছিল। নিয়মিতভাবে এটি নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রকাশনা যেমন-*Gurdian, the*

New york Times, Der Spiegel, Le Monde এবং *El Pais*-এর সাথে যোগাযোগ করত। তাদের বিভিন্ন উৎস দ্বারা সরবরাহ করা ডকুমেন্ট প্রকাশ করত। এই অংশীদার সংবাদ সংস্থাগুলো ২০১০ এবং ২০১১-এর সময়কালে যেসব কাজ সম্পাদন করেছিল তা আমাকে পরামর্শ দেয় যে উইকিলিক্স সাংবাদিকদের সাথে যুক্ত থেকে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য প্রকাশ করে। এটি ফায়ারওয়াল হিসেবে সেই উৎসগুলোর নাম প্রকাশ করে না। মার্কিন সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ সদস্য চেলসা ম্যানিং যখন মার্কিন সরকারের ইরাক ও আফগান যুদ্ধের ফিল্ড লগ, গুয়ান্তানামো বেতে বন্দিদের অবস্থা উইকিলিকসের মাধ্যমে প্রকাশ করেন তখন থেকে এর কার্যক্রম বদলে যায়। সাইটটিতে ম্যানিংয়ের তথ্য ঘিরে সরকারি প্রতিক্রিয়া এবং মিডিয়া বিতর্কের কারণে উইকিলিক্স তাদের কার্যক্রম পরিবর্তন করে ভবিষ্যতে তথ্য ফাঁস করার সিদ্ধান্ত নেয়। সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার নীতিতে এ পরিবর্তনটির অর্থ উইকিলিক্সের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ করা আমার প্রয়োজন পূরণ করবে না।

এর মাধ্যমে ফাঁস করা মানে নিজেকে প্রকাশ করা। আমি ইতোমধ্যে অপর্যাপ্ত বলে এটি প্রত্যাখ্যান করি। অত্যন্ত গোপনীয় গণনজরদারির বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা সম্পর্কে এনএসএ'র দলিলগুলো বোঝা বেশ মুশকিল। এটা এতটাই জটিল এবং টেকনোলজিক্যাল যে, একবারে এর উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তবে কেবল ধৈর্যশীলতা এবং সাংবাদিকদের যত্নশীল কাজ দ্বারা, একাধিক স্বতন্ত্র প্রেসের সহায়তায় আমি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম ফলাফল আশা করতে পারি।

সাংবাদিকদের মাধ্যমে তথ্য ফাঁসের চিন্তা করে আমার শান্তি লাগছিল। কিন্তু আমি বেশ লম্বা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। নিউইয়র্ক টাইমস বেশ নামি-দামি পত্রিকা। কিন্তু এটির সাথে যোগাযোগ করতে ইতস্ততবোধ করছিলাম। যদিও উইকিলিক্স নিয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট করে এটি সরকারের অসন্তোষের মুখে ছিল।

সরকারের ওয়ারেন্টবিহীন ওয়ারটেপিং প্রোগ্রাম নিয়ে করা এরিক লিষ্টব্লাউ ও জেমস রাইসেনের একটি আর্টিকেলের কথা মনে পড়ল। এই দুই সাংবাদিক বিচার বিভাগের হুইসেলব্লোয়ারদের সহায়তায় STELLERWIND এর একটি রূপরেখা থেকে পর্দা উন্মোচন করেন। তারা ৯/১১ পর এনএসএ'র নজরদারি উদ্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আর্টিকেল লিখেন। ২০০৪ এর মাঝামাঝি সময়ে এটি প্রেসে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তখন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বিল কেলার সরকারের কাছে এই আর্টিকেলটি দিয়েছিলেন সৌজন্য প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো, নির্দিষ্ট তথ্য জাতীয় সুরক্ষা বিপন্ন করতে পারে–সরকারের এমন যুক্তি সম্পাদকরা যাতে মূল্যায়ন করতে পারে। এই ক্ষেত্রে সরকার নির্দিষ্ট কারণ বলতে অস্বীকার করেছিল। তবে ইঙ্গিত দিয়েছিল STELLERWIND এর অস্তিত্ব আছে এবং এটি ক্লাসিফাইড করা।

বুশ প্রশাসন কেলারকে এবং কাগজের প্রকাশক আর্থার সলজবার্গারকে বলেছিল, সরকার আমেরিকান নাগরিকদের টেলিফোনে বিনা ওয়ারেন্টে আড়ি পাতছে-এই তথ্য যদি জনগণের কাছে প্রকাশিত হয় এবং প্রমাণিত হয় তাহলে টাইমস আমেরিকার শত্রুদের উৎসাহিত করবে এবং সন্ত্রাস সক্রিয় করবে। দুর্ভাগ্যক্রমে, লিচটব্লাউ এবং রাইসেনের রিপোর্ট অবশেষে প্রকাশ হয়। কিন্তু এক বছর পরে, ২০০5 সালের ডিসেম্বরে। মূল আর্টিকেলটি যদি প্রকাশিত হতো, তবে এটি সম্ভবত ২০০4 সালের নির্বাচনের গতিপথ পরিবর্তন করে দিত।

টাইমস বা কোনো সংবাদমাধ্যম যদি আমার সাথে একই জিনিস করে! তারা যদি আমার ফাঁসকৃত তথ্যকে রিভিউ করার জন্য পেশ করে ও মূল তথ্য চাপা দেয় তাহলে আমি শেষ হয়ে যাব।

আমি একটি লিগ্যাসি সংবাদপত্র বিশ্বাস করতে পারছি না, আমি কোন প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করতে পারি? কী দরকার এসব ভাবার? আমি এই কাজের জন্য আসিনি। আমি কেবল কম্পিউটার নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম এবং আমার দেশের জন্য ভালো কিছু করতে চেয়েছিলাম। তাছাড়া আমার একটি বাড়ি আছে, ভালোবাসার মানুষ আছে আর আমার স্বাস্থ্যও ঠিক হচ্ছিল। আমি এই পাগলামি থামাতে চাচ্ছিলাম। আমার মাথা ও মন লড়াই করছিল। আমি আশা করছিলাম আমি না করলে অন্য কেউ হয়তো করবে। একটা সময় ছিল সাংবাদিকতা বিভিন্ন সূত্রকে একসাথে সংযোগ করত। এখন টুইট করা ছাড়া সাংবাদিকরা আর কী করে?

ফোর্থ এস্টেটের নাগরিকদের ব্যাপারে আমি দুটি ব্যাপার জানতাম। তারা প্রযুক্তির ব্যাপারে কিছুই জানত না। প্রযুক্তির ব্যাপারে তাদের দক্ষতার অভাব ও অনীহার কারণে তারা দুটি ঘটনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল।

প্রথমটি ছিল উটাহের ব্লাফডালে এনএসএ'র একটি বিস্তৃত নতুন ডাটা সুবিধা নির্মাণের ঘোষণা। এজেন্সি এটিকে বলত Massive Data Repository। নামটি প্রকাশ হয়ে গেলে তা ব্যাখ্যা করা কঠিন হতে পারে, তাই পরে এটির নামকরণ করা হয়েছিল Mission Data Repository। কারণ যতক্ষণ আপনি সংক্ষিপ্ত রূপটি পরিবর্তন করবেন না, আপনাকে সব ব্রিফিং স্লাইড পরিবর্তন করতে হবে না। MDR-এ চারশ পঁচিশ হাজার স্কয়ার ফুট হলে প্রচুর সার্ভার আছে। এটি প্রচুর পরিমাণে ডাটা ধরে রাখতে পারে। মূলত পুরো গ্রহের জীবনযাত্রার ইতিহাস এটি ধরে রাখতে পারে। মানুষ থেকে ফোনে, ফোন থেকে কলে, কল থেকে নেটওয়ার্কে এবং সেসব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চলমান ইন্টারনেট ক্রিয়াকলাপের সব ধরে রাখতে পারে।

একমাত্র সাংবাদিক জেমস বামফোর্ড এই বিষয়ে ২০১২ সালের মার্চে Wired নামে একটি লিখা লিখেন। আর কেউই এই সাধারণ প্রশ্নটুকুও করেনি যে কেন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের এত জায়গা দরকার। গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান

বাদই দিলাম। কোন ধরনের তথ্য কতটুকু, কতদিন পর্যন্ত তারা জমা করে রাখবে? কারণ এরকম কিছু তৈরি করার কোনো দরকার নেই যদি সবকিছু সারা জীবনের জন্য জমা করে রাখা না হয়। উটাহ মরুভূমির মাঝে একটি দৈত্যাকার কংক্রিটের বাংকার, কাঁটাতার ও নিরাপত্তা টাওয়ার দিয়ে বেষ্টিত জায়গায় একটি শহরের পাওয়ার গ্রিড থেকে আলো ব্যবহার করা হচ্ছল। কিন্তু কারোরই কোনো খবর নেই।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল এক বছর পরে, মার্চ ২০১৩ সালে। ক্ল্যাপার কংগ্রেসের কাছে মিথ্যা কথা বলার এক সপ্তাহ পরে কংগ্রেস তাকে একটি পাস দেয়। কয়েকটি সাময়িকী এই সাক্ষ্যটির প্রকাশ করেছিল, যদিও তারা কেবল ক্ল্যাপারের এই অস্বীকারকেই ফুটেজ দিয়েছে যে, এনএসএ আমেরিকানদের ওপর ডাটা সংগ্রহ করছিল। তবে কোনো তথাকথিত মূলধারার প্রকাশনা সিআইএ'র চিফ টেকনোলজি অফিসার ইরা গাস হান্টের জনসম্মুখে উপস্থিতি নিয়ে কিছুই প্রকাশ করেনি।

আমি গাসকে চিনি সিআইএ'র সঙ্গে আমার ডেল সংযোগ থেকে। তিনি আমাদের শীর্ষস্থানীয় গ্রাহকদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি যা ভাবেন তার থেকেও বেশি বলতেন। তিনি নিউইয়র্কের একটি সিভিলিয়ান টেক ইভেন্টে বিশেষ অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত হন যার নাম গিগাওম স্ট্রাকচার: ডাটা কনফারেন্স। ৪০$ থাকলে যে কেউ এতে যেতে পারে। গসের আলোচনা অনলাইনে লাইভ হয়েছিল। আমি অভ্যন্তরীণ এনএসএ চ্যানেলের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম, সিআইএ শেষ পর্যন্ত তার ক্লাউড চুক্তিটি নতুনভাবে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটি ডেল-এ আমার পুরনো দলকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এইচপিকেও প্রত্যাখ্যান করে। এর পরিবর্তে আমাজনের সাথে দশ বছরের জন্য ৬০০$ মিলিয়ন ডলারে ক্লাউড উন্নয়ন এবং পরিচালনার চুক্তিতে সই করে। এ সম্পর্কে আমার কোনো নেতিবাচক অনুভূতি ছিল না। আসলে এই মুহূর্তে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম যে আমার কাজ এজেন্সিটি ব্যবহার করবে না। পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কেবল কৌতূহলী ছিলাম, গাস কেন আমাজনকে বেছে নিয়েছে সে সম্পর্কে হয়তো কোনো তথ্য দিতে পারে। যেহেতু গুঞ্জন চলছিল প্রস্তাবটি অ্যামাজনের পক্ষে গেছে।

আমি বিষয়টি বুঝতে পারি। কিন্তু এটি অপ্রত্যাশিত ছিল। সিআইএর একজন সর্বোচ্চ পদস্থ টেকনিক্যাল অফিসার স্টেজে ব্রিফ দিচ্ছিলেন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বকে এজেন্সির উচ্চাভিলাষ এবং ক্ষমতা সম্পর্কে বলছিলেন। 'সিআইএতে', তিনি বলেছিলেন, 'আমরা মৌলিকভাবে সমস্ত কিছু সংগ্রহ করার চেষ্টা করি এবং এটি চিরদিনের জন্য ধরে রাখি'।

তিনি আবারো বললেন, "মানুষের সব তথ্যকে আমরা ধরে রাখি।" তিনি তার স্লাইড থেকে এসব পড়ছিলেন।

এই ভিড়ের মধ্যে কয়েক জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন, তাদের প্রায় সবাই ছিল বিশেষ টেক- গভর্নমেন্ট পাবলিকেশন 'ফেডারাল কম্পিউটার সপ্তাহ' থেকে। এ পাবলিকেশন বলছিল, গস তার প্রেজেন্টেশনের শেষ দিকে প্রশ্নোত্তরের জন্য আটকে ছিলেন। তবে এটি প্রশ্নোত্তর ছিল না বরং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আরো একটি সহায়ক উপস্থাপনার মতোই ছিল। তিনি অবশ্যই তার মন থেকে কিছু বের চেষ্টা করছেন। এটি কোন ফাজলামো ছিল না। গাস সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বললেন, স্মার্টফোন বন্ধ করে রাখলেও এজেন্সি তা ট্র্যাক করতে পারে। এজেন্সি মানুষের প্রতিটা তথ্যে নজরদারি করতে পারে।

তিনি বেশ চিন্তামগ্ন হয়ে ভাষণ দিতে থাকলেন- 'প্রযুক্তি অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলছে। সরকার ও আইন পেছনে পড়ে আছে। প্রযুক্তি আমার-আপনার চেয়েও এগিয়ে আছে। আপনারা নিজেদেরকে নিজের অধিকার ও নিজেদের তথ্যের মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন করুন।'

গসের এই বক্তব্য শুধু হাফিংটন পোস্টে প্রকাশ করা হয়। ইউটিউবে এখনো পাওয়া যাবে। শেষবার দেখেছিলাম ৩১৩ টির মতো ভিউ ছিল। এর মধ্যে ডজনখানেক আমারই ভিউ। আমি বুঝতে পারলাম সাংবাদিকদের কাছে তথ্য দেয়া ও তা ব্যাখ্যা করার চেয়েও বেশি কিছু আমাকে করতে হবে। তাদেরকে টেকনোলজিক্যাল জ্ঞান দিতে হবে। তাদের জন্য বিভিন্ন উপায় তৈরি করতে হবে যাতে তারা নিরাপদে ও সঠিকভাবে রিপোর্ট করতে পারে। আর এটা করা মানে গোয়েন্দা কাজের সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ করে ফেলা।

যেখানে অন্যান্য গোয়েন্দারা বিদ্রোহ করছিল আমি সেখানে সাংবাদিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে যাচ্ছি। বিশেষ তথ্য জনস্বার্থে সংবাদমাধ্যমের কাছে দেয়া ও শত্রুর কাছে তা বিক্রয় করার মধ্যে আমেরিকান আইন কোনো পার্থক্য রাখেনি। আইসিতে আমার দীক্ষাদানের সময় বলা হয়েছিল সাংবাদিকদের কাছে বিনামূল্যে তথ্য প্রকাশ করার চেয়ে শত্রুর কাছে তথ্য বেঁচে দেয়া কিছুটা ভালো। কারণ সাংবাদিক জনগণকে জানিয়ে দিবে। আর শত্রু তো তার পুরস্কারের ব্যাপারেও তার বন্ধুকে পর্যন্ত বলবে না।

আমি যে ঝুঁকি নিয়েছিলাম তার প্রেক্ষিতে আমার এমন লোকদের চিহ্নিত করা দরকার যাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি। যাদের উপর জনসাধারণের আস্থাও ছিল। আমার এমন সাংবাদিকের দরকার ছিল যারা অধ্যবসায়ী, বুদ্ধিমান, স্বাধীন অথচ নির্ভরযোগ্য। যাতে তারা আমার সন্দেহ ও প্রমাণের মধ্যকার পার্থক্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানাতেও তাদের যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া দরকার। সর্বোপরি, আমাকে নিশ্চিত হতে হয়েছিল আমি যাকেই বাছাই করব সে চাপের মুখে পড়ে ক্ষমতার লোভী হবে না।

আমি আমার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিস্তৃতভাবে জাল বিছিয়ে দিই। যেনো ব্যর্থতা থেকে অন্তত বাঁচার পক্ষে তা যথেষ্ট পরিমাণে হয়। এই ব্যর্থতা থেকে বাঁচার জন্য একজন সাংবাদিক, একটি প্রকাশনা, এমনকি একটি দেশও পর্যাপ্ত হবে না। কারণ মার্কিন সরকার এ ধরনের প্রতিবেদন আটকাতে ইচ্ছুক ছিল।

নিজের কাছে কিছুই না রেখে আমি প্রত্যেক সাংবাদিককে ডকুমেন্টগুলোর সেট এক সাথে দিতে পারি। এতে আমাকে গ্রেপ্তার করা হলেও সত্য তখনও প্রকাশ হতে থাকবে।

কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম আমি অযথা সময় নষ্ট করছি। আমি নিজে থেকে সাংবাদিক বাছাই না করে বরং তাদেরকে বাছাই করলাম যাদেরকে জাতীয় গোয়েন্দা এজেন্সি টার্গেট করছিল।

লারা পোয়েত্রাস, আমেরিকান ডকুমেন্টারিয়ান। তার বেশিরভাগ ডকুমেন্ট ছিল ৯/১১ পরবর্তী আমেরিকার বৈদেশিক নীতি নিয়ে। তার ফিল্ম 'মাই কান্ট্রি' ছিল ২০০৫ সালে ইরাকের জাতীয় নির্বাচন নিয়ে। এ নির্বাচন আমেরিকার তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আমেরিকার ক্রিপ্ট অ্যানালিস্ট উইলিয়াম বিনিকে নিয়ে তৈরী করেন 'দ্য প্রোগ্রাম'। বিনি STELLERWIND এর পূর্বসূরি TRAILBLAZER এর বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ এটি তথ্য ফাঁস করে। এর ফলে তাকে লাঞ্চিত করা হয় ও বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। লরা নিজেও তার কাজের জন্য সরকারের কাছে লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। যতবার তিনি দেশের বাইরে যেতেন ততবারই তাকে সীমান্ত গোয়েন্দা আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করত। গ্লেন গ্রিনওয়াল্ড, একজন কলামিস্ট ও নাগরিক স্বাধীনতা আইনজীবী। তিনি ২০০৯ সালে এনএসএ আইজি'র আনক্লাসিফাইড ভার্সন নিয়ে Salon এর জন্য একটি লিখা লিখেন। তারপর তিনি গার্ডিয়ানের আমেরিকান এডিশনের জন্য লিখতেন। তিনি ছিলেন সন্দেহবাদী ও বিতর্কপ্রবণ। তিনি সেরকম ব্যক্তি যে দুশমনের সাথে কঠিন লড়াই করতে পারতেন। যদিও গার্ডিয়ানের ব্রিটিশ এডিশনের ইউয়েন ম্যাক্সকিল এবং ওয়াশিংটন পোস্টের বার্ট গেলম্যানও বলিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। কিন্তু আমি লরা ও গ্রিনকেই চাইলাম।

এখন তাদের সাথে যোগাযোগ করার পালা। আমি আমার পরিচয় গোপন করে, বিভিন্ন মুখোশের আড়ালে তাদের সাথে যোগাযোগ করতাম ও পরে তা মুছে দিতাম। একজন কিংবদন্তি কৃষক সিনসিনাটাসের নাম ধারণ করলাম। তিনি রোমান কূটনৈতিক ছিলেন ও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন

তার পর আমি 'Citizenfour' নাম নিলাম। এটির মাধ্যমে আমি বুঝালাম আমি এনএসএ' র ইতিহাসে বিন্নি ও তার পরবর্তী TRAILBLAZER এর হুইসেলব্লোয়ার জে। কির্ক ওয়েইবে ও এড লুমিসের পর চতুর্থ ভিন্নমতাদর্শ কর্মী।

যদিও আমার মাথায় অন্য তিন ব্যক্তির নাম ছিল। একজন হলেন TRAILBLAZER-কে প্রকাশকারী টমাস ড্রেক। ডেনিয়েল এলসবার্গ ও অ্যান্থনি রুশো The Pentagon Papers এ ভিয়েতনাম যুদ্ধের সব ধোকাবাজি ফাঁস করে দেন। ফলে এ যুদ্ধের শেষ হয়। আমি শেষ যে নাম পছন্দ করি এর নাম Verax. এটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ সত্যবাদী। Mendax নামটি ছিল হ্যাকারদের এক রোলমডেলের নাম। এর অর্থ মিথ্যার বক্তা। এটি ছিল উইকিলিকসের জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জের ছদ্মনাম।

অনলাইনে বেনামে থাকা কতটা কষ্টকর তা আপনি সত্যিই উপলব্ধি করতে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি ভাববেন এর উপরই আপনার জীবন নির্ভর করে।

আইসিতে স্থাপন করা বেশিরভাগ যোগাযোগ ব্যবস্থার একক মৌলিক লক্ষ্য থাকে, কোনো যোগাযোগ পর্যবেক্ষক এর সাথে জড়িতদের পরিচয় সনাক্ত করতে সক্ষম হবে না বা কোনো উপায়ে এজেন্সিকে তাদের ব্যাপারে বলতে পারবে না। আইসি এ কারণেই এ এক্সচেঞ্জগুলোকে "অ-আরোপযোগ্য" বলে। ইন্টারনেট পূর্ব গুপ্তচরবৃত্তিতে অজ্ঞাতনামা থাকা খুব জনপ্রিয় ছিল। টিভি বা মুভির বদৌলতে দেখা যেত বাথরুমে বা দোকানে গ্রাফিতিতে কোড অ্যাড্রেস লুকানো থাকত। কিংবা স্নায়ুযুদ্ধ সময়কালীন ডেড ড্রপস বা মেইল বক্সে কোনো চক মার্কের সিগন্যাল দিয়ে বাইরে থাকা পাবলিক পার্কের গাছের নিচে কোনো প্যাকেজের দিকে ইঙ্গিত করা হতো। বর্তমান ভার্সন হলো ফেইক একাউন্ট ব্যবহার করা ও সিআইএ নিয়ন্ত্রিত কোনো এপসের মাধ্যমে মেসেজ দেয়া।

আমি অন্য কারো ইন্টারনেট কানেকশন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ম্যাকডোনাল্ড বা স্টারবাকসের ওয়াইফাই ব্যবহারের কথা ভাবছিলাম কিন্তু তাদের সিসিটিভি আছে। তাছাড়া তারা রিসিপ্ট ব্যবহার করে।

তদুপরি, ফোন থেকে ল্যাপটপ প্রতিটি ওয়্যারলেস ডিভাইসের একটি মেশিন অ্যাড্রেস কোড থাকে। এটি একটি বিশ্বব্যাপী অনন্য সনাক্তকারী কোড। এটি প্রতিটি ব্যবহারের রেকর্ড রাখে।

তাই আমি ম্যাকডোনাল্ডস বা স্টারবাকস না গিয়ে ড্রাইভিংয়ে গেলাম। বিশেষত, আমি ওয়ার-ড্রাইভিংয়ে গিয়েছিলাম। এটি হলো আপনি যখন নিজের গাড়িকে ওয়াইফাই সেন্সরে রূপান্তর করেন। এজন্য একটি ল্যাপটপ, একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টেনা এবং একটি চৌম্বক জিপিএস প্রয়োজন। এগুলো গাড়িতে ফিক্স করা যায়। পাওয়ার তৈরি হয় ল্যাপটপ, পোর্টেবল ব্যাটারি থেকে। আপনার এ কাজের জন্য যা দরকার তা একটি ব্যাকপ্যাকেই জায়গা হয়ে যাবে।

আমি একটি ল্যাপটপ নিলাম এটিতে TAILS আছে। এটি একটি লিন্যাক্স বেসড স্মৃতিলোপের অপারেটিং সিস্টেম। অর্থাৎ আপনি এটিকে বন্ধ করলেই

এটি সব ভুলে যায়। আর আপনি বুট করলেই কাজ শুরু করে। এতে কোনো লগ বা মেমোরি জমা থাকে না। টেইলস এর কারণে আমি ল্যাপটপের মেশিন অ্যাড্রেস কোডকে লুকিয়ে রাখতে পারলাম। যখনই এটি কোনো নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকে তখন এটি অন্য কোনো মেশিনের রেকর্ডটি রেখে দেয় টেইলস বেনামে টর নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করতেও সমর্থ হয়েছিল।

রাতে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আমি পুরো ওয়াহু দ্বীপে ঘুরে, আমার অ্যান্টেনায় প্রতিটি ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক তুলেছিলাম। আমার জিপিএস সেন্সরটি প্রতিটি একসেস পয়েন্টকে সেই অবস্থানের সাথে ট্যাগ করেছিল। আমি যে ম্যাপিং প্রোগ্রাম ব্যবহার করেছি, একে আমি ক্যাসমেট বলতাম। এর ফলে অদৃশ্য নেটওয়ার্কগুলোর একটি মানচিত্র তৈরি হলো যা আমরা প্রতিদিনই পার করে যেতাম। যার বেশিরভাগ নেটওয়ার্কেরই কোনোরকম সুরক্ষা ছিল না। বা এমন সুরক্ষা ছিল যা আমি তুচ্ছভাবে বাইপাস করতে পারি। কিছু নেটওয়ার্কের আরো পরিশীলিত হ্যাকিং প্রয়োজন ছিল।

আমি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটি নেটওয়ার্ক জ্যাম করতাম, যার ফলে বৈধ ব্যবহারকারীর লাইন বন্ধ হয়ে যেত। তারা পুনরায় সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করত। তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের 'অথেনটিকেশন প্যাকেটগুলো' পুনরায় সম্প্রচার হতো। এগুলোকে আমি বাধা দিয়ে সংকেতকে পাসওয়ার্ডে পরিণত করতে পারতাম যা আমাকে অন্য কোনো 'অনুমোদিত' ব্যবহারকারীর মতো লগইন করতে দেয়।

হাতের মধ্যে ম্যাপ নিয়ে ওয়াহু আইল্যান্ড গাড়ি নিয়ে পাগলের মতো ঘুরতাম। কোনো সাংবাদিক উত্তর দিল কি না চেক করতাম। কাছাকাছি এক রিসোর্টের ওয়াইফাইয়ের সাথে কানেক্ট করে সন্ধ্যেবেলা বিচে গাড়ির পেছনে বসে লরা পোয়েত্রাসকে মেইল করেছিলাম। কিছু সাংবাদিককের ক্ষেত্রে এনক্রিপ্টেড মেইল ব্যবহার করা দরকার ছিল, যা ২০১২ এর দিকে ছিল বেশ কষ্টকর। কখনো বা স্কুল, গ্যাস স্টেশন, ব্যাংক বা লাইব্রেরির পার্কিং লটে বসে তাদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতাম। এদের সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুব দুর্বল। একটি মলের পার্কিং গ্যারেজে বসে যখন আমি ল্যাপটপের ঢাকনা বন্ধ করতাম তখন আমার সব নিরাপদ হয়ে যেত। কতবার জনগণের কাছে ফাঁসের ব্যাখ্যা করে ম্যানিফেস্টো লিখতাম আবার ডিলিট করে দিতাম। কতবার লিন্ডসির উদ্দেশ্যে ইমেইল লিখে তা আবার ডিলিট করে দিয়েছি। আমি কোনো ভাষা খুঁজে পেতাম না।

Read, Write, Execute

Read, Write, Execute কম্পিউটিংয়ে এদেরকে পারমিশন বা অনুমতি বলা হয়। তারা কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে আপনার কর্তৃত্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে। আপনি ঠিক কী করতে পারেন এবং কী করতে পারবেন না তা নির্ধারণ করে।

Read আপনাকে ফাইলে একসেস করতে দেয়। অন্যদিকে Write কোনো ফাইল পরিবর্তন করতে দেয়। Execution এর অর্থ হলো আপনার কাছে কোনো ফাইল বা প্রোগ্রাম পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে।

Read, Write, Execute এই ছিল আমার সহজ তিনটি ধাপের পরিকল্পনা। আমি সত্যকে খুঁজে পেতে, এর কপি তৈরি করতে এবং এটি বিশ্বে উন্মুক্ত করার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত নেটওয়ার্কের কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম। ধরা না পড়ে এ তিনটি কাজই আমাকে করতে হবে।

প্রায় যা কিছুই আপনি একটি কম্পিউটারে করবেন, তার রেকর্ড ডিভাইসে থাকবে। এনএসএ'তে এটি আরো বেশি সত্য। প্রতিটি লগ-ইন এবং লগ-আউট একটি লগ এন্ট্রি তৈরি করে। প্রতিটি পারমিশন যেগুলো আমি ব্যবহার করতাম তা সনাক্তকরণ চিহ্ন রেখে দিত। আমি যখনই কোনো ফাইল খুলেছি, কোনো ফাইল কপি করেছি, সেইসব কাজ রেকর্ড করা হতো। প্রতিবার ফাইল ডাউনলোড, সরানো বা মুছে ফেলা রেকর্ড করা হতো। সুরক্ষা লগগুলো আপডেট করা হতো। নেটওয়ার্ক প্রবাহের রেকর্ড, পাবলিক কী অবকাঠামোর রেকর্ড সবই ছিল। এমনকি বাথরুমে, বাথরুমের স্টলে ক্যামেরা আছে কি না এ নিয়ে লোকেরা রসিকতা করত। এজেন্সিটির লোকেরা যারা গোয়েন্দাগিরি করত তাদের উপর গোয়েন্দাগিরি করার মতো এত প্রোগ্রাম ছিল না। এমনকি যদি কেউ আমাকে এমন কিছু করতেও ধরে ফেলে যা আমার করা উচিত নয় তাহলে এমন কাজের ফাইল কখনোই ডিলিট হবে না।

ভাগ্যক্রমে, এই সিস্টেমগুলোর শক্তিই ছিল তাদের দুর্বলতা। তাদের জটিলতা হলো তাদের পরিচালনাকারী লোকেরাও জানে না যে, তারা কীভাবে কাজ করে। তারা কোথায় ওভারল্যাপ করেছে এবং কোথায় তাদের ফাঁক রয়েছে তা আসলে কেউ বুঝতে পারে না। সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ব্যতীত। সর্বোপরি, আপনি যে মনিটরিং সিস্টেম কল্পনা করছেন, সেগুলোর MIDNIGHTRIDER এর মতো ভীতিকর নাম রয়েছে প্রথমে সেগুলো ইনস্টল করতে হবে।

এনএসএ এ নেটওয়ার্কের জন্য টাকা পয়সা দিত। কিন্তু সিস্টেম অ্যাডমিনরা এর আসল মালিক ছিল। Read পর্যায়ে কাজ হতো ডিজিটাল গ্রিড ট্রিপওয়ারের মাধ্যমে। এগুলো এনএসএ'র সাথে দেশি-বিদেশি গোয়েন্দা

এজেন্সির রুটে স্থাপিত ছিল। এর মধ্যে এনএসএ'র ইউকে পার্টনার Government's Communications Headquarters বা GCHQ এর কথা বলা যায়। এটি OPTICNERVE নামে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করছিল, যা প্রতি পাঁচ মিনিটে Yahoo, PHOTONTORPEDO (এটি মেসেঞ্জার ব্যবহারকারীর আইপি অ্যাড্রেস নিত)'র মতো প্লাটফর্মে মানুষের ভিডিও চ্যাটের স্ন্যাপশট নিত.

হার্টবিট ব্যবহার করে আমি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করলাম। Bulk Collection সেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে যারা এটি জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছিল। অর্থাৎ আইসির ক্ষেত্রে ফ্রাংকেন্সটাইনের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হবে। এজেন্সির সিকিউরিটি টুলগুলো কে, কী পড়েছে তা খেয়াল রাখত। কিন্তু ততদিনে যারা তাদের লগ চেক করত তারা হার্টবিটে যেতে শুরু করল। তাই বিপদের আশঙ্কা নেই। এটি একটি উপযুক্ত গোপনীয়তা হবে।

কিন্তু হার্টবিট ব্যবহার করে ফাইল সংগ্রহ করার পর হাওয়াইয়ের মূল সার্ভারে এটি লগ হিস্ট্রি রেখে দিত। আমি সাংবাদিকদের কাছে যেসব ফাইল তুলে দিব সেগুলোর সাথে অপ্রয়োজনীয় ফাইল খুঁজে বের করে ডিলিট করতে হবে। Read পর্যায়ে নানাবিধ ক্ষতি আছে। এতে হয়তো মনিটরিং করা হয় না। কিন্তু আমি সরাসরি এসব ফাইল হার্টবিট সার্ভারে খুঁজতে পারব না। এভাবে সরাসরি সার্ভার থেক নিজের পার্সোনাল স্টোরেজে ফাইল রাখলে ধরা পড়তে হবে। এতে অ্যারেস্ট হবার দিকে নিজেকে নিয়ে যেতে হতে পারে।

ফাইলগুলো সাধারণ কম্পিউটারে রাখা সম্ভব ছিল না। কারণ ২০১২ সালের আগেই হাওয়াইয়ের সুড়ঙ্গ অফিস থেকে 'Thin client' মেশিন উদ্ভাবন করা হয়। এতে ত্রুটিপূর্ণ ড্রাইভযুক্ত ছোট কম্পিউটার ও সিপিইউ নিজেরা ডাটা স্টোর ও প্রসেস না করে তা ক্লাউডে করত।

অফিসের এক কর্ণারে এরকম পুরনো, অব্যবহৃত কম্পিউটারের স্তূপ আছে। যাদের কাছে এনএসএ'র মতো বাজেট নেই তাদের কাছে এই কম্পিউটারগুলো নতুনই। এগুলো ডেলের ২০০৯-১০ সালের দিকের কম্পিউটার। এগুলো ক্লাউডের সাথে সংযুক্ত না হয়েই ডাটা স্টোর ও প্রসেস করতে পারত। এদের ব্যাপারে আমার যে জিনিসটা ভালো লাগত তা হলো, এরা এনএসএ সিস্টেমের মধ্যে থাকলেও যতক্ষণ আমি এদেরকে কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতাম তাদেরকে ট্র্যাক করা যেত না।

হার্টবিট পুরনো অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কাজ করছে কি না বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি-এরকম কথা বলে এই নির্ভরযোগ্য বাক্সগুলো ব্যবহার করার জন্য সহজেই নিতে পারতাম। প্রতিটি এনএসএ সাইটের প্রত্যেকেরই এখনও নতুন "Thin Clients" নেই। আর যদি ডেল হার্টবিটের বেসামরিক সংস্করণ বাস্তবায়ন করতে চায়? অথবা সিআইএ, এফবিআই বা অনুরূপ কিছু পশ্চাৎপদ সংস্থা এটি ব্যবহার করতে চাইলে কী হবে? সামঞ্জস্যতা পরীক্ষার কথা বলে আমি এই পুরানো কম্পিউটারগুলোতে

ফাইলগুলো স্থানান্তর করতে পারতাম। যেখানে আমি যত্নের সাথে তথ্য অনুসন্ধান, ফিল্টার করা এবং যত খুশি নিরাপদে এগুলো অর্গানাইজ করতে পারতাম।

একদিন একজন আইটি ডিরেক্টরের পাশ দিয়ে একটি বড় পুরানো কম্পিউটারকে আমার ডেস্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমার এর কী প্রয়োজন? তিনি সেগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে চাচ্ছিলেন।

আমি উত্তর দিয়েছিলাম 'সিক্রেট চুরি করছি'। দুজনেই হাসলাম।

ফোল্ডারে আমার দরকারি ফাইলগুলো সাজিয়ে রাখার মাধ্যমে Read পর্ব শেষ হলো। কিন্তু এগুলো সুড়ঙ্গের আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা কম্পিউটারে ছিল। তারপর Write পর্ব। এটা খুবই বিরক্তিকর, ভীতিকর ও ধীর গতির ফাইল কপি প্রক্রিয়া।

যেকোনো আইসি ওয়ার্ক স্টেশন থেকে কোনো ফাইল কপি করার সবচেয়ে সহজ এবং নিরাপদ উপায়টিও বেশ প্রাচীন। সেটি হলো একটি ক্যামেরা। অবশ্যই স্মার্টফোন এনএসএ বিল্ডিংগুলোতে নিষিদ্ধ ছিল। তবে কর্মীরা দুর্ঘটনাক্রমে এগুলোকে প্রায়ই নিয়ে আসে। কেউ খেয়ালও করে না। এগুলো তাদের জিম ব্যাগে বা তাদের উইন্ডব্রেকারের পকেটে রেখে দেয়। যদি তারা অনুসন্ধানে ধরা পড়ে তাহলে আতংকে চিৎকার না করে বেশ লজ্জা ভাব দেখায়। তবে তাদের প্রায়ই সতর্ক করা হয়। যদি এটি তাদের প্রথম অপরাধ হয়।

তবে টানেলের বাইরে এনএসএ'র সিক্রেট বোঝাই স্মার্টফোন নিয়ে আসা একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বটে। এটি কেউ খেয়াল না করলে বিষয়টি বেশ আশ্চর্যজনক হবে। তবে আমি আমার কম্পিউটার স্ক্রিনের হাজার হাজার ছবি তোলার পক্ষে ছিলাম না। তাছাড়া চাচ্ছিলাম স্মার্টফোনে কনফিগারেশন এমনভাবে থাকবে যেটা বিশ্বের ফরেনসিক এক্সপার্টরা জব্দ করলেও তারা যাতে তাদের আশানুরূপ কিছুই না পায়।

আমি নিজে কীভাবে কপি ও এনক্রিপশন করেছি তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে চাচ্ছি। তবে ফাইল কপি করার জন্য কোন স্টোরেজ টেকনোলজি ব্যবহার করেছি সে ব্যাপারে বলব। থাম্বড্রাইভে অল্প জায়গা হয়। তাই আমি এসডি কার্ড বা যেটাকে বলে Secure Digital (SD) ব্যবহার করলাম। মিনি ও মাইক্রো এসডি কার্ড তো চিনতেই পারছেন। মিনি এসডি কার্ড ২০*২১.৫ মি.মি. আর মাইক্রো এসডি কার্ড ১৫*১১ মি.মি. এটিকে একটি রুবিকস কিউবের মধ্যে রেখে তারপর কিউবকে আটকে দেয়া যাবে। কেউই খেয়াল করবে না। অনেক সময় এটিকে মোজার ভেতর বা আমার মুখের ভেতর রাখতাম যাতে দরকার হলে গিলে ফেলতে পারি। বেশ আত্মবিশ্বাসী

হয়ে যাবার পর আমি আমার পকেটের তলানিতে রেখে দিতাম। কারণ তারা মেটাল ডিটেক্টর খুব কম ব্যবহার করত।

তবে এসডি কার্ডের একটি খারাপ দিক আছে। এতে কিছু লেখা খুব সময়সাপেক্ষ। ব্যাপক পরিমাণ ডাটা কপি করতে খুব সময় নেয়। সময় আরো বেশি নেয় যদি তা হার্ড ড্রাইভে না হয়ে কোনো অণু পরিমাণ সিলিকন বিস্কিটে হয়। তাছাড়া আমি কপি করা ছাড়াও প্রতিলিপি, সংক্ষেপণ ও এনক্রিপ্ট করছিলাম। আমি এনএসএ'র স্টোরেজকে সংরক্ষণ করে আইসির কুকর্ম জমা রাখছিলাম।

একটি কার্ড ভরতে আট ঘণ্টা সময় লাগত। আমি রাতের শিফটে কাজ করা শুরু করার পর এ সময়গুলো ভয়াবহ ছিল। কম্পিউটার শব্দ করত, মনিটর বন্ধ হয়ে যেত। তবে একটি ফ্লুরোসেন্ট সিলিং প্যানেল এনার্জি জমা করে রাখত। আমি মনিটর অন করে চেক করতাম কতটুকু হলো। 84 percent completed, 85 percent completed... 1:58:53 left...

এর পর যখন ১০০ ভাগ হতো তখন শান্তি লাগত। এরই মধ্যে কারো ছায়া বা পায়ের আওয়াজ শোনার আতংকে আমি ঘেমে যেতাম।

Execute ছিল শেষ ধাপ। কার্ড ভর্তি হয়ে গেলে মূল আর্কাইভটি বিল্ডিং থেকে বের করতে হবে। অতিক্রম করতে হবে বসদের, নিচে এবং হলে থাকা মিলিটারিদের ও সশস্ত্রবাহিনীকে আর দুটি সিকিউরিটি জোনকে। এ জোনে আপনার ব্যাজের স্ক্যান অ্যাপ্রোভ হলে একটা দরজা বন্ধ হয়ে আরেকটা খোলে। আর অ্যাপ্রোভ না হলে গার্ডরা অস্ত্র বের করবে ও আপনি দরজার মধ্যে আটকে যাবেন। আমি দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলাম তারা আমাকে ধরে ফেলেছে। যতবার আমি বের হতাম ভয়ে অসাড় হয়ে যেতাম। এসডি কার্ডের কথা না ভাবার চেষ্টা করতাম। এতে চলাফেরা সন্দেহজনক হয়ে যায় এজেন্সির সিস্টেম জানার কারণে আমি ভালো করে জানতাম কীভাবে ধরা পড়া থেকে বাঁচতে হবে। এক্ষেত্রে আমার গাইড ছিল পূর্বের গোয়েন্দারা যাদের বিরুদ্ধে সরকার তথ্য বেঁচে দেয়ার অভিযোগ করে। আমি এরকম কয়েকটা অভিযোগ পড়লাম। এফবিআই আইসি-র সমস্ত অপরাধ তদন্ত করে। তারা কীভাবে তাদের সন্দেহভাজনদের ধরেছিল তা গর্বের সাথে ব্যাখ্যা করে এবং বিশ্বাস করুন, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে আমি কিছুই মনে করি নি। মনে হয় প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সন্দেহভাজন কাজ শেষ না করে বাড়ি যাবার আগ পর্যন্ত এফবিআই তার গ্রেপ্তারের জন্য অপেক্ষা করে। কখনো কখনো তারা সন্দেহভাজনকে SCIF—a Sensitive Compartmented Information Facility থেকে বিভিন্ন তথ্য নিতে দিত। এটি নজরদারির সুরক্ষিত ও জনবিচ্ছিন্ন এক বিল্ডিং যেখানে উপস্থিতি একটি গুরুতর অপরাধ ছিল। আমি কল্পনা করলাম এফবিআইয়ের এজেন্টদের একটি দল আমার অপেক্ষায় আছে টানেলের একেবারে প্রান্তে।

আমি সাধারণত প্রহরীদের সাথে খুনসুটি করার চেষ্টা করতাম। এক্ষেত্রে আমার রুবিকস কিউবটি বেশ কাজে দিয়েছিল। আমি রুবিকস কিউব লোক হিসেবে টানেলের প্রহরীদের এবং অন্য সকলের কাছে পরিচিত ছিলাম। কারণ আমি হলগুলোতে যাওয়ার সময় সর্বদা কিউব নিয়ে খেলতাম। এতে বেশ পারদর্শী ছিলাম। এমনকি এটি একহাতেও সমাধানও করতে পারতাম। এটি আমাকে উৎসাহ দিত। কিন্তু প্রাথমিকভাবে এটা আমার দুশ্চিন্তা অব্যাহতি দিয়েছে। আমাকে শান্ত করেছে।

আমি কয়েকটি কিউব কিনে সহকর্মীদেরকে দিলাম। লোকেরা এতে যত বেশি অভ্যস্ত হয়ে উঠল, তত কম তারা আমার দিকে মনোযোগ দিত।

আমি প্রহরীদের সাথে ভাব জমালাম। আমি জানতাম তাদের মন অন্যত্র থাকত। আমি CASL এ থাকতে তাদের কাজের মতো কিছু করেছিলাম। আমি জানতাম সারারাত সতর্ক প্রহরার ভান করে দাড়িয়ে থাকলে অসাড় অনুভব হতো। এটা কতটা কষ্টকর। একাকিত্বে এমন অবস্থা হয় যে দেয়ালের সাথে কথা বলতে হয়।

একজন গার্ড ছিল যার সাথে আমি ইনসমনিয়া ও দুপুরের ঘুম নিয়ে কথা বলতাম। আরেক গার্ডের সাথে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতাম। সে ডেমোক্র্যাটসকে বলত 'ডেমন র্যাটস' (Demon Rats)। তারা আমার রুবিকস কিউব দেখে বেশ খুশি হতো। অনেক গার্ডই বলতো তারা ছোটবেলায় রুবিকস কিউব দিয়ে খেলেছে। কেউবা বলত তারা স্টিকারগুলো উঠিয়ে মিলিয়ে নিতো। কেউবা সাথে তাল মিলিয়ে বলত, আমিও এরকম করতাম বন্ধু।

একমাত্র বাসাতেই আমি রিলাক্স করতে পারতাম। তাও আমার মনে হতো এফবিআই আমার উপর নজরদারি করছে। তারা এরকমটাই সন্দেহভাজনদের ওপর নজরদারি করত। লিন্ডসি শুয়ে যাবার পর আমি কোচে বসে কম্বলের নিচে ল্যাপটপ নিয়ে ফাইলগুলো একটি এক্সটার্নাল স্টোরেজে ট্রান্সফার করলাম। আমি এগুলো ল্যাপটপে রেখে দিই এনক্রিপশন অ্যালগরিদমের একাধিক স্তরের নিচে লক করে, যাতে একটা ব্যর্থ হলেও অন্যটা তাদের সুরক্ষা দিতে পারে। আমি আমার কাজটির কোনো প্রমাণ না রাখার ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম। আমার ঘরেও ডকুমেন্টগুলোর কোনো চিহ্ন যেন না থাকে। তবুও, আমি জানতাম ডকুমেন্টগুলো সাংবাদিকদের কাছে পাঠানোর পরে তা আবার আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। কোনো তদন্তকারী যদি অনুসন্ধান করে কোনো এজেন্সি কর্মচারী কোথায় একসেস করেছে বা একসেস করতে পারে তাহলে এসব উপকরণ সম্ভবত একটি একক নামসহ একটি তালিকা উপস্থিত করবে। সেটা অবশ্যই আমার নাম সাংবাদিকদের কম উপকরণ সরবরাহ করতে পারতাম। তবে এতে তারা সবচেয়ে কার্যকরভাবে তাদের কাজটি করতে সক্ষম হবে না।

একটি স্লাইড বা পিডিএফও আমাকে বিপদে ফেলতে পারে। কারণ সমস্ত ডিজিটাল ফাইলগুলোতে মেটাডেটার অদৃশ্য ট্যাগ রয়েছে যা, তাদের উৎস সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই মেটাডাটা পরিস্থিতি সামাল দিতে লড়াই করলাম। আমি আশঙ্কা করেছি যে আমি যদি নথিগুলো থেকে সনাক্তকারী তথ্যগুলো না ছড়িয়ে দিই তবে সাংবাদিকরা ডিক্রিপ্ট করে সেগুলো খোলার মুহূর্তে গোয়েন্দারা আমার ক্ষতি করতে পারে। আরো চিন্তিত ছিলাম যে মেটাডাটা পুরোপুরি ছড়িয়ে দিয়ে, আমি ফাইলগুলো পরিবর্তন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েছি। যদি সেগুলো কোনোভাবে পরিবর্তিত হয়, তবে তাদের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ তৈরী হতে পারে। কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, নাকি সর্বজনীন কল্যাণ? এটি একটি সহজ পছন্দ মতো শোনাতে পারে তবে আমার সিদ্ধান্ত নিতে বেশ সময় লেগেছে। আমি এই ঝুঁকি নিলাম এবং মেটাডাটা অক্ষত রাখলাম।

আমার ভয় ছিল যে আমি মেটাডাটা ছড়িয়ে ফেললেও অন্যান্য ডিজিটাল ওয়াটারমার্ক থাকতে পারে, যা সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না এবং যা স্ক্যান করতে পারিনি। আরেকটি ছিল একক-ব্যবহারকারীর ডকুমেন্টগুলো স্ক্রাব করার অসুবিধা। একটি একক ব্যবহারকারীর ডকুমেন্ট হলো যা ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট কোড দ্বারা চিহ্নিত রয়েছে। কোনো প্রকাশনার সম্পাদকীয় কর্মীরা যদি এটি সরকার দ্বারা পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে সরকার তার উৎসটি জানতে পারে। কখনো কখনো সনাক্তকারী কোডটি তারিখ এবং সময়-স্ট্যাম্প কোডিংয়ের মধ্যে লুকানো থাকে, কখনো কখনো এটি কোনো গ্রাফিক বা লোগোতে মাইক্রোডটসের সাথে জড়িত থাকতে পারে। তবে এটি এমন কিছুতেও থাকতে পারে যা আমি ভেবেও দেখিনি। এই বিষয়টির আমাকে নিরুৎসাহিত করা উচিত ছিল, তবে এর পরিবর্তে এটি আমাকে উৎসাহিত করে। টেকনোলজিক্যাল এই অসুবিধা আমাকে প্রথমবারের মতো, আমার আজীবন গোপন থাকার অভ্যাসটি অস্বীকার করায় এবং উৎস হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করার জন্য এগিয়ে আসার সম্ভাবনার মুখোমুখি হতে বাধ্য করে। আমি সিদ্ধান্ত নিই আমার নীতি অনুসরণ করে আমার নাম প্রকাশ করব এবং নিজেকে শাস্তির মুখোমুখি করব।

আমি যেসব ডকুমেন্ট বাছাই করেছি সেগুলো একক ড্রাইভে রেখে আমার বাসায় ডেস্কে খোলা রেখেছিলাম। আমি জানি এই উপকরণগুলো অফিসে যেমন ছিল তেমন এখানেও নিরাপদ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তারা ছিল আরো সুরক্ষিত। একাধিক স্তর এবং এনক্রিপশনের পদ্ধতিগুলোকে ধন্যবাদ। এটি হলো ক্রিপ্টোলজিকাল শিল্পের অতুলনীয় সৌন্দর্য। বন্দুক এবং কাঁটাতার যা করতে পারে না তা অল্প অল্প করে গণিত সম্পাদন করতে পারে। অল্প একটু গণিত সম্পূর্ণ একটি সিক্রেট ধরে রাখতে পারে।

এনক্রিপ্ট

কম্পিউটারের রিড, রাইট ও এক্সিকিউটের সাথে আরেকটি মৌলিক পারমিশন আছে। সেটা হলো ডিলিট। এটি কীবোর্ডের কী হিসেবে হার্ডওয়্যারে রয়েছে এবং বিকল্প হিসেবে সফটওয়্যারে আছে যা ড্রপ-ডাউন মেন্যু থেকে বেছে নেওয়া যেতে পারে। ডিলিটের সাথে দায়বদ্ধতা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জড়িত। কখনো কখনো একটি বক্স পপ আপ করে আপনাকে ডাবল-চেক করতে বলে, 'আপনি কি নিশ্চিত?' আপনি নিশ্চিত করার পর কম্পিউটারটি আপনাকে 'হ্যাঁ' ক্লিক করতে বলে। এর অর্থ ডিলিটের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসবে।

কম্পিউটিংয়ের বাইরে এই ডিলিট ফাংশনের বিশাল ইতিহাস আছে।

প্রকৃতপক্ষে কোনো ডকুমেন্ট থেকে মুক্তি পেতে আপনি এর প্রতিটি কপি ধ্বংস করতে পারবেন না। আপনাকে এটির প্রতিটি স্মৃতিও ধ্বংস করতে হবে। স্বৈরশাসকরা প্রতিটা ডকুমেন্টের কপি এবং সেসব লোক যারা এসব ডকুমেন্টের কথা জানত এমন সমস্ত লোককে শেষ করে দিত। তারপরই হয়তো সব চিরতরে মুছে যেত।

ডিলিট ফাংশন ডিজিটাল কম্পিউটিংয়ের শুরু থেকেই আছে। ইঞ্জিনিয়াররা বুঝতে পেরেছিলেন সীমাহীন বিকল্পের এই বিশ্বে কিছু সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে ভুল হতে পারে।

বিশেষত তারা নিজেরাই তৈরি করেছেন এমন কোনো বিষয় ব্যবহারকারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। যদি তারা কোনো ফাইল তৈরি করে তবে তাদের ইচ্ছামতো এটি আনমেইক করার সুযোগ থাকা উচিত। তারা যা তৈরি করে তা ধ্বংস এবং নতুন করে শুরু করার সুযোগ থাকা উচিত। যদিও তাদের মালিকানাধীন হার্ডওয়্যার যা তারা মেরামত করতে পারে না এবং যে সফটওয়্যার তারা সংশোধন করতে পারে না তার ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। তারা তৃতীয় পক্ষের প্ল্যাটফর্মগুলোর বিধি দ্বারা তারা আবদ্ধ থাকতে পারে।

আপনি কোন কোন কারণে ডিলিট চাপতে পারেন? হয়তো কোনো ডকুমেন্ট থেকে মুক্তি পেতে চান বা কোনো ফাইল ডাউনলোড করেছিলেন যেটা আপনার আর লাগবে না। হয়তো আপনার প্রাক্তন প্রেমিকের কোনো মেইল ডিলিট করতে চান। আপনি চান না তা আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেখুক। আপনার ফোনের হিস্ট্রি হয়তো ডিলিট করতে চান, ডিলিট করতে চান কোনো ছবি বা ভিডিও। আপনি যখনই ডিলিট করেন তখনই সব মুছে যায়।

সত্যি বলতে টেকনোলজিক্যালি ডিলিট বলতে কিছু নেই। এটি একটি মিথ্যা যা কম্পিউটার আপনাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলে। ডিলিট করার ফলে আপনার চোখের সামনে থেকে কোনো ফাইল চলে গেলেও এটি মূলত একধরনের Write. আপনি কোনো ফাইল ডিলিট করা মানে এটি স্পর্শের

বাইরে ডিস্কের কোথাও না কোথাও আছে। আধুনিক অপারেটিং সিস্টেম একটি ডিস্কের গভীরে গিয়ে তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করার সামর্থ্য রাখে না। কম্পিউটারে ফাইল টেবিল নামে একটি ম্যাপ আছে। এটি অনেকটা একটি বিশাল লাইব্রেরিতে অবহেলায় পড়ে থাকা বইয়ের মতো। যে ফাইলটি আপনি ডিলিট করেছেন এটি কেউ চাইলে খুঁজে বের করে পড়তে পারবে। আপনি উৎস মিটিয়ে দিলেও বই ঠিকই থাকবে। পরবর্তীতে যখন কোনো ফাইল কপি করবেন তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন এটি ডিলিটের চেয়ে বেশি সময় নেয় কেন। কারণ ডিলিট একটি ফাইলকে লুকিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো কাজ করে না। খুব সাধারণভাবে চিন্তা করুন, কম্পিউটার আপনার কোনো ভুলকে শুধরে দেয় না। তা শুধু লুকিয়ে রাখে। আর লুকিয়ে রাখে শুধু তাদের কাছ থেকে যারা জানে না এটি কোথায় খুঁজতে হবে।

***

২০১২ এর সেসব দিন কিছু দুঃখজনক কিছু খবর নিয়ে এলো। গণনজরদারির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে Five Eyes Network-এর সদস্যদের যে আইনি নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়। অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের সরকার টেলিফোন ও ইন্টারনেট মেটাডাটা রেকর্ড করা বাধ্যতামূলক করে আইন প্রস্তাব করে। এটাই প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিক সরকারগুলো জনসম্মুখে নজরদারির উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। অনেকটা টাইম মেশিনের মতো করে নজরদারি ব্যবস্থা দিয়ে কয়েক মাস বা বছর আগে সবার ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য পুনরাবৃত্তি করা যাবে।

আমার তখন মনে হলো, পশ্চিমা বিশ্ব ইন্টারনেটের স্রষ্টা থেকে এর ধ্বংস সাধনকারীতে পরিণত হচ্ছে। জনগণের নিরাপত্তার কথা বলে এসব আইনের পক্ষে যুক্তি দেয়া হয়। ব্যক্তিগত জীবনে সরকারের এই অনধিকার প্রবেশে এসব দেশের মানুষ আতংকিত হয়। অন্যদিকে অন্যান্য দেশগুলোর মানুষ জানেই না তাদের দেশের সরকার গোপনে তাদের ওপর নজরদারি করছে।

গণনজরদারির এই উদ্যোগ প্রমাণ করে সরকার ও প্রযুক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে না। আমেরিকান আইসি ও গ্লোবাল অনলাইন টেকনোলজিস্টদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। আইসি'তে আমার ভূমিকা প্রথমদিকে গোয়েন্দা কাজ ও নাগরিকের ইন্টারনেট গোপনীয়তাকে সুরক্ষা প্রদান করা ছিল। এ থেকে পরিবর্তিত হয়ে টরের মতো প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা শুরু করলাম যা আমাকে কম্পিউটিং গবেষণায় আপডেট রাখত ও রাজনৈতিকভাবে উৎসাহ দিত। বছরের পর বছর আমি ভাবতাম আমরা ইন্টারনেটের সুরক্ষার জন্য কাজ করছি। আমি ভাবতাম আমি ইন্টারনেটকে বাক-স্বাধীনতার ক্ষেত্র করছি ও ভয়ভীতি থেকে মুক্ত রাখছি। পরে আমার সেই ভ্রম দূর হলো। আমার নিয়োগদাতা এজেন্সি ও সরকার ছিল এর বিরুদ্ধে। এগুলো সবসময় আমার মতো টেকনোলজিস্টরা সন্দেহ করে এসেছে আমি এসব জানতে পারলেও

তাদেরকে বলতে পারতাম না। এখনো হয়তোবা বলতে পারছি না। আমি নিজে বিপদে না পড়ে তাদেরকে সাহায্য করতে চাইলাম। আমি হনুলুলুতে গেলাম। এ শহরে যাবার ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না। শিক্ষক ও বক্তা হিসেবে এক ক্রিপ্টো পার্টি বা গোপন অনুষ্ঠানে গেলাম। এতে শিক্ষকরা জনগণকে ফ্রিতে টেকনোলোজিক্যাল সেলফ ডিফেন্স শিক্ষা দিত। যারা ইন্টারনেটে নিজেদের সুরক্ষা রাখতে প্রস্তুত ছিল। JCITA-তে আমি এই একই বিষয়ে শিখাতাম। তাই আমি এতে উপস্থিত হলাম। আমি যে এনক্রিপশন পদ্ধতি শিখিয়েছিলাম তাতে আমার বিশ্বাস ছিল। এই পদ্ধতিটিই সেই আইসির ক্ষমতার অপব্যবহার সংবলিত ড্রাইভকে রক্ষা করতে সহায়তা করেছিল। বাসায় বসে এমনভাবে ড্রাইভকে লক করলাম যে ওটা এনএসএ ভাঙতে পারবে না। আমি জানি কোনো ডকুমেন্ট, কোনো সাংবাদিকতাই পৃথিবী যে হুমকির মাঝে ছিল তা থেকে বাঁচাতে পারবে না।

মানুষের নিজেকে সুরক্ষা করার জন্য কিছু জিনিসপত্র দরকার। তাদের এসবের ব্যবহার জানা উচিত। আমি সাংবাদিকদের এরকম কিছু জিনিসপত্র দিতে চাইলাম। নিজের কলিগদের কয়েকবার এ ব্যাপারে লেকচার দিয়েছি। এখন সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে লেকচার দিলে অন্য সবার মতো আমারই লাভ। আর সত্যি বলতে আমি টিচিংকে মিস করছিলাম। এক বছর পর ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম আমি ভুল মানুষদের সঠিক শিক্ষা দিচ্ছিলাম। ক্লাস বলতে আইসি স্কুল বা ব্রিফিং রুম নয়। ক্রিপ্টোপার্টিটি একটি ফার্নিচার দোকানের পাশে এক রুমের একটি আর্ট গ্যালারিতে ছিল। আমি প্রজেক্টরে দেখাচ্ছিলাম টর সার্ভার দিয়ে কীভাবে ইরান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, আমেরিকার নাগরিককে সাহায্য করা যায়।

আমার শিক্ষার্থীরা ছিল নিষ্ক্রিয়-নিষ্প্রাণ। ডিসেম্বরে, আমি ও আমার কো-লেকচারার রুনা সান্ডভিকের কাছ থেকে শিখার জন্য মাত্র ২০ জন এসেছিল। রুনা টর প্রজেক্টের সাথে জড়িত একজন নরওয়েজিয়ান মেধাবী নারী। সে নিউইয়র্ক টাইমসের তথ্য নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র ডিরেক্টর ছিল। আমাদের দর্শকরা একত্রিত হয়েছিল টরের প্রতি আগ্রহ থেকে নয়। এমনকি নজরদারির ভয়ের কারণেও নয়।

তাদের জীবনের ব্যক্তিগত জায়গাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণের ধারণাটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তারা এসেছিল। তাদের মধ্যে কিছু দাদু বয়সি লোক ছিল যারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, হাওয়াইয়ান 'দখল' আন্দোলন নিয়ে সংবাদ করা এক স্থানীয় সাংবাদিক এবং রিভেঞ্জ পর্নের শিকার হওয়া এক মহিলা ছিল। এজেন্সি থেকে আমার সম্পৃক্ততা গোপন করছি না তা দেখানোর জন্য আমি আমার এনএসএ'র কয়েকজন সহকর্মীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে কেবল একজনই এসেছিল। সে পিছনে পা ছড়িয়ে বসেছিল আর টিটকারি মারছিল। আমি ডিলিট নিয়ে কথা বলার মাধ্যমে আমার উপস্থাপন

শুরু করলাম। বোঝালাম যে, কিছুই সম্পূর্ণভাবে ডিলিট করা সম্ভব না। অপারেটিং সিস্টেম চুপিচুপি ডিলিটকৃত ফাইলের একটি কপি কোনো অস্থায়ী স্টোরেজে রেখে দিতে পারে।

তারপর আমি এনক্রিপশন নিয়ে কথা বললাম। নজরদারি যারা করে তাদের জন্য ডিলিট হলো স্বপ্ন এবং যাদের ওপর নজরদারি করা হয় তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন। তবে এনক্রিপশন হলো সকলের কাছে বাস্তবতা। এটি নজরদারির বিরুদ্ধে একমাত্র সত্য সুরক্ষা। যদি আপনার পুরো স্টোরেজ ড্রাইভটি শুরু হওয়ার সাথে সাথে এনক্রিপ্ট করা থাকে, তবে আপনার প্রতিপক্ষ ডিলিট করা ফাইলগুলো অনুসন্ধান করতে পারবে না–যদি তাদের কাছে এনক্রিপশন 'কী' না থাকে। আপনার ইনবক্সের সমস্ত ইমেইল যদি এনক্রিপ্ট করা থাকে তবে গুগল এগুলো আপনাকে প্রোফাইল দেওয়ার জন্য পড়তে পারবে না- যদি তাদের কাছে এনক্রিপশন 'কী' না থাকে। প্রতিকূল অস্ট্রেলিয়ান বা ব্রিটিশ বা আমেরিকান বা চীনা কিংবা রাশিয়ান নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে যাওয়া আপনার সমস্ত যোগাযোগ যদি এনক্রিপ্ট করা থাকে তবে গোয়েন্দারা সেগুলো পড়তে পারে না–যদি তাদের কাছে এনক্রিপশন কী না থাকে। এটিই এনক্রিপশনের নীতি–'কী'র মালিকের কাছে সমস্ত ক্ষমতা থাকে।

এনক্রিপশন কাজ করে, অ্যালগরিদমের মাধ্যমে। একটি এনক্রিপশন অ্যালগরিদম ভয়ঙ্কর মনে হয়। লিখতে গেলে অবশ্যই ভয় লাগে। তবে এর ধারণাটি বেশ প্রাথমিক। এটি হলো বিপরীতভাবে তথ্যকে রূপান্তর করার একটি গাণিতিক পদ্ধতি। এটি আপনার ইমেইল, ফোনকল, ফটো, ভিডিও এবং ফাইলগুলোকে এমনভাবে রাখে, যার কাছে এনক্রিপশন 'কী'র কপি নেই তার কাছে এসব বোধগম্য হবে না। আপনি একটি আধুনিক এনক্রিপশন অ্যালগরিদমকে জাদুর কাঠি হিসেবে ভাবতে পারেন, যা দিয়ে আপনি প্রতিটি ডকুমেন্টের প্রতিটি শব্দকে এমন একটি ভাষায় রূপান্তর করতে পারেন যা কেবলমাত্র আপনি এবং আপনি যাদেরকে বিশ্বাস করেন তারাই পড়তে পারে। এনক্রিপশন অ্যালগরিদম মূলত কিছু গণিতের সেট যেগুলো কম্পিউটারের জন্যও সমাধান করা অবিশ্বাস্যরকম কঠিন হতে পারে।

এনক্রিপশন 'কী' হলো একটি ক্লু যা কোনো কম্পিউটারকে গণিত সমস্যার নির্দিষ্ট সেট সমাধান করতে দেয়। আপনার পঠনযোগ্য ডাটা, যেটা Plaintext নামে পরিচিত। এটিকে একটি এনক্রিপশন অ্যালগরিদমের এক প্রান্তে রাখুন। তখন Ciphertext নামক অজ্ঞাত অর্থবিহীন কথা, অন্য প্রান্তে আসে। যখন কেউ Ciphertext পড়তে চায় তখন তারা আবার অ্যালগরিদমে ফিরে আসে এবং আবার Plaintext আসে। যদিও বিভিন্ন অ্যালগরিদম বিভিন্ন পরিমাণ সুরক্ষা সরবরাহ করে। একটি এনক্রিপশন 'কী'র সুরক্ষা প্রায়শই তার দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে, যা নির্দিষ্ট অ্যালগরিদমের অন্তর্নিহিত গণিত সমস্যা সমাধানে জড়িত সব সমস্যার মাত্রা নির্দেশ করে। উন্নত সুরক্ষা দীর্ঘতর 'কী'র

সাথে সম্পর্কিত। যদি আমরা অনুমান করি যেকোনো আক্রমণকারী একটি ৬৪ বিট কী ভাঙতে একদিন সময় নেয়-যা সম্ভাব্য ২৬৪ গুন উপায়ে (18,446,744,073,709,551,616 অনুক্রম) আপনার ডাটাকে জটিল করে তোলে। ৬৫-বিট কী ভাঙতে দ্বিগুণ সময় লাগবে এবং ৬৬-বিট কী ভাঙতে চার দিন সময় লাগবে। একটি ১২৮-বিট কী ভাঙতে ২৬৪ গুণ বেশি সময় বা পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর সময় লাগবে। সেই সময়ের মধ্যে, আমাকে ক্ষমা করা হতে পারে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ক্ষেত্রে, আমি ৪০৯৬-বিট এবং ৮১৯২ বিট 'কী' ব্যবহার করি। এতে এনএসএ'র সমস্ত ক্রিপ্ট এনলিস্টরা বিশ্বের সমস্ত কম্পিউটিং শক্তি একসাথে ব্যবহার করে আমার ড্রাইভে যেতে সক্ষম হবে না। এ কারণে, এনক্রিপশন হলো কোনো ধরনের নজরদারি বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একক সেরা অস্ত্র।

যদি আমাদের যোগাযোগগুলোসহ আমাদের সমস্ত তথ্য এভাবে (প্রেরকের শেষ থেকে প্রাপকের শেষের দিকে) সজ্জিত হয়ে থাকে তবে কোনো সরকার-তা বুঝতে সক্ষম হবে না। একটি সরকার সিগন্যাল বাধাগ্রস্ত করতে এবং সিগন্যাল সংগ্রহ করতে পারে, তবে কিছু শব্দ ছাড়া কিছুই পাবে না। আমাদের যোগাযোগ এনক্রিপ্ট করা হলে প্রতিটি স্মৃতি থেকে তা মুছে যাবে।

এনক্রিপ্ট করা যোগাযোগগুলোতে সরকার একসেস করতে চাইলে কেবল দুটি বিকল্প রয়েছে, এটি হয় 'কী' মাস্টারদের অনুসরণ করবে বা 'কী' অনুসরণ করতে পারবে। প্রথমটির ক্ষেত্রে, তারা ত্রুটিযুক্ত এনক্রিপশন সম্পাদন করে এমন পণ্য বিক্রয় করার জন্য ডিভাইস নির্মাতাদের চাপ দিতে পারে বা 'back door' নামে পরিচিত গোপন একসেস পয়েন্ট ধারণকারী ত্রুটিযুক্ত এনক্রিপশন অ্যালগরিদম গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের সংস্থাগুলোকে বিভ্রান্ত করতে পারে। শেষেরটির ক্ষেত্রে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার যা এনক্রিপশন প্রক্রিয়া সম্পাদন করে এদেরকে আক্রমণ করতে পারে। আপনাকে হ্যাক করা এবং আপনার 'কী' চুরি করার এই কৌশল অপরাধীরা ব্যবহার করত কিন্তু আজ বড় রাষ্ট্রীয় শক্তিও তা ব্যবহার করে। এর অর্থ হলো জেনেবুঝেই আন্তর্জাতিক সাইবার অবকাঠামোর নিরাপত্তায় ধ্বংসাত্মক ছেদ করা।

আমাদের 'কী'গুলো সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বোত্তম উপায়ের নাম "Zeroknowledge", এটি এমন একটি পদ্ধতি যা নিশ্চিত করে আপনি কোনো ডাটা বাহ্যিকভাবে স্টোর করার চেষ্টা করছেন–উদাহরণস্বরূপ, কোনো সংস্থার ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে, তাহলে আপনার ডিভাইসে চলমান একটি অ্যালগরিদম দ্বারা এটি এনক্রিপ্ট করা হয়। আর এই 'কী' শেয়ার করা যায় না। এই Zeroknowledge স্কিমের 'কী' শুধু ব্যবহারকারীদের হাতে থাকে। কোনো কোম্পানি, কোনো এজেন্সি, কোনো শত্রু তাদের স্পর্শ করতে পারে না।

এনএসএ'র গোপন তথ্য নিয়ে আমার 'কী' Zeroknowledge অতিক্রম করেছিল। এই Zeroknowledge একাধিক zeroknowledge 'কী' নিয়ে গঠিত ছিল।

এটি এরকমভাবে কল্পনা করুন, আমার ক্রিপ্টো পার্টির বক্তৃতা শেষে, বিশ জন শ্রোতা দরজা দিয়ে যাওয়ার সময়, আমি তাদের প্রত্যেকের কানে এমন একটি শব্দ বললাম যা অন্য কেউ শুনতে পায় না। তারা সবাই একসাথে একইঘরে থাকলে কেবল তখনই তাদেরকে পুনরাবৃত্তি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কেবল এই বিশ জনকে ফিরিয়ে এনে তাদের মূল কথাগুলোকে একইভাবে পুনরাবৃত্তি করতে বলি যেভাবে আমি মূলত তাদের বলেছিলাম তাহলে তা পুরো বিশটি শব্দ হিসেবে একত্রিত হবে। যদি কেবল একজন ব্যক্তি তাদের কথা ভুলে যায়, বা কোনোভাবে ভিন্নভাবে বলে, তাহলে ভুল হয়ে যাবে। আমি এভাবেই তথ্য সংবলিত ড্রাইভের 'কী' বিন্যস্ত করি। অনেকটা জাদুমন্ত্রের মতো। একটি মন্ত্র নিজের জন্য রেখে দিই। আমার জাদুমন্ত্র সমস্ত জায়গায় লুকানো ছিল। তবে আমি যদি নিজের কাছে রাখা 'কী' ধ্বংস করি তবে এনএসএ'র সিক্রেটের সমস্ত একসেস চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে।

দ্য বয়

আমি ক্লাসের সেই ছেলে ছিলাম যে কথা বলতে পারত না। এখন সেই ছেলেটি নতুন সময়ের নতুন উদ্ভাবনের শিক্ষক। বেল্টওয়ের সেই মধ্যবিত্ত বাবা-মার ছেলেটি অনেক টাকা আয় করে একটি দ্বীপে গিয়ে বসবাস করছিল। মাত্র সাত বছরের ছোট্ট কর্মজীবনে আমি লোকাল সার্ভার থেকে শুরু করে বৈশ্বিকভাবে মোতায়েন করা সিস্টেম নিয়ে কাজ করেছি। সিকিউরিটি গার্ডের দায়িত্ব থেকে শুরু করে পুরো রাজ্যের চাবিকাঠি পেয়েছি। আমি আইসির বিভিন্ন পদে কাজ থেকে শুরু করে পরিচালনা পর্ষদেও কাজ করেছি। আর সাথে পেয়েছি সিস্টেমে ব্যাপক প্রবেশাধিকার। আইসিকে পর্যবেক্ষণ করেছি। আগ্রহ ভরে জানতে চেয়েছি কার সর্বাত্মক ক্ষমতাকে আইসি ব্যবহার করছে। আর সেটা ছিল একটা যন্ত্র। এরকম কেউ আছে যার ওপর এই মেশিন নজরদারি করতে পারবে না? এরকম কোনো জায়গা আছে যেখানে এই মেশিন পৌঁছতে পারবে না?

এ বিষয়টি জানার জন্য আমার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তিকে মেলে ধরলাম। এনএসএ'র কর্মীরা শুধু তাদের নাম কম্পিউটারে লিখত যারা সন্দেহের তালিকায় আছে। বিদেশি বা আমেরিকান যেই হোক না কেন এইসব মানুষজন ও তাদের যোগাযোগের ব্যাপারে এনএসএ সবকিছু খুঁজে বের করত। আর আমি রাষ্ট্রের এই কাজের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানতাম। মানুষ ছিল এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

XKEYSCORE–এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনাদের জীবনের সব রেকর্ডে চোখ বুলানো হতো। এটা অনেকটা গুগলের মতো যেটা বিভিন্ন পেইজের বদলে আপনার ব্যক্তিগত ইমেইল, চ্যাট, ফাইল সব খুঁজে বের করত। আমি এই প্রোগ্রামের ব্যাপারে পড়লেও তা তখন পর্যন্ত ব্যবহার করিনি। আমি এটির ব্যাপারে আরো বেশি জানার চেষ্টা করলাম। XKEYSCORE ব্যবহার করে এনএসএ'র নজরদারি প্রোগ্রামের অনধিকার প্রবেশের গভীরতা নিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলাম। সরাসরি অভিজ্ঞতা ছাড়া ডকুমেন্ট থেকে তা জানা সম্ভব নয়।

হাওয়াইয়ের যে কটা অফিসে XKEYSCORE এর এক্সেস ছিল এর মধ্যে NTOC বা National Threat Operations Center অন্যতম। এনএসএ এই অফিসের নাম দিয়েছিল Rochefort ভবন। একজন নৌবাহিনীর ক্রিপ্ট অ্যানালিস্ট জোসেফ রোচফোর্টের নাম অনুসারে এই ভবনের নাম হয়। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি কোড ভেঙেছিলেন। কর্মীরা এই ভবনকে বলত রোচফোর্ট বা রোচ। আমি যখন এখানে চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করি তখনও এই ভবনটির নির্মাণ কাজ চলছিল। আমার তখন মনে পড়ল CASL এ আমার প্রথম চাকরির কথা। আমার আইসি ক্যারিয়ার অসমাপ্ত ভবনে শুরু ও শেষ হয়। এখানে হাওয়াইয়ের সব ট্রান্সলেটর ও অ্যানালিস্টদের উপস্থিতি ছাড়াও

Tailored Access Operations (TAO)-এর লোকাল ব্রাঞ্চ ছিল। এনএসএ'র এই ইউনিটে টার্গেটেড মানুষের কম্পিউটার হ্যাক করা হতো। NTOC-এর মূল কাজ ছিল TAO-এর বিদেশি অফিস মনিটর করা। Booz Allen Hamilton এ NTOC-এর একটি চুক্তিভিত্তিক পদ ছিল। এটাকে তারা বলতো Infrastructure Analyst। সেই পদধারী ব্যক্তি XKEYSCORE'সহ এনএসএ'র অন্যান্য নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে ইন্টারনেট মনিটর করত। যদিও Booz-এ আমি বছরে এক লাখ বিশ হাজার ডলার আয় করছিলাম। আমার পূর্বের পদ, সুবিধা, একসেসের তুলনায় এটিকে পদাবনতি বলা চলে। একজন ইঞ্জিনিয়ার থেকে অ্যানালিস্ট হয়ে গেলাম। যে কি না পরে নির্বাসিত জীবনে পতিত হলো। একসময় আমি যে টেকনোলজিস্টদের নিয়ন্ত্রণ করতাম তাদেরই টার্গেট হয়ে গেলাম। আমার জীবন উল্টোদিকে চলতে শুরু করল। যা শেষ করে দিবে আমার ক্যারিয়ার, সম্পর্ক, স্বাধীনতা আর হয়তো আমার জীবন।

দেশের বাইরে গিয়ে এই আর্কাইভগুলো সাংবাদিকদের দিতে চাইলাম। কিন্তু এর আগে ওয়াশিংটন ডিসিতে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ আমার নতুন বস ও কলিগদের সাথে দেখা করতে হবে। তারা অনলাইন নিয়ে আমার জ্ঞানকে ব্যবহার করে তাদের চতুর টার্গেটদের মুখোশ উন্মোচনের ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। এ কাজ আমাকে আবার বেল্টওয়েতে ফোর্টমিডে নিয়ে গেল। আমি এখানে প্রবেশ করলাম তাদের লোক হয়ে। দশ বছরে এনএসএ'র সদর দপ্তরের কর্মী, জায়গা সব বদলে গিয়েছিল। ক্যানাইন রোডে এনএসএর পার্কিং লটে ভাড়া করা গাড়িটি ঘুরাচ্ছিলাম আর এই পরিবর্তন দেখছিলাম। এই জায়গাটি এখনো আমার স্মৃতিতে আতংক, রিংটোন, হর্ন, সাইরেনের শব্দে পরিপূর্ণ। ৯/১১ পর এনএসএ সদর দপ্তরে যাবার সব রাস্তা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শুধু আইসির ব্যাজধারীরাই এখানে আসতে পারবে। আর এটি এখন আমার গলায় ঝুলছে। সদর দপ্তরে NTOC-এর নেতৃত্ব দিয়ে বিরক্ত হয়ে গেলে অন্য অ্যানালিস্টদের থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করতাম যাতে হাওয়াইয়ে আমার সহকর্মীদের নতুন পদ্ধতি শেখাতে পারি। এই অ্যানালিস্টরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও টার্গেট নিয়ে কাজ করত।

কীভাবে সেই শক্তি প্রয়োগ করা হতো সে সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ না করে তারা বরং উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির শক্তি প্রদর্শনের জন্য যথারীতি আগ্রহী ছিল। সদর দপ্তরে থাকাকালীন আমাকে সিস্টেমের যথাযথ ব্যবহারের জন্য একাধিক পরীক্ষার দিতে হয়েছিল। এগুলো ছিল অর্থবহ নির্দেশনার চেয়ে নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের মতো। অন্য বিশ্লেষকরা আমাকে বলেছিলেন আমি যতবার বার ইচ্ছা এই পরীক্ষাগুলো দিতে পারব, তাই আমাকে বিধিমালা শেখার দরকার নেই। তারা বলত, "আপনি পাস না করা পর্যন্ত কেবল বক্সগুলোতে ক্লিক করুন।"

এনএসএ XKEYSCORE-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছে, এটি সর্বব্যাপী একটি টুল। ইন্টারনেটে মানুষ প্রায় যা কিছু করে তা খুঁজে পেতে এটি সাহায্য করে। আর যে ডকুমেন্টে এই বর্ণনা আছে আমি পরে তা সাংবাদিকদের কাছে ফাঁস করি।

আমি যেসব টেকনোলজিক্যাল বিষয় অধ্যয়ন করেছি সেগুলোর মধ্যে ছিল–'প্যাকেটাইজিং' এবং 'সেশনাইজিং' এর মতো বিষয়। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর অনলাইন সেশনগুলোর ডাটাকে কাটছাঁট করে বিশ্লেষণের জন্য পরিচালনাযোগ্য প্যাকেটে রূপান্তর করা। তবে এটি কাজটি আমি দেখতে পারিনি।

সহজ কথায় বলতে গেলে, আমার দেখা বিজ্ঞানের কল্পকাহিনির সবচেয়ে নিকটতম জিনিস হলো একটি ইন্টারফেস যার মাধ্যমে আপনাকে যে কারো ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর বা আইপি ঠিকানা টাইপ করে তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস ও অনলাইন কার্যকলাপ দেখতে পাবেন। কিছু ক্ষেত্রে আপনি তাদের অনলাইন সেশনের রেকর্ডিংগুলো প্লে করতে পারেন। এর ফলে আপনি স্ক্রিনে তাদের ডেস্কটপে যা চলছে তা দেখতে পাবেন। আপনি তাদের ইমেইল, তাদের ব্রাউজারের ইতিহাস, তাদের অনুসন্ধানের ইতিহাস, তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট সবকিছু পড়তে পারবেন। আপনি যে নোটিফিকেশন সেটআপ করবেন সেটা তারা ইন্টারনেটে আসলেই আপনাকে জানাবে। কোনো ব্যক্তির সার্চ হিস্ট্রি অক্ষরক্রমানুসারে আপনি দেখতে পারবেন। এই টাইপিংয়ের পিছনের বুদ্ধি কৃত্রিম নয় বরং সম্পূর্ণ মানবিক বুদ্ধি।

ফোর্টমিডে আমার অবস্থানকালে বুঝতে পারলাম অভ্যন্তরীণ তথ্যের সবচেয়ে বেশি অপব্যবহার হয়। তখন বুঝতে পারলাম সিস্টেম লেভেলে আমার পদ গ্রাউন্ড জিরোর ক্ষয়ক্ষতি থেকে কত দূরে ছিল। XKEYSCORE এ এজেন্সি ডিরেক্টর বা রাষ্ট্রপতির নাম টাইপ করিনি, তবে সিস্টেমের সাথে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার পরে আমি বুঝতে পারি যে, এটাও করা সম্ভব। প্রত্যেকের যোগাযোগ এই ব্যবস্থাতে ছিল। আবারো বলছি প্রত্যেকের। প্রথমদিকে ভয় পাচ্ছিলাম যদি রাষ্ট্রের উচ্চতম পদধারীদের অনুসন্ধান করি তবে আমি ধরা পড়তে পারি বা বরখাস্ত হতে পারি বা আরো খারাপ কিছু হতে পারে। তবে মেশিনের ফরম্যাটে বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে সার্চকে এনকোড করে লুকিয়ে রাখা যায়। যা মানুষের কাছে হ-য-ব-র-ল দেখায়। তবে এটি XKEYSCORE এর কাছে পুরোপুরি বোধগম্য। অনুসন্ধানগুলোর পর্যালোচনার দায়িত্বে নিযুক্ত অডিটরদের মধ্যে যদি কেউ কখনো আরো ভালোভাবে দেখতে চান, তবে তারা কেবল টুকিটাকি অস্পষ্ট কোড দেখতে পেতেন। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বা কংগ্রেস সদস্যের সবচেয়ে ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপ স্ক্রল করে ফেলা সম্ভব।

আমার নতুন কলিগদের কারোরই ব্যাপকভাবে ক্ষমতা অপব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল না। আর থাকলেও তা প্রকাশ করত না। অ্যানালিস্টরা এই সিস্টেমকে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অপব্যবহার করা শুরু করল তারা LOVEINT-এর ব্যবহার শুরু করে। এটি HUMINT ও SIGINT-এর হাস্যকর অনুকরণ। এতে অ্যানালিস্টরা তাদের বর্তমান ও প্রাক্তন প্রেমিকাদের ইমেইল পড়ত, ফোন কলে আড়িপাতত ও অনলাইনে স্টক করত। যদিও আইন করা হয়েছিল কেউ নিজের ব্যক্তিগত কাজে নজরদারিকে ব্যবহার করলে অন্তত দশ বছর তাকে জেল খাটতে হবে। কিন্তু এজেন্সির ইতিহাসে কেউই এই অপরাধের জন্য একদিনের জন্যও জেল খাটেনি। অ্যানালিস্টরা জানত সরকার তাদেরকে নিজের গোপন সিস্টেম ব্যবহারের জন্য কখনোই শাস্তি দিবে না। কারণ সরকার এই সিস্টেমের অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

এনএসএ সদর দপ্তরের ভল্ট ২২ এর দেয়ালের পেছনে দুজন অ্যানালিস্টের সাথে বসে ছিলাম। তাদের কর্মক্ষেত্রে স্টার ওয়ারের জনপ্রিয় ওকি, চিউবাক্কার সাত ফুট লম্বা ছবি ছিল। তাদের সাথে কথা বলেই এই রকম একটি নীতির মূল্য জানতে পারলাম। তাদের একজন আমাকে তার টার্গেটের নিরাপত্তা রুটিনের কথা বলছিল। এর মধ্যে আরেকজন হাসি দিয়ে নগ্ন একটি ছবি দেখিয়ে বলল, 'এই দেখ দেখ'। আমার ইন্সট্রাক্টর তখন বলল, 'বোনাস, সুন্দর.' নগ্ন ছবি যেন তাদের কাছে অফিসিয়াল টাকার মতো। টার্গেটের নগ্ন ছবি তারা একে অন্যের সাথে শেয়ার করে। যতক্ষণ না কোনো নারী এসে উপস্থিত হয়। তারা এভাবে একে অন্যের অপরাধে বিশ্বাসী ভাগীদার হয়। XKEYSCORE ব্যবহার করে পৃথিবীর সব মানুষের মাঝে দুটি জিনিস দেখতে পাবেন, তারা কখনো না কখনো পর্ন দেখেছে ও তারা তাদের পরিবারের ছবি জমা করে রাখে।

লিঙ্গ, জাতি, বয়স ভেদে এটি সবার ক্ষেত্রে সত্য। সবচেয়ে খারাপ সন্ত্রাসী থেকে সবচেয়ে ভালো নাগরিক সবার ক্ষেত্রে। হয়তো তাদের কেউ কোনো দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর দাদা, বাবা অথবা কাজিন।

পারিবারিক ছবির ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবাল। ইন্দোনেশিয়ার ছোট্ট এক ছেলের কথা আমার মনে আছে। আমার সহকর্মীরা তার বাবার প্রতি আগ্রহী ছিল। একজন পার্সোনাল অ্যানালিস্টের শেয়ার করা ফোল্ডার থেকে আমি তা জানতে পারি। এই অ্যানালিস্টরা চ্যাট লগ, ফেসবুক মেসেজ, জিমেইল ইনবক্স নিয়ে পড়ে থাকে।

সেই ছেলেটির বাবা আমার বাবার মতোই ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা সামরিক সদস্য নন। তিনি একজন শিক্ষক। ইরানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির আবেদন করা ছাড়া তিনি আর কী এমন করেছেন যে কারণে এজেন্সির নজরে এলেন আমি তা ঠিক বুঝলাম না। সন্দেহের ভিত্তিগুলো অত্যন্ত দুর্বল। আর সন্দেহের ব্যাপারে ডকুমেন্ট থাকলেও

তাতে উল্লেখ থাকে, 'সম্ভাব্যরূপে জড়িত থাকতে পারেন'। তারপর সাথে ইউনিসেফের টেলিকমিউনিকেশন মান অনুযায়ী ভীতিকর কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনের নাম থাকতে পারে। ইন্টারনেট ট্রাফিক থেকে লোকটির বিভিন্ন তথ্য একটি ফোল্ডারে রাখা হয়েছিল। সেখানে তার টেক্সট, ইন্টারনেট ব্রাউজার হিস্ট্রি, আইপি অ্যাড্রেসের সাথে আদানপ্রদানকৃত চিঠি ছিল। লোকটি বাসা থেকে যেকোনো দূরত্বেই যাক না কেন, সেটা যদি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ এর জন্যেও হয় তাহলেও তাকে ট্র্যাক করার জন্য অ্যানালিস্ট Geo-fence সেট করেছিল।

তাছাড়া তার ছবি ছিল আর ছিল একটি ভিডিও। ভিডিওতে সে ছিল তার কম্পিউটারের সামনে বসা আর আমি আমারটায় তার কোলে ডায়পার পরা এক বাচ্চা বসে ছিল। লোকটি কম্পিউটারে কিছু পড়ার চেষ্টা করছিল আর বাচ্চাটা 'কী' গুলোতে চাপ দিচ্ছিল আর হাসছিল। আমি হেডফোনে তার হাসি শুনছিলাম। বাবা ছেলেকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। ছেলেটি তার গভীর কালো চোখ দিয়ে কম্পিউটারের ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকাল। আমার মনে হচ্ছিল সে আমাকেই দেখছে। বুঝতে পারলাম আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তখনই কম্পিউটার বন্ধ করে মাথা নিচু করে বাথরুমে চলে গেলাম। হেডফোনের সাথে তখনো কর্ডের সংযোগ ছিল।

সেই ছেলে আর তার বাবাকে দেখে আমার বাবার কথা মনে পড়ল। ফোর্টমিডে থাকাকালীন এক সন্ধ্যায় তার সাথে ডিনার করেছিলাম। তারপর কিছুদিনের মাঝে আর দেখা হয়নি। ডিনারের মাঝে সালাদ আর পিংক লেমোনেড খেতে খেতে আমার হুট করেই মনে পড়ল, আমি আর কখনো আমার পরিবারকে দেখতে পারব না। নিজেকে খুব কষ্ট করে নিয়ন্ত্রণ করলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি জানতাম আমি যদি তাকে সবকিছু বলি তাহলে তিনি আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিবেন নয়তো আমাকে পাগল বলে মানসিক হাসপাতালে দিয়ে দিবেন। তিনি আমাকে এত বড় ভুল করা থেকে বাচানোর জন্য যা করা সম্ভব তাই করতেন। আমি শুধু আশা করলাম তার দুঃখটা গর্বে পরিণত হোক। মার্চ থেকে মে ২০১৩ সালের মধ্যে হাওয়াইতে ফিরে এসে আমার কাছে প্রায় প্রতিটি অভিজ্ঞতাকেই চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা বলে মনে হচ্ছিল। যদিও ওসব অভিজ্ঞতা তুচ্ছ মনে হলেও তারা আমার পথকে সহজ করেছিল। শেষবারের মতো মিলিলানির কারি খেতে যাওয়া বা হনুলুলুর আর্ট-গ্যালারি হ্যাকার স্পেসে যাওয়া বা আমার গাড়ির ছাদে বসে রাতে আকাশ দেখা ও পতনশীল তারা দেখার বেদনা খুব কমই ছিল। তবে যখনই মনে পড়ত লিন্ডসির সাথে আমার আর এক মাস বাকি আছে বা তার পাশে ঘুমানোর, তার পাশে ঘুম থেকে জেগে ওঠার আর এক সপ্তাহ বাকি আছে তখনই বেশি কষ্ট হতো। তবুও ভেঙে পড়ব এই ভয়ে তার থেকে আমার দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতাম।

আমি মৃত্যুপথযাত্রীর মতোই প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আমি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খালি করে লিন্ডসির জন্য একটি পুরনো ইস্পাতের বাক্সে নগদ টাকা রেখেছিলাম যাতে সরকার এটি জব্দ করতে না পারে। আমি বাসায় টুকিটাকি কাজ করলাম। জানালা ঠিক করা এবং লাইট পরিবর্তন করা এসব। আমার পুরনো কম্পিউটারগুলো থেকে অনেক কিছু সরিয়ে দিয়ে সেগুলো এনক্রিপ্ট করলাম। লিন্ডসি ও আমার পারিবারের জন্য সবকিছুকে সহজ করার চেষ্টা করলাম।

সবকিছুতে একটা শেষের অনুভূতিতে নিমগ্ন ছিলাম। তবু এমন কিছু মুহূর্ত ছিল যখন মনে হতো কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না এবং আমি যে পরিকল্পনাটি তৈরি করেছি তা ভেঙে পড়ছিল। সাংবাদিকদের একটি মিটিংয়ের জন্য রাজি করানো ছিল খুব কঠিন। কারণ আমি তাদের বলতে পারতাম না যে তারা কার সাথে সাক্ষাৎ করছেন, এমনকি কোথায় এবং কখন সাক্ষাৎ হবে। তারা কখনোই আসবে না বা তারা এসেও চলে যাবে এমনটাও আমাকে বিবেচনা করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমি স্থির করেছিলাম এর মধ্যে যে কোনো একটি ঘটলে আমি আমার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে আমার কাজ এবং লিন্ডসির কাছে ফিরে যাব। আর আমার পরবর্তী সুযোগের জন্য অপেক্ষা করব।

কুনিয়া থেকে বিশ মিনিটের ওয়্যার-ড্রাইভে আমি বিভিন্ন দেশ নিয়ে গবেষণা করে যাচ্ছিলাম। সাংবাদিকদের সাথে আমার সাক্ষাতের জন্য একটি অবস্থান সন্ধান করার চেষ্টা করছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি আমার কারাগার বা আমার কবরটি বাছাই করছি। Five Eyes দেশ বা সমস্ত ইউরোপ এসব কিছুই উপযুক্ত মনে হয়নি। কারণ এই দেশগুলো রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের প্রত্যার্পণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন সমর্থন করে না। তারা আমেরিকার চাপে থাকে।

আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকাতেও যাওয়া সম্ভবনা–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেখানে দায়মুক্তি নিয়ে অভিনয় করার ইতিহাস ছিল। রাশিয়া চিন্তার বাইরে ছিল কারণ এটি রাশিয়া এবং চীন। চীন তো চীনই। উভয়ই সম্পূর্ণ চিন্তার বাইরে ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে গেলে আরো নির্মম হবে। কখনো মনে হয়েছিল আমার জীবনের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং হ্যাক এনএসএ-কে লুট করা না বরং হোয়াইট হাউসের আওতার বাইরে একটি মিটিংয়ের জায়গা সন্ধান করা যেখানে আমার ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করা হবে না। আমি হংকং বাছাই করলাম। ভূ-রাজনৈতিক ভাষায়, কোনো No man's land এ পৌঁছতে পারার সবচেয়ে কাছাকাছি জায়গা ছিল এটি। এর ছিল প্রাণবন্ত মিডিয়া এবং প্রতিবাদ সংস্কৃতিসহ, বড় আকারের অবারিত ইন্টারনেট। এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে উদার বিশ্বের শহর যার নামমাত্র স্বায়ত্তশাসন আমাকে চীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে এবং বেইজিংয়ের আমার বা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা অন্তত তাৎক্ষণিকভাবেই প্রতিরোধ করবে। তবে বেইজিংয়ের প্রভাবের

ক্ষেত্রটিতে সম্ভাবনা হ্রাস করবে একতরফা মার্কিন হস্তক্ষেপের। সুরক্ষার কোনো প্রতিশ্রুতি যদিও নেই তবে, সময়ের যথেষ্ট গ্যারান্টি ছিল। আমার জন্য সবকিছু ভালো নাও হতে পারে। তবে ধরা পড়ার আগেই তথ্যগুলো প্রকাশ করা আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো।

শেষ যেদিন সকালে আমি লিন্ডসির সাথে জেগে উঠেছিলাম, সে কাউয়ির একটি ক্যাম্পে বন্ধুদের সাথে ভ্রমণে যাচ্ছিল। আমিই তাকে যেতে উৎসাহিত করেছিলাম। বিছানায় শুয়ে আমি তাকে খুব শক্ত করে ধরে রাখলাম। তখন সে জিজ্ঞেস করল তার প্রতি হঠাৎ কেনো এতটা ভালোবাসা দেখাচ্ছি। তখন আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। তাকে বললাম যে আমার ব্যস্ততার জন্য আমি দুঃখিত এবং আমি তাকে খুব মিস করবো। সে আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে ভালো মানুষ। সে হাসলো। আমার গালে টোকা দিয়ে প্যাক করার জন্য উঠে দাঁড়াল। যে মুহূর্তে সে দরজার বাইরে গেল, আমি এত বছরে এই প্রথমবারের মতো কান্না শুরু করলাম। সরকার আমাকে দোষারোপ করবে এ কারণে আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল না। কান্নার কারণেই আমার নিজেকে দোষী বলে মনে হচ্ছিল। কারণ আমি যে মেয়েটিকে ভালোবাসি তাকে ও আমার পরিবারকে যে কষ্ট দিতে যাচ্ছিলাম এর তুলনায় আমার কষ্ট কিছুই না।

আমি জানতাম এরপর কী হবে। লিন্ডসি তার ক্যাম্পিং ট্রিপ থেকে ফিরে এসে আমাকে খুঁজে পাবে না। ভাববে সম্ভবত কোনো কাজের এসাইনমেন্টে গিয়েছি। আমার মা দরজায় আমার অপেক্ষা করবেন। আমি আমার মাকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তিনি চমকপ্রদ কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন। যেমন, আমি আর লিন্ডসি এনগেজড হয়ে গেছি। আমি তার হতাশার কথা ভেবে ভয়াবহ কষ্ট বোধ করলাম। তবু ভাবছিলাম আমি সঠিক কাজ করছি। আমার মা ও লিন্ডসি একে অন্যের যত্ন নিবে। অনাগত ঝড়ে তাদের একজন আরেকজনের শক্তির প্রয়োজন হবে। লিন্ডসি চলে যাওয়া পরে আমি কাজ থেকে এপিলেপ্সির কথা বলে জরুরি ছুটি নিলাম। লাগেজ প্যাক করলাম। সাথে নিলাম চারটি ল্যাপটপ।

সুরক্ষিত যোগাযোগ, সাধারণ যোগাযোগ, একটি Decoy এবং একটি 'এয়ারগ্যাপ' (এমন একটি কম্পিউটার যা কখনো অনলাইনে যায়নি এবং অনলাইনে যাবে না)। আমি আমার স্মার্টফোনটি একটি নোটপ্যাডের সাথে রান্নাঘরের কাউন্টারে রেখেছিলাম। যেখানে লিখেছিলাম: কাজে যাচ্ছি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এর নিচে আমি আমার কোডনাম, ইকো লিখলাম। তারপরে আমি বিমানবন্দরে গিয়ে টোকিওর পরবর্তী ফ্লাইটের জন্য টিকিট কিনি। টোকিওতে, আমি আরো একটি টিকিট কিনি এবং ২০ শে মে হংকংয়ে পৌঁছাই। হংকং, যেখানে বিশ্বের সাথে আমার প্রথমবার দেখা হয়।

হংকং

গেইমের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও মানুষ বিশ্বাস করে তারা জিতবে। রুবিকস কিউবের মাধ্যমে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে বুঝলাম, আপনি কঠোর পরিশ্রম করলে সব একদম বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সঠিক জায়গায় চলে আসবে। মানুষের এই উদ্ভাবনী দক্ষতা ভঙ্গুর, বিশৃঙ্খল ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত ও সুশৃঙ্খল করে দেয়।

আমার বেশ কয়েকটি প্ল্যান ছিল। একটি মাত্র ভুল হলেই ধরা পড়ে যাব। কিন্তু সফলভাবে এনএসএ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসলাম। আমার মনে হচ্ছিল কঠিন কাজগুলো শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে সাংবাদিকদের সাথে আমার দেখা করার কথা তারা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বিলম্ব করছিল। লরা পোয়েত্রাসের কাছে আমি বেশ কয়টি ডকুমেন্ট পাঠিয়েছিলাম। তিনি নিউইয়র্ক শহর থেকে যেকোনো জায়গায় আসার জন্য রাজি ছিলেন। তবে তিনি একা আসছিলেন না। সাথে গ্লেন গ্রিনওয়াল্ডকেও আনতে চাচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন গ্রিনওয়াল্ড নতুন একটি ল্যাপটপ কিনবেন যা অনলাইনে দেয়া হবে না। তিনি চাচ্ছিলেন ল্যাপটপে এনক্রিপশন প্রোগ্রাম ইন্সটল করতে যাতে আমরা যোগাযোগ করতে পারি। আর এদিকে আমি হংকং এ প্রতিটা ঘণ্টা, দিন অপেক্ষার প্রহর গুনছিলাম। মনে মনে কাতর আবেদন করছিলাম 'আমি কাজে অনুপস্থিত এটা এনএসএ বুঝার আগেই দয়া করে চলে আসুন'। এত পরিশ্রমের পর, এত পথ পাড়ি দিয়ে হংকং গিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসার কথা চিন্তা করতেই খারাপ লাগছিল। সাংবাদিকেরা ব্যস্ততা বা ভয়ে তাদের ভ্রমণ বাতিল করছে এটা ভেবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে চাইলাম। তখন ভাবলাম কত অল্প জিনিসের জন্য আমি আমার সবকিছুকে বিপদে ফেলছি। পুলিশ আসলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। আমি লিন্ডসি ও আমার পরিবারের কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম আমি কতই না বোকা যারা আমার নামও জানে না তাদের হাতে জীবন সঁপে দিচ্ছিলাম।

মিরা হোটেলের একটি রুমে দরজায় Privacy Please-Do Not Disturb লিখা ঝুলিয়ে দশ দিন রুমের বাইরে বের হইনি। মিরা হোটেল একটি ব্যস্ত ও বাণিজ্যিক এলাকায় থাকায় এটি বাছাই করলাম। গোয়েন্দারা চলে আসবে এই ভয়ে দশদিন রুমের বাইরে বের হইনি। এই ভয়ের সাথেই অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমি ঘরটি একটি অফিসে রূপান্তরিত করলাম। এনক্রিপ্ট করা ইন্টারনেট টানেলের নেটওয়ার্ক থেকে আমি আমাদের স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের অনুপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে ক্রমাগত দরখাস্ত পাঠিয়ে জবাবের আশা করে জানলার সামনে দাঁড়াতাম। যে সুন্দর পার্কটিতে আমি

যাইনি সেটা দেখতাম। লরা এবং গ্লেন অবশেষে আসে। তারা আসার পরে আমি রুম সার্ভিসের লোকদের দেয়া প্রত্যেকটি খাবারের আইটেম খেয়েছি।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমি কেবল সেই সপ্তাহ ও আরো প্রায় অর্ধেক সময় সাংবাদিকদেরকে মেসেজ লেখার জন্য কাটাইনি। এর সাথে ব্রিফিংটি সাজানোর চেষ্টা করেছিলাম যাতে সীমিত সময়ের সাক্ষাতে সাংবাদিকদের কাছে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারি।

এটি একটি আকর্ষণীয় সমস্যা ছিল, কীভাবে নন-টেকনিক্যাল লোকদের কাছে দৃঢ়তার সাথে মূল বিষয় প্রকাশ করা যায়। তারা প্রায় নিশ্চিতভাবেই আমাকে ও মার্কিন সরকার বিশ্বে নজরদারি করছে এ ব্যাপারে সন্দেহ করছিল।

অভিধান ঘেটে 'মেটাডাটা' এবং 'communications bearer' এর মতো শব্দ একত্রিত করলাম। প্রযুক্তি বা সিস্টেমের মাধ্যমে নয়, নজরদারি প্রোগ্রামগুলোকে সংক্ষেপে, গল্পের মাধ্যমে-তাদের ভাষায় ব্যাখ্যা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে কোন গল্পগুলো প্রথমে তাদের দেওয়া উচিত তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সবচেয়ে খারাপ অপরাধকে ক্রমানুসারে আগে রাখার চেষ্টা করেছি।

লরা এবং গ্লেনকে কয়েক দিনের মধ্যে এমন কিছু বুঝতে সাহায্য করতে হবে যা বুঝতে আমার কয়েক বছর সময় লেগেছিল। তাছাড়া তাদেরকে বোঝাতে হয়েছিল আমি কে এবং কেন এ কাজটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবশেষে, গ্লেন এবং লরা ২ জুন হংকংয়ে উপস্থিত হয়। তারা যখন মীরাতে আমার সাথে দেখা করতে আসে তখন আমাকে দেখে তারা প্রথমদিকে হতাশ হয়েছিল। তারা আমাকে বলেছিল, বিশেষ করে গ্লেন বলল, সে প্রত্যাশা করেছিল কোনো বয়স্ক, ধূমপায়ী ব্যক্তি যে কি না টার্মিনাল ক্যান্সারের কারণে হতাশ এবং বিবেকের কাছে অপরাধী। তিনি আমার বয়সি একজন যুবক আশা করেননি। তিনি আমাকে আমার বয়স জিজ্ঞাসা করেন। এরকম সংবেদনশীল দলিল কীভাবে পেলাম, এটা জানার জন্য নয়। বরং এই বয়সেও নিজের জীবনকে বাজি রাখতে প্রস্তুত ছিলাম।

আমাদের কীভাবে দেখা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিলাম। হোটেলের রেস্তোঁরাটির একটি নির্দিষ্ট নিভৃত জায়গায়, একটি কুমিরের চামড়ার মতো সোফায় বসে রুবিকস কিউব হাতে এক ব্যক্তির অপেক্ষা করতে বললাম। মজার বিষয় হলো, এই কিউবটিই আমার কাছে ইউনিক মনে হলো যা দূর থেকে আলাদা এবং শনাক্তযোগ্য হতে পারে। তাছাড়া এটি ধরা পড়ার ভয় থেকেও আমাকে মুক্ত রেখেছিল।

দশ মিনিট পর দশম তলায় লরা এবং গ্লেনকে আমার রুম #১০১৪-তে নিয়ে আসলাম। লরা রুমের লাইটগুলো জ্বালাচ্ছিল। তখন আমার অনুরোধে গ্লেন তার মিনি স্মার্টফোনটি আমার মিনি ফ্রিজে রাখার সুযোগ পেল। তারপরে

লরা তার ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরাটি বের করল। আমরা এনক্রিপ্ট করা ইমেইলের মাধ্যমে সম্মত হয়েছিলাম যে সামনাসামনি ভিডিওচিত্র ধারণ করতে পারে, কিন্তু আমি বাস্তবতার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত ছিলাম না। এই মুহূর্তের জন্য আমি কোনো প্রস্তুতিই নিইনি।

তিনি আমার দিকে তার ক্যামেরাটি তাক করলেন। আমার বিছানার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র। গত দশদিন ধরে আমি রুম গুছিয়ে রাখিনি। আমি মনে করি প্রত্যেকেরই এই জাতীয় অভিজ্ঞতা আছে। আপনাকে রেকর্ড করা হচ্ছে জানলে আপনি নিশ্চয়ই খুব সচেতন হয়ে যান। আপনি যদি বুঝেন কেউ তাদের স্মার্টফোনে রেকর্ড করছে তখন অদ্ভুত লাগতে পারে, এমনকি যদি সে বন্ধুও হয়। যদিও এখন আমার প্রায় সমস্ত কথোপকথন ক্যামেরায় ধারণ করা হয়, আমি এখনও নিশ্চিত নই যে কোন অভিজ্ঞতাটি আমি অস্বস্তিকর বলে মনে করি, নিজেকে ভিডিওচিত্রে দেখা নাকি কেউ আমার ভিডিও করা। আমি আগেরটিকে এড়াতে চেষ্টা করি, তবে দ্বিতীয়টি এড়ানো এখন সবার পক্ষে কঠিন।

লরার ক্যামেরার লাল আলো আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল যে কোনো মুহূর্তে দরজাটি ভেঙে যেতে পারে এবং আমাকে চিরতরে জেলে টেনে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। এই চিন্তা সরে গেলে তখন ভাবতাম আদালতে এই ফুটেজটি দেখানো হবে।

আমি বুঝতে পারলাম আমার আরো অনেক কিছু করা উচিত ছিল, যেমন সুন্দর পোশাক পরা এবং শেভ করা। রুম-সার্ভিস প্লেট এবং আবর্জনা পুরো ঘরজুড়ে ছিল। সেখানে নুডলসে কন্টেইনার, অর্ধেক-খাওয়া বার্গার, ফ্লোরের ওপর নোংরা কাপড়চোপড় এবং স্যাঁতসেঁতে তোয়ালে মাটিতে পড়ে ছিল। এভাবে চিত্রায়িত হওয়ার আগে আমি কোনো চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে কখনোই সাক্ষাৎ করিনি। তাদের তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করার আগে আমি কোনো সাংবাদিকের সাথে কখনো সাক্ষাৎ করিনি। এর আগে কখনো মার্কিন সরকারের সম্পর্কে কারো কাছে জোরে জোরে বলিনি।

আমি ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে বিশ্বের প্রত্যেকের সাথে কথা বলছিলাম। আমি চিন্তিত ছিলাম এবং স্বাভাবিক থাকার চেষ্টায় ছিলাম। লরার চিত্রগ্রহণ অপরিহার্য ছিল, কারণ এটি বিশ্বকে দেখিয়েছিল হোটেল রুমে ঠিক কী ঘটেছিল যা নিউজপ্রিন্ট কখনোই পারবে না। সে হংকংয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে যে ফুটেজ নিচ্ছিল তা বিকৃত করা যায় না। এর অস্তিত্ব ডকুমেন্টারিয়ান হিসেবে তার পেশাদারিত্ব ও তার দূরদর্শিতার জন্য একটি শ্রদ্ধাস্বরূপ।

৩ জুন থেকে ৯ই জুন, সেই এক সপ্তাহটি কাটিয়েছিলাম গ্লেন এবং গার্ডিয়ান থেকে তাঁর সহকর্মী, ইউয়েন ম্যাকস্কিলের সাথে।

সে কিছুদিন পরে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। আমরা এনএসএ'র প্রোগ্রামগুলো নিয়ে কথা বললাম। তখন লরা চিত্রগ্রহণ করত। ব্যস্ত দিনের

বিপরীতে, আমার রাতগুলো ছিল শূন্য এবং নির্জন। গ্লেন এবং ইউয়েন আর্টিকেলে তাদের অনুসন্ধানগুলো লেখার জন্য নিকটস্থ ডব্লিউতে, তাদের নিজস্ব হোটেলে যেতেন। লরা তার ফুটেজ সম্পাদনা করার জন্য এবং ওয়াশিংটন পোস্টের বার্ট জেলম্যানের সাথে প্রতিবেদন করার জন্য অদৃশ্য হয়ে যেত। বার্ট কখনো হংকংয়ে আসেননি তবে লরার কাছ থেকে প্রাপ্ত ডকুমেন্টেস নিয়ে দূর থেকে কাজ করেছিলেন।

আমি ঘুমাতে চেষ্টা করতাম, টিভিতে বিবিসি বা সিএনএন এর মতো ইংরেজী ভাষার চ্যানেল খুঁজতাম এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখতাম।

৫ জুন গার্ডিয়ান গ্লেনের প্রথম গল্পটি প্রকাশ করল, FISA কোর্টে এনএসএকে আমেরিকান টেলিকম ভেরিজনের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিটি ফোন-কল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে। ৬ জুন, লরা এবং বার্টের ওয়াশিংটন পোস্টের মতোই গার্ডিয়ান গ্লেনের PRISM গল্পটি প্রকাশ করে। আমরা জানতাম, যত বেশি তথ্য ফাঁস হচ্ছিল তত আমার চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বেড়ে চলছে। বিশেষ করে আমার অফিস আমাকে স্ট্যাটাস আপডেটের জন্য ইমেইল করা শুরু করেছিল কিন্তু আমি উত্তর দিচ্ছিলাম না। তবে যদিও গ্লেন, ইউয়েন এবং লরা আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তবুও তারা সত্যের সেবা করার তাদের আকাঙ্ক্ষাকে দমন হতে দেয়নি। তাদের অনুসরণ করে আমিও এই আকাঙ্ক্ষা দমন করিনি।

ডকুমেন্টারির মতো সাংবাদিকতা, অনেক কিছু প্রকাশ করতে পারে। কনভেনশন এবং প্রযুক্তি উভয়ই কী কী বাদ দিতে বাধ্য হয় তা ভাবা খুব ইন্টারেস্টিং। গ্লেনের গল্পে, বিশেষত গার্ডিয়ান-এ, আপনি একটি স্বচ্ছ, যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য পেয়েছেন, যা তার ব্যক্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করে। ইওয়েনের চরিত্রতে আছে আন্তরিকতা, ধৈর্যশীলতা এবং ন্যায়। এদিকে, লরার যে সব কিছু দেখেছিল কিন্তু তাকে খুব কমই দেখা গিয়েছিল। সে ছিল অর্ধেক গোয়েন্দা, অর্ধেক শিল্পী।

প্রতিটি টিভি চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে এই প্রতিবেদনগুলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে মার্কিন সরকার তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এসব ফাঁসের উৎস খুঁজছিল। এটাও পরিষ্কার ছিল যে তারা জবাবদিহিতা থেকে বাঁচতে আমাকে ব্যবহার করবে। তারা এসব তথ্যকে স্বীকার করার পরিবর্তে, এর সত্যতা অস্বীকার করবে। তারা 'ফাঁসকারী'র বিশ্বাসযোগ্যতা এবং উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলবে।

তাই খুব দেরি হয়ে যাবার আগেই আমাকে কিছু করতে হবে। আমি যদি আমার ক্রিয়াকলাপ এবং উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা না করি তবে সরকার এমনভাবে ব্যাখ্যা করবে যা তাদের অপকর্ম থেকে মানুষের মনোযোগ দূরে রাখবে। আমার লড়াইয়ের একমাত্র আশা ছিল প্রথমে এগিয়ে এসে নিজেকে প্রকাশ করা। আমি মিডিয়াকে কেবলমাত্র তাদের ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত

পরিমাণে ব্যক্তিগত বিবরণ দেয়ার ও মিডিয়াকে স্পষ্ট বক্তব্য দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমার কাছে আমি গুরুত্বপূর্ণ নই বরং গুরত্বপূর্ণ ছিল আমেরিকান গণতন্ত্রের বিপর্যয় তুলে ধরা। তারপরে সাথে সাথেই গায়েব হয়ে যাব। এটাই অন্তত পরিকল্পনা ছিল।

ইউয়েন এবং আমি স্থির করলাম সে আমার আইসি ক্যারিয়ার সম্পর্কে একটি গল্প লিখবে এবং লরা পরামর্শ দিল গার্ডিয়ানে এটির পাশাপাশি আমার একটি ভিডিও বিবৃতি দিয়ে দিতে। এতে আমি বিশ্বব্যাপী গণনজরদারি সম্পর্কিত রিপোর্টিংয়ের পিছনে সূত্র হিসেবে প্রত্যক্ষ এবং একমাত্র দায়ভার দাবি করব। যদিও লরা পুরো সপ্তাহ চিত্রগ্রহণ করছিল (সেই ফুটেজের অনেক কিছুই যা ডকুমেন্টারি সিটিজেনফোর তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল)। এর পরিবর্তে সে প্রস্তাব করল আমার প্রথম রেকর্ড করা বিবৃতি, যা সে ঠিক সেখানেই চিত্রায়ণ শুরু করেছিল। সেই ভিডিওর শুরুতে ছিল, 'আমার নাম এড স্নোডেন। আমার বয়স উনত্রিশ বছর। হ্যালো, ওয়ার্ল্ড'।

***

আমি পর্দা সরিয়ে আমার পরিচয় প্রকাশের জন্য আফসোস করলাম না। আমি আশা করেছিলাম আরো ভালোভাবে কথা বলতে এবং আরো ভালো পরিকল্পনা নিয়ে কাজটি করতে পারতাম। সত্যি বলতে কী, আমার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। গেইমটি শেষ হয়ে গেলে কী করা উচিত সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার বিষয়ে আমি খুব একটা চিন্তা-ভাবনা করিনি। কারণ বিজয়ের সম্ভাবনা কম ছিল। আমি যে বিষয়টির যত্ন নিয়েছিলাম তা হলো তথ্যগুলো বিশ্বের সামনে প্রকাশ করা। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ডকুমেন্টগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করে আমি মূলত নিজেকে জনসাধারণের করুণায় রাখছিলাম। কোনো পালাবার কৌশলই একমাত্র কৌশল হতে পারে না, কারণ পরবর্তী যেকোনো পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত তথ্য প্রকাশকে অবহেলা করার ঝুঁকি তৈরি করবে।

একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আশ্রয় নিলে তারা আমাকে সেই দেশের গোয়েন্দা বলবে। আমি নিজের দেশে গেলে আমাকে অ্যারেস্ট করে গোয়েন্দা আইনের অধীনে বিচার করবে। আর এমন বিচারে ন্যায়বিচার আশা করা যাবে না। কারণ এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনাই নিষিদ্ধ।

ন্যায়বিচারের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল আইনের একটি বড় ত্রুটি। সরকার কর্তৃক নির্মিত উদ্দেশ্যমূলক ত্রুটির কারণে আমার অবস্থানে থাকা কাউকে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অনুমতিও দেওয়া হবে না যে, আমি সাংবাদিকদের যেসব তথ্য প্রকাশ করেছি তা নাগরিকের জন্য উপকারী ছিল। এখনও, এত বছর পরেও, আমাকে এ ব্যাপারে তর্ক করার অনুমতি দেওয়া হবে না যে, আমার ফাঁসের ভিত্তিতে করা রিপোর্টিং কংগ্রেসকে নজরদারি

সম্পর্কিত কিছু আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছিল কিংবা একটি নির্দিষ্ট গণনজরদারি কর্মসূচিকে অবৈধ বলে স্থগিত করতে আদালতকে প্রণোদিত করেছিল। কিংবা প্রভাবিত করেছিল অ্যাটর্নি জেনারেল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে, যারা স্বীকার করেছেন যে গণনজরদারি নিয়ে বিতর্ক জনসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যা দেশকে শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী করবে।

এ দাবীগুলো ভুল নয় যে, আমি আমেরিকায় ফিরে গেলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। সরকারকে আদালতে শুধু প্রমাণ করতে হবে যে, আমি সাংবাদিকদের কাছে ক্লাসিফাইড তথ্য প্রকাশ করেছি। এ কারণেই যদি কেউ বলে আমাকে বিচারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে হবে তাহলে মূলত বলছে যে, আমাকে সাজা পাওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসতে হবে। অবশ্যই সেই সাজা নিষ্ঠুর হবে। বিদেশি গোয়েন্দার কাছে বা দেশীয় সাংবাদিকদের কাছে টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট প্রকাশের দণ্ড হলো ডকুমেন্ট প্রতি বছর দশ বছর পর্যন্ত।

৯ জুন গার্ডিয়ানের ওয়েবসাইটে লরার ধারণ করা আমার ভিডিওটি পোস্ট করার সাথে সাথেই আমাকে চিহ্নিত করা হয়। আমি তাদের টার্গেট হয়ে গেলাম। আমি জানতাম যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমি লজ্জা দিয়েছি সেগুলো আমাকে শাস্তি না দেয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না। সম্ভবত ততদিন বা তার পরেও তারা আমার প্রিয়জনদের হয়রানি করবে এবং আমার চরিত্রকে বদনাম করবে, আমার জীবন এবং ক্যারিয়ারের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান করবে। আইসি'র ক্লাসিফাইড উদাহরণগুলো পড়ে এবং অন্য হুইসেলব্লোয়ার এবং লিকারদের কেইস অধ্যয়ন করে আমি এই প্রক্রিয়াটির সাথে যথেষ্ট পরিচিত ছিলাম।

আমি ড্যানিয়েল এলসবার্গ এবং অ্যান্থনি রুশোর মতো নায়কদের গল্প জানতাম। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের গোপন কার্যক্রমের বিরোধী টমাস ট্যামের কথা জানতাম যিনি বিচার বিভাগের অফিসের গোয়েন্দা নীতি ও পর্যালোচনার আইনজীবী ছিলেন। যিনি ২০০০ সালের দিকে বেশিরভাগ ওয়্যারলেস ওয়্যারটাইপিং রিপোর্টিংয়ের সূত্র হিসেবে কাজ করেছিলেন। ড্রেক, বিন্নি, ওয়েইবে এবং লুমিস ছিলেন পেরি ফেলউকের ডিজিটাল-যুগের উত্তরসূরি, যিনি ১৯৭১ সালে সংবাদমাধ্যমে তৎকালীন অপ্রকাশিত এনএসএ'র অস্তিত্ব প্রকাশ করেছিলেন। যার ফলে সিনেটের চার্চ কমিটি (আজকের গোয়েন্দা বিষয়ক সিনেট সিলেক্ট কমিটির পূর্বসূরি) নিশ্চিত করে এনএসএ'র ডকুমেন্টস দেশীয় গোয়েন্দা তথ্যের চেয়ে বিদেশি গোয়েন্দা তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

তারপর ছিলেন আমেরিকার সেনাবাহিনীর চেলসা ম্যানিং, যিনি আমেরিকার যুদ্ধাপরাধ প্রকাশের অপরাধে আদালতে পঁয়ত্রিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। যার মধ্যে তিনি সাত বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন

তার এ সাজা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেবল তখনই যখন নির্জন কারাবাসের সময় তার সাথে হওয়া আচরণের ফলে আন্তর্জাতিকভাবে হৈচৈ শুরু হয়।

এসব লোক, তারা কারাভোগ করুক বা না করুক তারা মুখোমুখি হয়েছিল খারাপ ব্যবহারের। সেই একই কারণে যা আমি প্রকাশ করতে সহায়তা করেছি, সেটি হলো নজরদারি। যদি তারা কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে তবে তারা 'অসন্তুষ্ট' মানুষ। তারা যদি কখনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়ে থাকে বা এ ব্যাপারে কোনো বই পড়ে থাকে তবে তারা মানসিক রোগী। তারা মদ খেলে, তাদের বলা হত যে তারা মদ্যপায়ী ছিল। তাদের যদি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক থাকে তবে তারা বিপথগামী বলে মনে করা হতো। তাদের বেশিরভাগই ঘরবাড়ি হারিয়েছে এবং দেউলিয়া হয়েছে। মূলত মতবিরোধের সাথে জড়িত থাকার কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাউকে কলুষিত করা সহজ। আর আইসির কাজ কেবল ফাইলগুলো দেখা, প্রমাণ পেশ করা এবং যেখানে কোনো প্রমাণ নেই, সেখানে কেবল একটি বানোয়াট প্রমাণ তৈরি করা।

আমি যেভাবে নিশ্চিত আমার ওপর সরকারের ক্রোধের ব্যাপারে। তেমনি আমি আমার পরিবার এবং লিন্ডসির সমর্থন সম্পর্কেও নিশ্চিত। সম্ভবত তারা আমাকে ক্ষমা করবেন না, তবে তারা আমার সাম্প্রতিক আচরণের কারণ বুঝবে। তাদের ভালোবাসার কথা স্মরণ করে আমি স্বস্তিবোধ করতাম। এটি আমাকে এই বাস্তবতার মুখোমুখি করতে সাহায্য করেছিল যে, আমার করার মতো কিছুই আর নেই। আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। আমার পরিবার এবং লিন্ডসির প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল। আর নাগরিকদের প্রতিও এই আদর্শবাদী বিশ্বাসের আশা করলাম। আমি বিশ্বাস করতাম তারা একবার আমেরিকান গণনজরদারি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে ন্যায়বিচারের জন্য আওয়াজ দেবে। তাদের নিজের জন্য ন্যায়বিচার চাইবে। তারা ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং এ প্রক্রিয়াটিতেই আমার নিজের ভাগ্যের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এটি একরকম আমার চূড়ান্ত বিশ্বাস ছিল। আমি খুব কমই কাউকে বিশ্বাস করতে পারি, তাই আমাকে সবার ওপর বিশ্বাস করতে হয়েছিল।

***

গার্ডিয়ানে আমার ভিডিওটি বের হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে, হংকংয়ে গ্রেনের নিয়মিত পাঠকদের একজন তার সাথে যোগাযোগ করে এবং দুই স্থানীয় অ্যাটর্নি রবার্ট টিব্বো এবং জনাথন ম্যানের সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দেয়, যারা আমার মামলাটি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। এই সেই ব্যক্তিরাই আমাকে মীরা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেছিল। সংবাদমাধ্যমগুলো আমাকে খুঁজে পেয়ে হোটেলটি ঘেরাও করেছিল। তখন গ্লেন

সামনের লবির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে সেখানে তাকে তৎক্ষণাৎ ক্যামেরা এবং মাইক দ্বারা ঘেরাও করা হয়। ইতোমধ্যে, আমি মীরার অন্য একটি রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, যা একটি স্কাইব্রিজের মাধ্যমে একটি মলের সাথে সংযুক্ত ছিল।

আমি রবার্টের ক্লায়েন্ট ও তার জীবনের বন্ধু হতে পেরে সন্তুষ্ট। তিনি একজন আদর্শবাদী এবং অক্লান্ত চ্যাম্পিয়ন। তার আইন পেশার চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক গুণ হলো নিরাপদ বাড়ির সন্ধানের কাজে সে বেশ পটু ছিল। হংকংয়ের প্রতিটি পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিকরা যখন আমাকে খুঁজছিল তখন সে আমাকে শহরের সবচেয়ে দরিদ্রতম একটি অঞ্চলে নিয়ে যায়। চীনের অধীনে হংকংয়ের প্রায় বারো হাজার ভুলে যাওয়া শরণার্থীদের মধ্যে তার কিছু ক্লায়েন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থিতির অনুমোদনের হার মাত্র ১ শতাংশ। আমি সাধারণত তাদের নাম প্রকাশ করতাম না, তবে যেহেতু তারা সাহসের সাথে নিজেদের সংবাদমাধ্যমের কাছে শনাক্ত করেছে, তাই আমিও তাই করব।

ফিলিপাইনের ভেনেসা মা বোডলিয়ান রোদেল এবং শ্রীলংকার অজিথ পুষ্পকুমারা, সুপুন থিলিনা কেল্লাপথা এবং নাদেকা দিলরুক্ষি নোনিস। এই উদার, মহৎ মানুষরা আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তারা আমাকে যে সহানুভূতি দেখিয়েছিল তা রাজনৈতিক ছিল না। বরং মানবিক ছিল। আমি তাদের কাছে চিরকাল ঋণী থাকব। তারা পরোয়া করেনি আমি কে ছিলাম, বা আমাকে সাহায্য করার মাধ্যমে তারা কী বিপদের মুখোমুখি হতে পারে। তারা কেবল আমাকে বিপদে সাহায্য করেছে। মারাত্মক হুমকির হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেরানোর অর্থ কী তারা খুব ভালো করেই জানত। তারা মোকাবিলা করেছে সামরিক বাহিনীর দ্বারা নির্যাতন, ধর্ষণ। তার কিছুই আমি করিনি বা করব না হয়তো।

তারা আমার মতো ক্লান্ত হয়ে যাওয়া অপরিচিত লোকটিকে তাদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। তারা যখন টিভিতে আমার মুখ দেখেছিল তখন তারা ভয় পায়নি। এর পরিবর্তে, তারা হাসল এবং আমাকে আশ্বস্ত করে আতিথেয়তা দেখাল।

তাদের জিনিসপত্র সীমিত ছিল। সুপুন, নাদেকা, ভেনেসা এবং দুটি ছোট মেয়ে মীরাতে আমার কক্ষের চেয়ে ছোট অ্যাপার্টমেন্টে বাস করত। তারা আমার সাথে তাদের যা কিছু ছিল ভাগ করে নিল। তাদেরকে আমার এ সহায়তার জন্য টাকার অফার করেছিলাম, যা তারা নিতে অস্বীকার করে। তাই আমাকে তাদের ঘরে টাকা লুকিয়ে রেখে আসতে হয়েছিল। তারা আমাকে খাবার দিয়েছে, গোসল করতে দিয়েছে, ঘুমাতে দিয়েছে এবং তারা আমাকে সুরক্ষা দিয়েছে। অল্প অল্প জিনিস থাকা লোকের দ্বারা এত বেশি দেওয়া কাকে বলে আমি তা কখনোই ব্যাখ্যা করতে সকৃষম হব না। তারা আমাকে তখন

সহায়তা করেছে যখন আমি রাস্তার বিড়ালের মতো এক কোণে বসে পাশের হোটেলগুলোর ওয়াইফাই এন্টেনার সাথে সংযোগ করছিলাম।

তাদের বন্ধুত্ব একটি উপহার ছিল। এমন মানুষ বিশ্বের জন্য একটি উপহার। আমার ভাবতে কষ্ট হয় এত বছর পরেও আজিত, সুপুন, নাদেকা এবং নাদেকার মেয়ের মামলা মুলতবি রয়েছে। হংকংয়ের আমলাদের প্রতি আমি বিরক্তি অনুভব করি যারা তাদের আশ্রয়ের প্রাথমিক মর্যাদাকে অস্বীকার করে চলেছে। এমন লোকেরা যদি রাষ্ট্রের সুরক্ষা না পায় তবে রাষ্ট্র নিজেই অযোগ্য। আশার কথা হলো ভেনেসা এবং তার মেয়ে কানাডায় আশ্রয় পেয়েছে। আমি সেদিনের অপেক্ষায় রয়েছি যখন আমি আমার হংকংয়ের বন্ধুদের নতুন বাড়িতে যেতে পারব। তারা যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে আমরা একসাথে স্বাধীনতার সুখস্মৃতি তৈরি করতে পারব।

১৪ জুন, মার্কিন সরকার আমাকে একটি অভিযোগে গোয়েন্দাগিরি আইনের আওতায় অভিযুক্ত করেছিল এবং ২১ জুন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে আমার প্রত্যর্পণের আবেদন করেছিল। আমি জানতাম আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। এছাড়া এদিন আমার ত্রিশতম জন্মদিন ছিল।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর অনুরোধ পাঠানোর পর, আমার আইনজীবীরা জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাই কমিশনারের কাছ থেকে সহায়তার জন্য আমার আবেদনের জবাব পায়। আমার জন্য তারা কিছুই করতে পারবে না। হংকং সরকার চীনের চাপে বা বিনাচাপে তার ভূখণ্ডে আমাকে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা দান করতে জাতিসংঘের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করে। হংকং আমাকে আমার বাড়ি যেতে এবং কারাগার থেকে জাতিসংঘের সাথে ডিল করতে বলছিল। আমি আমার নিজের মধ্যে ছিলাম না। আমি ছিলাম অবাঞ্ছিত। যদি আমি নিজেই ছেড়ে যেতে চাই তাহলে আমাকে এখনই চলে যেতে হবে। আমি আমার চারটি ল্যাপটপ থেকে সবকিছু সম্পূর্ণ মুছে ফেললাম এবং ক্রিপ্টোগ্রাফিক 'কী'টি ধ্বংস করে দিলাম, যার অর্থ হলো বাধ্য হলেও আমি আর কোনো ডকুমেন্ট একসেস করতে পারব না। তারপর আমি কয়েকটি জামাকাপড় প্যাক করে বের হয়ে গেলাম। 'সুগন্ধী বন্দরে' কোনো সুরক্ষা ছিল না।

মস্কো

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে উপকূলীয় দেশ, হংকং থেকে অর্ধপৃথিবী দূরের ইকুয়েডর সবকিছুর মাঝখানে অবস্থিত। রিপাবলিক অব ইকুয়েডর হিসেবেই নয় বরং সব ক্ষেত্রেই এর অবস্থান মধ্যখানে। আমার বেশিরভাগ উত্তর আমেরিকান সহকর্মী বলবে এটি একটি ছোট দেশ। কেউ কেউ হয়তো এটিকে ঐতিহাসিকভাবে নিপীড়িত বলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞান রাখেন। তবে কেউ যদি মনে করে এটি পিছিয়ে থাকা দেশ তবে তারা অজ্ঞ বলা চলে। রাফায়েল কোরিয়া ২০০৭-এ প্রেসিডেন্ট হন তথাকথিত গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক নেতাদের জোয়ারের অংশ হিসেবে। তখন ১৯৯০ ও ২০০০ দশকের গোড়ার দিকে এবং বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং ভেনিজুয়েলাতে নির্বাচন হচ্ছিল। ২০০৭ সালে রাফায়েল কোরিয়া যখন রাষ্ট্রপতি হন, তখন তার নীতিমালার লক্ষ্য ছিল অঞ্চলটিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবগুলোর বিরোধিতা করা।

একসময়ের অর্থনীতিবিদ রাষ্ট্রপতি কোরিয়ার পদক্ষেপগুলোর মধ্যে একটি ছিল যে ইকুয়েডর তার জাতীয় ঋণকে অবৈধ বিবেচনা করবে। এটি 'জঘন্য ঋণ' হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে, যা একটি স্বৈরাচারী শাসক দ্বারা আরোপিত। আর স্বৈরাচারীদের মাধ্যমে জাতীয় ঋণ সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্যনীতি দ্বারা আরোপিত। 'জঘন্য ঋণ' শোধ করা দরকারি নয়। এ ঘোষণার সাথে, রাফায়েল কোরিয়া তার লোককে কয়েক দশকের অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। এতে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বেশিরভাগ দিক নির্দেশক ফাইন্যান্সারদের সাথে শত্রুতা শুরু হয়।

ইকুয়েডর, ২০১৩ সালে, রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রতি কঠোর বিশ্বাসী ছিল। কোরিয়ার অধীনে লন্ডনে ইকুয়েডরিয়ান দূতাবাসটি, উইকিলিকসের জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। আমার দূতাবাসে থাকার ইচ্ছা ছিল না, কারণ আমি ইতোমধ্যে একটিতে কাজ করেছি। তবুও, আমার হংকংয়ের আইনজীবীগণ বলেন, পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইকুয়েডর সম্ভবত আমার রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার রক্ষার জন্য সম্ভবত সবচেয়ে ভালো দেশ। এছাড়া তার আশপাশের আধিপত্য বিস্তারকারী রাষ্ট্রদের ক্ষোভের ব্যাপারে তারা ভীত নয়। আমার ক্রমবর্ধমান সমর্থনকারী আইনজীবী, সাংবাদিক, প্রযুক্তিবিদ এবং নেতাকর্মীদের দল এতে একমত হয়। এবার আমার আশা ছিল ইকুয়েডরে ভালোভাবে পৌঁছানো।

সরকার আমাকে নজরদারি আইনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আমাকে একটি রাজনৈতিক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হলো। এ অভিযোগ দিয়ে বোঝানো হলো রাষ্ট্র নিজেই ভিক্টিম, ব্যক্তি নয়। আন্তর্জাতিক

মানবতাবাদী আইন অনুযায়ী, সরকারি হুইসেলব্লোয়ারদের সর্বত্রই প্রত্যর্পণের থেকে রক্ষা করা উচিত। বাস্তবে অবশ্য এই ঘটনা খুব কমই ঘটে। বিশেষত সরকার নিজেই যখন মনে করে তার সাথে অন্যায় হয়েছে।

আমেরিকা অন্যান্য দেশে গণতন্ত্রকে জোরদার করার দাবি করে। তবুও গোপনে ব্যক্তিগতভাবে চুক্তিকৃত বিমানবহর পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে অবৈধভাবে প্রত্যর্পণের কাজ করে। একে বলা হয় Rendition। সবাই যেটাকে বলে অপহরণ।

আমাকে সমর্থনকারী দলটি আইসল্যান্ড থেকে শুরু করে ভারতে, সর্বত্র বিভিন্ন কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছে গেল। জানতে চাওয়া হলো, তারা রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের প্রত্যর্পণের নিষেধাজ্ঞাকে সম্মান করে আমাকে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে দিবে কি না। অতঃপর শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সর্বাধিক উন্নত গণতন্ত্রও মার্কিন সরকারের ক্রোধ ডেকে আনার ভয় পেত। তারা ব্যক্তিগতভাবে তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করে। তবে আমাকে অনানুষ্ঠানিক গ্যারান্টি দিতে তারা নারাজ।

আমাকে কেবল হস্তান্তর-বহির্ভূত দেশগুলোতে অবতরণ করার উপদেশ দেয়া হলো। আর বলা হলো মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাথে সহযোগিতার রেকর্ড আছে এমন যে কোনো দেশের আকাশসীমা এড়ানো উচিত। সম্ভবত ফ্রান্সের একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন, আমাকে 'অবাধ ভ্রমণ' ইস্যু করা হলে নিরাপদ ভ্রমণ করতে পারব। জাতিসংঘের স্বীকৃত অবাধ ভ্রমণ নীতি সাধারণত সীমান্ত অতিক্রমকারী শরণার্থীদের নিরাপদ ভ্রমণের জন্য ইস্যু করা হয়। এটা পাওয়া সহজ হলেও এর বাস্তবায়ন বেশ কঠিন।

সারাহ হ্যারিসন, একজন সাংবাদিক ও উইকিলিকস এর একজন সম্পাদক। যে মুহূর্তে এই সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ে যে, একজন আমেরিকান বিশ্বব্যাপী গণনজরদারি ব্যবস্থা ফাঁস করেছে, তিনি তখনই হংকং ছুটে আসেন। ওয়েবসাইট এবং বিশেষত অ্যাসাঞ্জের ভাগ্য নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার পরেও তিনি আমাকে বিশ্বের সেরা আশ্রয়ের পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হংকংয়ের আইনী সম্প্রদায়ের সাথেও তার পারিবারিক সংযোগ ছিল।

মানুষজন আমাকে এসেঞ্জের দীর্ঘকালীন সহায়তা দেওয়ার ইচ্ছাকে স্বার্থপর উদ্দেশ্য বলছিল। তবে আমি বিশ্বাস করি যে তিনি সত্যিই আমাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আমাকে গ্রেফতার এড়াতে সহায়তা করেছিলেন। এতে মার্কিন সরকারকে পাল্টা আঘাত করা তাঁর জন্য কেবল একটি বোনাস, সুবিধা ছিল, লক্ষ্য নয়। এটি সত্য যে আমাদের প্রথম মেসেজে কথা বলার পর আমি তার সাথে আর কখনও যোগাযোগ করি নি।

তবে তিনি নিজেকে জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক যোদ্ধা মনে করেন। এমন একটি যুদ্ধ যা জয়ের জন্য তিনি সব করতে প্রস্তুত। এই কারণেই তার সহায়তাকে নিছক ষড়যন্ত্র বা স্ব-প্রচার বলে মনে করি না। তাঁর

কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই সংগঠনের সর্বাধিক বিখ্যাত সূত্র, মার্কিন সেনা সদস্য চেলসা ম্যানিংয়ের পাল্টা উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করা। চেলসা, যার পঁয়ত্রিশ বছরের জেলের সাজা ঐতিহাসিকভাবে নজিরবিহীন ছিল। এই সাজা ছিল সর্বত্র হুইসেলব্লোয়ারদের প্রতি কঠোরভাবে দমনমূলক। যদিও আমি কখনই অ্যাসাঞ্জের সূত্র ছিলাম না এবং কখনোই হব না। তবে আমার পরিস্থিতি তাকে একটি ভুল সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছিল। ম্যানিংকে বাঁচানোর জন্য তিনি কিছু করতে পারেননি। তবে সারার মাধ্যমে আমাকে বাঁচানোর জন্য তিনি ছিলেন দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

আমি প্রথমে সারার সম্পৃক্ততার ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম। তবে লরা আমাকে বলেছিল সারা খুব দক্ষ, দৃঢ় এবং স্বাধীন। সে ছিল উইকিলিকসের অন্যতম ব্যক্তি যারা অ্যাসাঞ্জের সাথে প্রকাশ্যে দ্বিমত পোষণ করার সাহস করেছিলেন। সতর্কতা সত্ত্বেও, আমি একটি কঠিন অবস্থানে ছিলাম। হেমিংওয়ে একবার লিখেছিলেন, মানুষকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার উপায় তাদেরকে বিশ্বাস করা।

লরা আমাকে হংকংয়ে সারার উপস্থিতি সম্পর্কে জানানোর একদিন বা তার আগে একটি এনক্রিপ্ট করা চ্যানেলে আমার সাথে সারার কথা হয়েছিল, যা আসলে তার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতের আগে মাত্র দুদিন ছিল। যদি তারিখ বলতে কিছুটা ভুল হয়ে থাকে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। হংকংয়ে আসার পর থেকেই সারাহ ঘূর্ণিঝড়ের মতো ছিল। যদিও সে আইনজীবি ছিল না, তবে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে সে অনেক কিছুই জানত।

সে হংকংয়ের মানবাধিকার অ্যাটর্নিদের সাথে সাক্ষাৎ করে। আমি তার গতি এবং তার পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। উইকিলিকসের মাধ্যমে তার সংযোগ এবং লন্ডনে ইকুয়েডরিয়ান দূত ফিদেল নার্ভেজের অসাধারণ সাহসের কারণে আমার নামে একটি laissez-passer বা অবাধ ভ্রমণ ইস্যু করা হয়। এ অবাধ ভ্রমণ আমাকে ইকুয়েডরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। তা জরুরি ভিত্তিতে দূত দ্বারা জারি করা হয়েছিল। যেহেতু তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের সময় আমাদের হাতে নেই। এটি হাতে আসার সাথেই সারা আমাদের বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ভ্যান ভাড়া করে।

এভাবেই আমার তার সাথে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাইলাম। তবে এর পরিবর্তে আমি প্রথমে বলেছিলাম, 'আপনি শেষ কখন ঘুমিয়েছিলেন?'

সারাহকে আমার মতো ঠিক ক্লান্ত এবং দিশেহারা লাগছিল। সে জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। যেন উত্তরটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। শুধু মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি না'।

খুব সতর্কতার সাথে আমাদের এই কথোপকথনটি ছিল হাঁচি এবং কাশি দ্বারা আক্রান্ত। তার নিয়োগদাতার আদর্শিক দাবির চেয়ে তার বিবেকের প্রতি আনুগত্যের কারণে সে আমাকে সমর্থন করার উৎসাহ পায়।

অবশ্যই তার রাজনৈতিক চিন্তা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রতি অ্যাসাঞ্জের বিরোধিতা দ্বারা কম প্রভাবিত ছিল। তার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সমসাময়িক সাংবাদিকতা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার পরিবর্তে সরকারি স্বার্থ পূরণ করছিল। আমরা বিমানবন্দরে যাওয়ার সাথে সাথে পাসপোর্ট চেকিং করার পর আমি চাচ্ছিলাম সে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করুক। চাচ্ছিলাম অ্যাসাঞ্জের বা সংগঠনের ব্যাপারে কিছু বলুক। তবে সে কখনোই জিজ্ঞেস করেনি। তবে সে বলল, জনসাধারণের কাছে সত্য তুলে ধরার জন্য আমি মিডিয়ার ওপর বিশ্বাস করে বোকামি করেছি। তার সোজাসাপ্টা কথার জন্য এবং আরো অনেক কারণে আমি সবসময় সারাহর সততার প্রশংসা করব

আমরা একটি সাধারণ কারণে মস্কো, হাভানা, কারাকাস হয়ে কুইটো, ইকুয়েডর যাচ্ছিলাম। এটি ছিল একমাত্র নিরাপদ রুট। হংকং থেকে কুইটোতে সরাসরি কোনো বিমান ছিল না এবং সংযুক্ত অন্যান্য সমস্ত ফ্লাইটই মার্কিন আকাশসীমা দিয়ে ভ্রমণ করেছিল। আমি রাশিয়ার বিশাল বিস্তৃতি সম্পর্কে চিন্তিত ছিলাম। হাভানার ফ্লাইটটি ছাড়ার প্রায় বিশ ঘণ্টা আগে আমার প্রাথমিক ভয়টি ছিল আসলে রাশিয়া থেকে কিউবার যাত্রা। অর্থাৎ ন্যাটো আকাশসীমা পেরিয়ে যাওয়া। পোল্যান্ডের মতো দেশের উপর দিয়ে যাবার সময় মনে পড়ল এই দেশ মার্কিন সরকারকে খুশি করার জন্য সবকিছু করেছে। এরা সিআইএ'র ব্ল্যাক সাইটগুলো হোস্ট করেছে। যেখানে আমার প্রাক্তন আইসি সহকর্মীরা বন্দিদের 'অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ' করত। এটি ছিল বুশ-যুগের আরেকটি অত্যাচার কৌশল।

কেউ যেন চিনতে না পারে তাই আমি আমার টুপিটি আমার চোখের উপর দিয়ে রেখেছিলাম। সারা সামনে খেয়াল রাখছিল। সে আমার হাত ধরে গেটে নিয়ে গেল। সেখানে আমরা প্লেনে উঠার আগে অপেক্ষা করছিলাম।

আমি তাকে বললাম, 'আপনার এই কাজ করতে হবে না'।

'কোন কাজ?'

'আমাকে এভাবে নিরাপত্তা দেয়ার কাজ। '

সারাহ শক্তভাবে বলল, 'একটা জিনিস স্পষ্ট করে বলি, আমি আপনাকে রক্ষা করছি না। কেউই আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি এখানে যা করছি তা হলো কেউ যাতে হস্তক্ষেপ না করে। আমি চাই সবাই ভালো আচরণ করুক'।

'তাহলে আপনি আমার সাক্ষী', আমি বললাম।

সে সামান্য বাঁকা হাসি দিয়ে বলল, 'কেউ তো শেষ ব্যক্তি হতে হবে যে আপনাকে জীবিত দেখেছে। হতে পারে এটি আমি। '

যে তিনটি পয়েন্টে আমাদের সম্ভবত থামার সম্ভাবনা ছিল সেগুলো এখন আমাদের পিছনে (চেক-ইন, পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণ এবং গেট)। প্লেনে উঠে নিরাপদ বোধ করলাম। আমি জানালার পাশের সিটে বসলাম। সারাহ অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে আমাকে আড়াল করতে আমার পাশে বসেছিল। তারপর আমার মনে হচ্ছিল অনন্তকালের পথ শুরু হয়েছে। কেবিনের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, স্কাইব্রিজটি টেনে সরানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্লেনটি চলতে শুরু করে। তবে প্লেনটি টারম্যাক থেকে রানওয়েতে ঘুরানোর ঠিক আগেই একটু থামল। আমি সাইরেনের শব্দ বা নীল আলো জ্বলার জন্য অপেক্ষা করলাম। মনে হচ্ছিল অপেক্ষার খেলা চলছে। এমন অপেক্ষা যা শেষ হবে না।

হঠাৎ করে, প্লেন চলতে শুরু করে ও মোড় নেয়। তখন বুঝতে পারি আমরা টেক অফের জন্য লাইনে এসেছি। প্লেনের চাকা জমিন থেকে ওঠার সাথে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যেন আগুন থেকে বেরিয়ে এসেছি। প্লেন উড়ার পর আমার লাকি রুবিকস কিউব ব্যাগ থেকে বের করার ইচ্ছা হলো। তবে জানতাম এটি সম্ভব না। এতে সবার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে যাব। আমি ফিরে বসলাম। আমার অর্ধ-খোলা চোখদ্বয় সামনে সিটব্যাকের স্ক্রিনে রাখলাম। চীন, মঙ্গোলিয়া এবং রাশিয়াজুড়ে রুটটি ট্র্যাক করছে। এই দেশগুলো মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কারণে কোনো অনুগ্রহ করবে না।

তবে, আমরা জানতাম না একবার অবতরণ করার পরে রাশিয়ান সরকার কী করবে। তারা আমার খালি ল্যাপটপ এবং খালি ব্যাগে অনুসন্ধান করতে পারে। আমি আশা করেছিলাম খুব আক্রমণাত্মক কিছু হবে না কারণ বিশ্ব দেখছে। তাছাড়া আমার আইনজীবী এবং উইকিলিকসের আইনজীবীরা আমাদের ভ্রমণপথ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন।

চাইনিজ আকাশসীমায় প্রবেশ করেই সারাহকে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি আমাকে কেন সাহায্য করছেন?'

সে চাপা গলায় বলল সে চায় আমার সাথে সবকিছু ভালো হোক। আমি তার বিচক্ষণতা ও শ্রদ্ধার হিসেবে এই উত্তরটি গ্রহণ করি। আমি আশ্বস্ত হয়ে অবশেষে কিছু সময় ঘুমাতে পারলাম।

আমরা ২৩ জুন শেরেমেতিয়েভোতে ল্যান্ড করি। আমরা ভেবেছিলাম এটি বিশ-ঘণ্টা যাত্রাবিরতি হবে। অথচ এটি এখন ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে। নির্বাসন একটি অন্তহীন যাত্রাবিরতি।

আইসি এবং বিশেষত সিআইএতে, আপনি কাস্টমসে কীভাবে সমস্যা এড়াবেন সে সম্পর্কে প্রচুর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আপনি কেমন পোশাক পরবেন, কেমন কাজ করবেন এসব চিন্তা করতে হয়।

আপনার ব্যাগের জিনিসপত্র এবং আপনার পকেটে থাকা জিনিসপত্রের ব্যাপারে আপনাকে ভাবতে হবে। তারা আপনার সম্পর্কে কেমন গল্প বলবে সে সম্পর্কেও আপনাকে ভাবতে হবে। আপনার লক্ষ্য হলো নিখুঁতভাবে বিরক্তিকর

ব্যক্তি হবার অভিনয় করা। যাতে কী আপনাকে মনে না রাখে। তবে আপনার পাসপোর্টের নাম যখন সব খবরে ছড়িয়ে পড়ে তখন এসবের কিছুই কাজে আসে না।

আমি আমার ছোট্ট নীল বইটি পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণ বুথের দাড়িওয়ালা লোকের হাতে তুলে দিলাম। তিনি এটি স্ক্যান করে এর পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। সারাহ আমার পিছনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াল। আমাদের খুব বেশি সময় লাগলো। তারপরে লোকটি তার ফোনে রাশিয়ান ভাষায় কিছু কথা বলল। কিছু সময়ের মধ্যেই দুজন অফিসার এলো। সামনের অফিসারটি বুথের লোকটির কাছ থেকে আমার ছোট্ট নীল বইটি নিয়ে আমাকে বলল, 'পাসপোর্ট সমস্যা আছে। দয়া করে, আমার সাথে আসুন।'

সারাহ দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, 'আমি তার আইনি পরামর্শদাতা. যেখানেই সে যাবে, আমিও যাব।'

তারপর সে জাতিসংঘের চুক্তি এবং জেনেভা ক্রোড়পত্র থেকে আইনি উদ্ধৃতি দেওয়ার আগে, কর্মকর্তা লাইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি আসো।' কর্মকর্তা কোনো ঝামেলা করতে চাননি।

দুজন নিরাপত্তা অফিসার আমাদেরকে শেরেমেতিয়েভোর বিজনেস লাউঞ্জগুলোর মধ্যে একটিতে নিয়ে গেল। সেখানে কিছু যাত্রী বসে ছিলেন। সারাহ এবং আমি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখান থেকে একটি কনফারেন্স রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। একটি টেবিলের চারপাশে ধূসর চুলের বেশ কজন পুরুষ বসে ছিল। তাদের মধ্যে অর্ধ-ডজন বা তারও বেশি লোকের ছিল সামরিক বাহিনী স্টাইলের চুলকাটা।

এক লোক আলাদাভাবে বসে ছিলেন। তার হাতে কলম ছিল, তিনি নোট নিচ্ছিলেন। আমি অনুমান করেছি তিনি সচিব হবেন। তার সামনে কাগজের প্যাডযুক্ত একটি ফোল্ডার ছিল। ফোল্ডারের প্রচ্ছদে একটি 'মনোকোলার ইনসিগনিয়া' ছিল যা বুঝতে আমার রাশিয়ান ভাষা জানা দরকার পড়েনি। এটি ছিল তলোয়ার এবং ঢাল। এটি রাশিয়ার গোয়েন্দা সার্ভিস, ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি) এর প্রতীক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআইয়ের মতো এফএসবি কেবল গুপ্তচরবৃত্তি এবং তদন্ত করার জন্যই নয়, গ্রেপ্তার করার কাজও করে।

টেবিলের কেন্দ্রস্থলে একজন স্যুট পরা বয়স্ক লোক বসে ছিল। তার চুলের সাদা রং জ্বলজ্বল করছিল। তিনি সারাহ এবং আমাকে বেশ কর্তাব্যক্তির মতো হাতের ইশারায় তার বিপরীতে বসাতে বললেন। তার হাসি দেখে তাকে পাকা কেইস অফিসার মনে হলো। এ পদটি কোনো সিও-এর সমতুল্য পদ। গোটা বিশ্বব্যাপী গোয়েন্দা সেবা এমন নিবেদিতপ্রাণ অভিনেতা দিয়ে পূর্ণ যারা কোনো সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন আবেগপূর্ণ কথাবার্তা ব্যবহার করে থাকে।

তিনি তার গলা পরিষ্কার করলেন আমাকে ভদ্রভাবে ইংরেজিতে কথা বললেন। সিআইএ যেটাকে বলে cold pitch। এটি মূলত একটি বিদেশি গোয়েন্দা এজেন্সির অফার। অর্থাৎ 'আসুন এবং আমাদের জন্য কাজ করুন'। সহযোগিতার বিনিময়ে বিদেশিরা সহায়তা চাইত। যা হতে পারে টাকা দিয়ে জেল থেকে মুক্ত থাকা বা জালিয়াতি থেকে হত্যা করার প্রায় কাছাকাছি কিছু। অবশ্যই, বিদেশিরা সর্বদা বিনিময়ে সমান বা আরো ভালো মানের কিছু আশা করে। খুব পরিষ্কার লেনদেন। একে কোল্ড পিচ বলা হয়, কারণ এতে সহানুভূতির শব্দ দিয়ে কথা শুরু হয়।

আমি জানতাম তাকে কীভাবে থামাতে হবে। আপনি যদি তখনই কোনো বিদেশি গোয়েন্দা অফিসারকে না থামান তবে আপনি তাদের অফারটি প্রত্যাখ্যান করেছেন কি না তা বিবেচ্য হবে না। কারণ তারা আপনার রেকর্ডিং ফাঁস করে আপনার খ্যাতি নষ্ট করতে পারে। লোকটি আমাদের অসুবিধার জন্য ক্ষমা চাইল। আমি কল্পনা করছিলাম লুকিয়ে থাকা ডিভাইস আমাদের রেকর্ড করছে। আমার প্রতিটা শব্দ সাবধানতার সাথে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

'শুনুন, আমি বুঝতে পারছি আপনি কে এবং কী চান,' আমি বললাম। 'দয়া করে আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন আপনাকে সহযোগিতা করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমি কোনো গোয়েন্দা সংস্থাতে সহযোগিতা করতে যাচ্ছি না। আমি কোনো অসম্মান করছি না। তবে এটি সেই রকমের বৈঠক হতে পারে না। আপনি যদি আমার ব্যাগ অনুসন্ধান করতে চান, তাহলে এটি ঠিক এখানেই আছে', আমার চেয়ারের নিচে ইশারা করলাম।

'কিন্তু আমি আপনাকে সত্যি বলছি, এখানে কিছুই আপনাকে সহায়তা করার মতো নেই।' আমার কথায় লোকটির চেহারা বদলে গেল। তাকে বেশ হতাশ মনে হলো।

'না, আমরা কখনোই তা করব না,' তিনি বললেন। 'দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন, আমরা শুধু আপনাকে সহায়তা করতে চাই।'

সারাহ তার গলা পরিষ্কার করে বলল, 'আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরা আমাদের ফ্লাইট ধরতে চাই।'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল 'আপনি উনার আইনজীবী?'

'আমি তার আইন উপদেষ্টা,' সারাহর উত্তর।

লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আপনি রাশিয়ায় থাকার জন্য আসছেন না?'

'না।'

'তাহলে আমি কী জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনি কোথায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন? আপনার শেষ গন্তব্য কোনটা?'

আমি বলেছিলাম, 'কারাকাস হয়ে হাভানা হয়ে কুইটো, ইকুয়েডর।'

যদিও আমি জানতাম যে সে ইতোমধ্যে উত্তরটি জানে। তার কাছে অবশ্যই আমাদের ভ্রমণপথের একটি কপি ছিল যেহেতু সারাহ এবং আমি হংকং থেকে এরোফ্লোটে ভ্রমণ করেছিলাম। এখন কথোপকথনটি অন্যদিকে মোড় নিল।

'আপনি শোনেননি?' তিনি বললেন। তিনি দাঁড়িয়ে আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে তিনি পরিবারের কারো মৃত্যুর খবর দিচ্ছিলেন। 'আমি আপনাকে অবহিত করা জরুরি মনে করছি যে আপনার পাসপোর্টটি অবৈধ।'

আমি শুনে অবাক হলাম, ভেঙে পড়লাম।

'আমি দুঃখিত, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করি না।'

লোকটি টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'না, এটা সত্য। আমাকে বিশ্বাস করো। এটি আপনাদের মন্ত্রী জন কেরির সিদ্ধান্ত। আপনার পাসপোর্ট আপনার সরকার বাতিল করেছে এবং বিমান পরিষেবাকে আপনাকে ভ্রমণ করার অনুমতি না দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

আমি নিশ্চিত যে, এটি একটি কৌশল ছিল। তবে এটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না। আমি বললাম, 'আমাদের এক মিনিট সময় দিন।'

আমি বলার আগেই সারাহ তার ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করে বিমানবন্দরের ওয়াইফাই খুঁজছিল।

'অবশ্যই, আপনি যাচাই করুন।' লোকটি সহকর্মীদের দিকে ফিরে তাদের সাথে রাশিয়ান ভাষায় কথাবার্তা বলল।

সারাহর চেক করা প্রতিটি সাইটে এ ব্যাপারে রিপোর্ট করা হয়েছিল। আমি হংকং ছেড়ে চলে যাচ্ছি এই খবরটি প্রকাশ হওয়ার পর মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর আমার পাসপোর্ট বাতিল ঘোষণা করে। এটা আমার অবাধ ভ্রমণ প্রত্যাহার করে যখন আমি আকাশে ছিলাম।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার নিজের সরকার আমাকে রাশিয়ায় আটক করে রেখেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই পদক্ষেপটি কেবল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফল। আপনি যখন কোনো পলাতককে ধরার চেষ্টা করছেন, তখন ইন্টারপোল সতর্কতা জারি করে তাদের পাসপোর্ট বাতিল করা একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি। তবে চূড়ান্তভাবে এটি স্ব-পরাজয় ছিল। কারণ এর ফলে রাশিয়া প্রোপাগান্ডা বিজয় অর্জন করে।

'এটা সত্য,' সারাহ তার মাথা নেড়ে বলল।

'তাহলে তুমি কি করবে?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

আমি আমার পকেট থেকে ইকুয়েডরিয়ান নিরাপদ ভ্রমণের পাস দেওয়ার আগেই, সারাহ বলল 'আমি দুঃখিত, তবে আমি মিস্টার স্নোডেনকে আর কোনো প্রশ্নের উত্তর না দেয়ার পরামর্শ দিব।'

লোকটা আমাকে দিকে ইশারা করে বলল, 'আপনি আসুন।'

তার পেছনে কনফারেন্স রুমে গেলাম। সেখানে একটি জানালা ছিল। আমি গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালাম। প্রায় তিন বা চার তলা নিচে দেখলাম আমার দেখা সবচেয়ে বড় মিডিয়া জটলা। ক্যামেরা এবং মাইক হাতে চালিত সাংবাদিকদের বেশ বড়সড় জটলা।

খুব মজাদার অনুষ্ঠান মনে হচ্ছিল। সম্ভবত এফএসবি এ আয়োজন করেছে, সম্ভবত না। আমি জানতাম সারাহ এবং আমাকে এই কনফারেন্স রুমে কেনো নিয়ে আসা হয়েছিল।

আমার চেয়ার ফিরে গেলাম কিন্তু বসলাম না।

লোকটি জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তির জন্য বন্ধু ছাড়া জীবনযাত্রা খুব কঠিন হতে পারে।' তারপর আমি যা ভেবেছিলাম তাই হলো। এবার এলো সরাসরি অনুরোধ। সে বলল, 'যদি বলার মতো কিছু তথ্য থাকে আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন?'

'আমরা নিজেরা দেখে নিব।' আমি বললাম। সারাহ আমার পাশে এসে দাঁড়াল। লোকটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। রাশিয়ান ভাষায় বিড়বিড় করে কিছু বলল। তারপর সে ও তার সহকর্মীরা চলে গেল।

যাবার আগে আমাকে বলল, 'আমি আশা করি আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে আফসোস করবেন না।' সে চলে যাবার পরই বিমানবন্দর প্রশাসন থেকে দুজন অফিসার ভেতরে এলো।

আমি হাভানার ফ্লাইটের জন্য গেটে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার দাবি জানালাম। তারা তা অগ্রাহ্য করে। আমি আমার ইকুয়েডরিয়ান নিরাপদ ভ্রমণের পাস দিলে তারা সেটাও উপেক্ষা করে।

আমরা চল্লিশ দিন এবং চল্লিশ রাত এয়ারপোর্টে আটকে ছিলাম। এই দিনগুলোতে আমি রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য মোট সাতাশটি দেশে আবেদন করি। তাদের মধ্যে একটিও আমেরিকান চাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজি ছিল না। কিছু দেশ একেবারেই প্রত্যাখ্যান করে। অন্যরা বলল, আমি তাদের দেশে যাবার পূর্ব পর্যন্ত তারা আমার অনুরোধ বিবেচনা করতে অক্ষম। আর এ কাজ অসম্ভব। একমাত্র বার্গার কিং আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। সে কখনোই আমাকে না করেনি।

এয়ারপোর্টে আমার উপস্থিতি একটি বৈশ্বিক খবর হয়ে গেল। রাশিয়ানদের জন্য এটি একটি উপদ্রব ভাবছিল। ১ জুলাই, বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি ইভো মোরালেস বার্ষিক GECF বা Gas Exporting Countries Forum এ অংশ নেওয়ার পরে মস্কোর ভানুকোভোর একটি বিমানবন্দর ত্যাগ করেন তার বলিভিয়ার রাষ্ট্রীয় বিমানে করে। রাষ্ট্রপতি মোরালেসের সংহতি প্রকাশের কারণে আমি প্লেনে উঠেছি বলে মার্কিন সরকার সন্দেহ করে। মার্কিন সরকার ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন এবং পর্তুগাল সরকারকে তাদের আকাশসীমায় সেই

বিমান প্রবেশ করতে দিতে নিষেধ করে এবং এটিকে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় নিতে সফল হয়। সেখানে অনুসন্ধান করে যখন আমার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া না গেল না তখনই মার্কিন সরকার থামে। এটি ছিল সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন যা জাতিসংঘের তিরস্কার লাভ করে। ঘটনাটি রাশিয়ার জন্য অপমানজনক ছিল। কারণ এটি কোনো পরিদর্শনকারী রাষ্ট্রপ্রধানের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারেনি।

রাশিয়াকে এবং আমাকে বোঝানো হলো, যে আমেরিকা যে প্লেনে আমাকে সন্দেহ করবে, সেটি একই সাথে ডাইভার্টেড এবং গ্রাউন্ড হওয়ার ঝুঁকি ছিল। রাশিয়ান সরকার আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ মিডিয়ার লোকেরা দেশের প্রধান বিমানবন্দরটির প্রবেশপথ বন্ধ করে দাঁড়াত। ১ আগস্ট রাশিয়া আমাকে অস্থায়ী আশ্রয় দেয়। সারাহ এবং আমাকে শেরেমেতিয়েভো ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কেবল একজনই বাড়ি ফিরতে পারে। আমাদের একসাথের এই সময়টা চিরজীবনের বন্ধু হিসেবে আমাদেরকে একত্রিত করে। সারাহ প্রতিটা সময় আমার পাশে থেকে যে কটা সপ্তাহ কাটিয়েছিল, তার সেই আন্তরিকতা এবং তার দৃঢ়তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

লিন্ডসি মিলসের ডায়েরি

আমি বাসা থেকে যত দূরে ছিলাম তত লিন্ডসিকে ঘিরে আমার চিন্তা ছিল। আমি তার গল্প বলতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছি। আমি চলে যাওয়ার পরে তাকে যেসবের মুখোমুখি হতে হয়েছিল-এফবিআই জিজ্ঞাসাবাদ, নজরদারি, সংবাদমাধ্যমের মনোযোগ, অনলাইন হয়রানি, বিভ্রান্তি এবং ব্যথা, রাগ, কষ্ট। আমি বুঝতে পারলাম যে সেই সময়ের বর্ণনা কেবল লিন্ডসির নিজেরই দেয়া উচিত। তার চেয়ে অন্য কারোও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই, আর অন্য কারোও অধিকার নেই। ভাগ্যক্রমে, লিন্ডসি কৈশোরকাল থেকেই ডায়েরি রাখে। এটি তার জীবনকে রেকর্ড করতে এবং তার শিল্পের খসড়া তৈরি করতে ব্যবহার করে। সে অনুগ্রহপূর্বক কয়েকটা পৃষ্ঠা এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। সবার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে (পরিবারের নাম বাদে)। কিছু সম্পাদনা করা হয়েছে। আর নয়তো আমি হাওয়াই ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্ত থেকে এভাবেই ছিল লিন্ডসির দিনকাল।

২২-০৫-২০১৩
কে-মার্টে লেই ফুল কেনার জন্য থামলাম। খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ওয়েন্ডিকে স্বাগত জানানোর চেষ্টা করলাম। তবে ভেতরে ভেতরে আমি খুব চিন্তিত। এড কয়েক সপ্তাহ ধরে তার মা আসবেন বলে পরিকল্পনা করছিল। সেই তাকে আসতে বলেছে। আমি আশা করছিলাম আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠেই এডকে দেখতে পাব। এয়ারপোর্ট থেকে ওয়াইপাহু আসার পুরোটা পথ ওয়েন্ডি চিন্তিত ছিল। তাকে না জানিয়ে এড চলে গিয়েছে এমন কখনো হয়নি। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম এটি স্বাভাবিক বিষয়। তবে এটা স্বাভাবিক ছিল যখন আমরা বিদেশে থাকতাম। হাওয়াইয়ের ক্ষেত্রে নয়। এড দূরে কোথাও গিয়েছে কিন্তু যোগাযোগ করেনি এমন কোনো সময় আমি মনে করতে পারি না। আমরা নিজেদের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য ডিনারে গেলাম। ওয়েন্ডি ভেবেছিল এড মেডিকেল লিভে আছে। এটি তার বোধগম্য হয়নি যে, মেডিকেল লিভে থাকার সময় এডকে কাজের জন্য ডাকা হবে। বাসায় ফিরে ওয়েন্ডি ঘুমোতে গেল। আমি আমার ফোন চেক করে দেখলাম আমার ফোনে অপরিচিত নাম্বার থেকে তিনটি মিসড কল এবং একটি লম্বা বিদেশি নম্বর থেকে একটি মিসড কল। কোনো ভয়েসমেইল নেই। আমি গুগল করলাম। এড নিশ্চয়ই হংকংয়ে আছে।

২৪-০৫-২০১৩

ওয়েন্ডি সারা দিন বাড়িতে একা ছিল। তার মস্তিষ্কে নানান চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তার জন্য খারাপ লাগল। এড আমার নিজের মাকে যেভাবে আপ্যায়ন করত তা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। রাতের খাবারের সময়, ওয়েন্ডি আমাকে এডের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তার নিজেরও এপিলেপ্সির ইতিহাস আছে। সে বলল সে চিন্তায় আছে। তারপরে সে কাঁদতে শুরু করে তখন আমিও কাঁদতে শুরু করি। আমি বুঝতে পারলাম আমিও খুব চিন্তিত তবে এপিলেপ্সির পরিবর্তে আমি ভাবছি, যদি তার কোনো এফেয়ার থাকে? সে কে?

০৩-০৬-২০১৩

এয়ারপোর্টে ওয়েন্ডিকে বিদায় দিতে এসেছি। সে ম্যারিল্যান্ড ফিরে যাবে। সে ফিরে যেতে চায়নি, তবে তার কাজ আছে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। তাকে ছাড়তে চাইলাম না। তারপর সে সিকিউরিটি চেকের জন্য জন্য লাইনে দাঁড়াল। বাসায় ফিরে এসে এডের স্কাইপের স্ট্যাটাস পরিবর্তিত দেখলাম। 'দুঃখিত, তবে এটি করা উচিত ছিল।' কখনোই বা সে এটি পরিবর্তন করল আমি জানি না। হতে পারে আজ, হতে পারে গত মাসে। আমি কেবল স্কাইপে পাগলের মতো তার মেসেজের অপেক্ষা করেছিলাম

০৭-০৬-২০১৩

এনএসএর স্পেশাল এজেন্ট মেগান স্মিথের কাছে ফোন এলো। তিনি কল ব্যাক করতে বললেন এড সম্পর্কে জানার জন্য। আমার তখনো জ্বর ছিল। আমাকে অটোবডি শপে আমার গাড়ি দিতে হয়েছিল। টড তার গাড়িতে করে আমার ফেরার ব্যবস্থা করে দিল। আমরা যখন রাস্তায় আসলাম তখন দেখলাম ড্রাইভওয়েতে একটি সাদা সরকারি গাড়ি এবং সরকারি গোয়েন্দারা আমাদের প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলছে। আমি প্রতিবেশীদের কখনো দেখিনি। কেন জানি না তবে আমি টডকে গাড়ি চালিয়ে যেতে বললাম। আমি আমার পার্সে কিছু সন্ধান করার ভান করতে মাথা নিচু করে ফেললাম। আমরা স্টারবাকসে গেলাম। সেখানে টড একটি সংবাদপত্রে এনএসএ সম্পর্কে কিছু দেখাল।

শিরোনাম পড়ার চেষ্টা করে থমকে গেলাম। সেই কারণেই কি সাদা গাড়ি আমার ড্রাইভওয়েতে ছিল? এই স্টারবাকসের বাইরের পার্কিং-এ কী একই সাদা গাড়ি ছিল?

আমার কী এই জিনিস লেখা উচিত? বাড়িতে চলে গেলাম। সাদা গাড়ি চলে গেল। কিছু ওষুধ খাওয়ার পর মনে হলো আমি কিছু খাইনি। দুপুরের খাবার খাওয়ার মাঝামাঝি সময়ে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে পুলিশ দেখতে পেলাম। শুনতে পেলাম তারা রেডিওতে বলছে, কেউ বাসার ভিতরে আছে। কেউ বলতে আমাকে বোঝানো হয়েছে। আমি সদর দরজা খুলে দিলে দুজন

গোয়েন্দা ও একজন HPD বা হাওয়াই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা এলো। তারা দেখতে ভয়ানক ছিল। এইচপিডি অফিসার বাড়িতে তল্লাশি চালায়। এজেন্ট স্মিথ আমাকে এড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

এড ৩১ মে কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার কথা। এইচপিডি অফিসার বললেন, কোনো ব্যক্তির স্ত্রী বা প্রেমিকা নিখোঁজ হওয়ার আগে সেই ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টা সন্দেহজনক সে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন আমি এডকে খুন করেছি। সে এডের শরীরের জন্য বাড়ির চারপাশে খোঁজ করল। এজেন্ট স্মিথ জিজ্ঞাসা করে সে বাড়ির সমস্ত কম্পিউটার দেখতে পারবে কি না। এতে আমার খুব রাগ উঠে। আমি তাকে বললাম সে ওয়ারেন্ট নিয়ে আসুক। তারা বাসা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু এক কোণে তাদের ক্যাম্প খুলল।

০৮-০৬-২০১৩

সান দিয়েগো,

আমি ভয় পাচ্ছিলাম এনএসএ আমাকে আইল্যান্ড ছেড়ে যেতে দিবে না। বিমানবন্দরের টিভিগুলো এনএসএ সম্পর্কিত সব সংবাদে ভরপুর ছিল। প্লেনে ওঠার পরে আমি এজেন্ট স্মিথ এবং এইচপিডি মিসিং পার্সনদের গোয়েন্দাকে ইমেইল করে বললাম, আমার দাদির ওপেন হার্ট সার্জারি হবে। আমাকে কয়েক সপ্তাহের জন্য আইল্যান্ডের বাইরে যেতে হবে। সার্জারি মাসের শেষ এক্সিকে ফ্লোরিডায় হবে। আমি শুধু আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সান্ড্রার সাথে থাকতে চাচ্ছিলাম। সামনে তার জন্মদিনও। প্লেনের চাকা যখন মাটি ছেড়ে যায় তখন আমি স্বস্তি পাই। প্লেন থেকে নামার পর আমার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। সান্ড্রা আমাকে রিসিভ করে। আমি তাকে কিছুই বলিনি তবে সে বুঝতে পারল কিছু একটা হয়েছে। সে বুঝল আমি শুধু তার জন্মদিন উপলক্ষে আসিনি। এড এবং আমি ব্রেকআপ করেছি কি না জিজ্ঞেস করল। আমি উত্তর দিলাম, হয়তো।

০৯-০৬-২০১৩

টিফানি ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করল আমি কী করছি এবং সে আমার ব্যাপারে চিন্তিত। আমি কিছুই বুঝলাম না। সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে জিজ্ঞেস করল আমি খবরটা দেখেছি কি না। তারপর সে আমাকে বলল এড একটি ভিডিও করেছে। সেটি হাফিংটন পোস্টের হোমপেজে আছে। সান্ড্রা তার ল্যাপটপ ফ্ল্যাটস্ক্রিনের সাথে সংযোগ দিল। আমি শান্তভাবে ১২ মিনিটের ইউটিউব ভিডিওটি লোড হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তারপরে তাকে দেখলাম। সত্যি, দেখলাম। সে জীবিত আছে। আমি অবাক হলাম। তাকে দেখতে শুকনো লাগছিল। কিন্তু তাকে সেই পুরাতন এড মনে হচ্ছিল, সেই আত্মবিশ্বাসী ও দৃঢ় এড। ঠিক যেরকম সে এই একটি কঠিন বছরের আগে ছিল। এই ব্যক্তিটিকেই

আমি ভালোবাসতাম। সান্ড্রা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমরা চুপ করে রইলাম।

মেক্সিকান সীমান্তের পাশে শহরের দক্ষিণে সুন্দর পাহাড় ঘেরা এলাকায় সান্দ্রার কাজিনদের বাড়িতে সান্দ্রার জন্মদিনের বিবিকিউ-তে গেলাম। জায়গাটা সুন্দর কিন্তু আমি খুব কমই তা উপভোগ করেছি। আমি মুষড়ে যাচ্ছিলাম। কীভাবে পরিস্থিতি সামলাব তাও জানতাম না। আমার ভেতর কী চলছিল সে সম্পর্কে কারো ধারণা ছিল না।

এড, তুমি এ কী করলে? তুমি কীভাবে এই অবস্থা থেকে ফিরে আসবে?

আমি পার্টির ছোটখাটো আলাপচারিতা থেকে দূরে ছিলাম। বাবা, মা, ওয়েন্ডি আমাকে ফোনের ওপর ফোন করছিলেন। বিবিকিউ থেকে সান দিয়েগোতে ফিরে আবার গাড়ি চালিয়ে সান্দ্রার কাজিনের ওখানে দুরাংগোতে গেলাম। যখন আমরা গাড়ি চালাচ্ছিলাম, একটি কালো সরকারি গাড়ি আমাদের পিছু পিছু এলো। একটি পুলিশ গাড়ি সান্দ্রার গাড়িটি থামাল। আমি গাড়ি চালাতে থাকলাম।

১০-০৬-২০১৩

আমি জানতাম স্থানীয় রাজনীতিতে এইলিন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু আমি জানতাম না সে একজন মারাত্মক মহিলা। সে আমার সবকিছু দেখভাল করেছে। সে বিভিন্ন সূত্রে একজন আইনজীবীর ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম তখন এফবিআইয়ের কাছ থেকে একটি কল পাই। চাক ল্যান্ডোভস্কি নামে একজন এজেন্ট, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল সান দিয়েগোতে আমি কী করছি। এইলিন আমাকে ফোন রেখে দিতে বলে। এজেন্ট আবার ফোন দিল। এইলিন বলল আমার ফোন ধরা উচিত নয়। এজেন্ট চাক বলল সে বাসায় হুট করে আসতে চায় না। তাই সে এটি বলার জন্য ফোন করেছে যে এজেন্টরা আসছে।

এইলিন খুব মজবুত নারী। সে আমাকে আমার ফোনটি বাড়িতে রেখে দিতে বলল। আমরা তার গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেলাম ভাবার জন্য। এইলিন তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি মেসেজ পেল। সেখানে তিনি এক আইনজীবী, জেরি ফারবার নামে এক ব্যক্তির নাম সুপারিশ করলেন। এইলিন আমাকে তার ফোন দিয়ে বলল গেরিকে ফোন দেয়ার জন্য। একজন সেক্রেটারি ফোন ধরল। আমি তাকে বললাম আমার নাম লিন্ডসি মিলস, এডওয়ার্ড স্নোডেনের বান্ধবী। সেক্রেটারি বলল, 'ওহ, আমি এক্ষুনি দিচ্ছি।'

জেরি ফোন হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল সে কীভাবে সাহায্য করতে পারে। আমি তাকে এফবিআই কল সম্পর্কে বললাম। সে সেই এজেন্টের নাম জানতে চাইল, যাতে ফেডারেলের সাথে কথা বলতে পারে। আমরা যখন জেরির কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায় ছিলাম, এইলিন পরামর্শ দিল আমার সাথে দুটি

ফোন রাখতে। একটি পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে ব্যবহার করার জন্য। আর একটি জেরির সাথে ব্যবহার করার জন্য।

এইলিন জিজ্ঞাসা করল আমি কোন ব্যাংকে টাকা রাখি। আমরা নিকটস্থ শাখায় চলে গেলাম। যদি ফেডারেল আমার অ্যাকাউন্ট আটক করে দেয় তাই সে অবিলম্বে আমার সমস্ত অর্থ বের করতে বাধ্য করেছিল। আমি আমার সমস্ত জীবন যা সঞ্চয় করেছি তা তুলে ফেললাম। আমি এইলিনের নির্দেশনা অনুসরণ করি। ব্যাংক ম্যানেজার আমাকে জিজ্ঞাসা করল সব নগদ টাকা আমার কেন দরকার? আমি বলেছিলাম, 'জীবন।' আমার সত্যিই রাগে কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল। তবে সিদ্ধান্ত নিলাম চুপ থাকব। আমি চিন্তিত ছিলাম যেহেতু খবরে এডের পাশাপাশি তারা আমার মুখ দেখিয়েছিল। তাই লোকেরা আমাকে চিনতে পারবে। আমরা যখন ব্যাংক থেকে বের হয়ে আসি তখন আমি এইলিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সমস্যায় পড়লে কী করতে হবে সে বিষয়ে সে কীভাবে এত বিশেষজ্ঞ হলো। সে খুব শীতলভাবে বলল, 'তুমি একজন নারী হিসেবে এসব জানতে হবে। তোমার যখন ডিভোর্স হওয়ার মতো অবস্থা হবে তখন তোমাকে সবসময় ব্যাংক থেকে টাকা বের করতে হবে।'

আমরা কিছু ভিয়েতনামি হোটেল থেকে খাবার কিনে এইলিনের বাড়িতে উপরের হলওয়ের মেঝেতে বসে খেলাম। এইলিন এবং সান্ড্রা তাদের হেয়ারড্রায়ার অন করে রাখে শব্দ করার জন্য। আমরা একে অপরকে ফিসফিস করে কথা বলি, যাতে তারা আমাদের কথা শুনতে না পায়।

উকিল জেরি আমাদের ডেকে পাঠাল এবং বলল আজ এফবিআই সঙ্গে দেখা করতে হবে। এইলিন আমাদেরকে জেরির অফিসে নিয়ে গেল। পথে সে লক্ষ্য করল আমাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে। এটার কোনো মানে হয় না। আমরা ফেডারেলের সাথে কথা বলার জন্য একটি মিটিংয়ে যাচ্ছিলাম অথচ এই ফেডারেলই দুটি গাড়ি এবং একটি প্লেট ছাড়াই হোন্ডা অ্যাকর্ড দিয়ে আমাদের পিছনে ছিল। এইলিন ভাবলো তারা এফবিআই নয়। সে ভেবেছিল সম্ভবত তারা অন্য কোনো এজেন্সি বা বিদেশি সরকারের লোক হতে পারে যারা আমাকে অপহরণের চেষ্টা করছিল। সে তাদের পেছনে ফেলার চেষ্টা করে দ্রুত গাড়ি চালানো শুরু করে। আমি তাকে বললাম সে পাগল হয়ে গেছে। তার ধীরে চালানো উচিত।

জেরির বিল্ডিংয়ের দরজা দিয়ে সাদা পোশাকধারী এজেন্ট এলো তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে সরকারি লোক। আমরা লিফটে উঠে গেলাম। যখন দরজাটি খুলল, তখন তিনজন লোক অপেক্ষা করছিল। তাদের মধ্যে দুজন এজেন্ট ছিল, আর একজন ছিল জেরি। সেই একমাত্র ব্যক্তি যে আমার সাথে হ্যান্ডশেক করলেন। জেরি এইলিনকে বলল সে আমাদের সাথে কনফারেন্স রুমে আসতে পারবে না।

আমদের মিটিং শেষ সমাপ্ত হলে সে তাকে কল করবে। এইলিন জোর করে বলে সে অপেক্ষা করবে। সে লবিতে বসেছিল যেন সে এক মিলিয়ন বছরও অপেক্ষা করতে প্রস্তুত। কনফারেন্স কক্ষে যাওয়ার পথে জেরি আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

বলল, সে 'সাময়িক মুক্তি' নিয়ে আলোচনা করেছে আমি বললাম এটি অর্থহীন, সেও তাতে একমত হলো। সে আমাকে বলল কখনোই মিথ্যা কথা বলবে না। আমি জানতামই না আমি কী বলব। এজেন্ট মাইকের একটি হাসি ছিল যা কিছুটা দয়ালু ছিল। এজেন্ট লিল্যান্ড আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রতিটা অভিব্যক্তি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। দুজনের প্রশ্নই আমাকে পাগল করে ফেলল। তারা আমার সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু প্রশ্ন দিয়ে শুরু করল। তারা আমাকে দেখানোর চেষ্টা করছে যে তারা আমার সম্পর্কে ইতোমধ্যে সমস্ত কিছু জানে। অবশ্যই তারা জানে। এটিই এডের পয়েন্ট ছিল। সরকার সর্বদাই সবকিছু জানে। তারা আমাকে গত দুই মাসের ব্যাপারে দুবার কথা বলতে বলল। যখন আমি বলে শেষ করেছি, এজেন্ট মাইক আমাকে শুরু থেকে আবার শুরু করতে বলল। আমি বললাম, 'কিসের শুরু?' সে বলল, 'আপনাদের কীভাবে দেখা হয় বলুন।'

১১-০৬-২০১৩

জিজ্ঞাসাবাদ থেকে ক্লান্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছি গভীর রাতে। আমার সামনে আরো জিজ্ঞাসাবাদ আছে। তারা আমাকে বলত না আর কদিন লাগবে। এইলিন সান্ড্রার সাথে দেখা করত ডিনারে নিয়ে গেল। ডাউনটাউন থেকে যাওয়ার সময় আমরা খেয়াল করলাম আমাদের সাথে এখনো লেজ লাগানো রয়েছে। এইলিন দ্রুত এবং অবৈধ ইউ-টার্ন নিয়ে এদের হারাতে চেষ্টা করছিল। আমি তাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি। আমি ভেবেছিলাম তার এরকম গাড়ি চালানো আমাকে আরো খারাপ দেখাচ্ছে। এটা আমাকে সন্দেহজনক করে তুলছে। তবে এইলিন খুব জেদী মা ভাল্লুকের মতো। সেই রেস্টুরেন্টের পার্কিং-এ, এইলিন গোয়েন্দা গাড়ির জানালায় আঘাত করে চিৎকার করে বলছিল যে আমি তো সহযোগিতা করছি। সুতরাং তাদের আমাকে অনুসরণ করার কোনো কারণ নেই। এটি কিছুটা বিব্রতকর ছিল। যেন আপনার মা স্কুলে আপনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় এজেন্টদের গাড়ির কাছে গিয়ে তাদেরকে চিৎকার করে বলার এই সাহস দেখে আমি অবাক হলাম। সান্ড্রা পিছনে একটি টেবিলে বসে ছিল। আমরা খাবারের অর্ডার দিয়ে 'মিডিয়া এক্সপোজার' সম্পর্কে কথা বললাম। সব খবরে আমি ছিলাম।

ডিনার করার সময় দুজন লোক আমাদের টেবিল পর্যন্ত এলো। বেসবলের টুপি মাথায় একটি লম্বা লোক, যার ব্রেস পড়া ছিল। তার পার্টনারের পোশাক দেখে মনে হচ্ছিল ক্লাবে যাচ্ছে। লম্বা লোকটি নিজেকে এজেন্ট চাক

হিসেবে পরিচয় দিল। এই এজেন্ট আমাকে আগে ফোন করেছিল। একবার আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সে 'ড্রাইভিং আচরণ' সম্পর্কে আমার সাথে কথা বলতে চাইল। এজেন্ট চাক তার ব্যাজ দেখিয়ে আমাকে বলল তার মূল লক্ষ্য আমার সুরক্ষা। সে বলেছিল আমার জীবনের বিরুদ্ধে হুমকি আসতে পারে। সে নিজের জ্যাকেটে চাপড় মেরে বলল, যদি কোনো বিপদ হয় তবে সে দেখবে। কারণ সে 'সশস্ত্র দলে' ছিল।

আমি বুঝলাম এ জাতীয় সকল পদক্ষেপ ছিল আমাকে বিপদে ফেলে সাহায্য করে তাদের ওপর আমাকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা। সে আরো বলল, ভবিষ্যতে আমাকে এফবিআই ২৪/৭ নজরদারিতে রাখবে। আর এইলিন যে বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছিল তা সহ্য করা হবে না। এজেন্টদের কখনোই তাদের অ্যাসাইনমেন্টের সাথে কথা বলার কথা না। তবে, পরিস্থিতি দেখে তার মনে হয়েছে 'প্রত্যেকের সুরক্ষার জন্য দলকে তার এভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে'।

সে আমাকে তার যোগাযোগের তথ্যসহ একটি ব্যবসায়িক কার্ড দিয়ে বলল সে পুরো রাত এইলিনের বাড়ির ঠিক বাইরে গাড়ি পার্ক করে রাখবে। কোনো কারণে যদি প্রয়োজন হয়, বা কিছু প্রয়োজন হয় তবে আমার তাকে ফোন করা উচিত। আমি যেকোনো জায়গায় নির্দ্বিধায় যেতে পারব কিন্তু আমি যখনই কোথাও যাবার পরিকল্পনা করব তখন আমার তাকে জানানো উচিত। সে বলল, 'মুক্ত যোগাযোগ সবকিছু সহজ করে দেবে। আপনি যতো আমাদের সহায়তা করবেন তত বেশি নিরাপদ থাকবেন, আমি কথা দিচ্ছি।'

১৬-০৬-২০১৩ থেকে ১৮-০৬-২০১৩

অনেকদিন কিছু লেখা হয়নি। আমি এত রেগে আছি যে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে চিন্তা করলাম কে এবং কী নিয়ে আমি রাগ করছি। অসভ্য ফেডারেল! ক্লান্তিকর জিজ্ঞাসাবাদ, যেখানে তারা আমাকে দোষী বলে মনে করে এবং সর্বত্র আমাকে অনুসরণ করে। তবে সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা হলো তারা আমার রুটিন নষ্ট করেছে। সাধারণত আমি বনেবাদাড়ে ঘুরতে যেতাম, শুটিং করতাম বা লিখতাম। তবে এখন যেখানেই যাই না কেন আমার সাথে নজরদারি দল রয়েছে। এটি আমার শক্তি, সময় এবং লেখার ইচ্ছা কেড়ে নেওয়ার সাথে, আমার শেষ কিছু প্রাইভেসিও কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু সবকিছু মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমে তারা আমাকে আমার ল্যাপটপ নিয়ে আসতে বলে এবং হার্ড ড্রাইভটি কপি করে। তারা সম্ভবত এটিতে আড়িপাতার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

তারপর তারা আমার সমস্ত ইমেইল এবং চ্যাট কপি করে। তারা এডকে লেখা জিনিসপত্র পড়ছিল এবং এড আমাকে যা লিখেছিল তাদের কাছে তা ব্যাখ্যা করতে বলে। এফবিআই মনে করে যে সবকিছুই একটি কোড। তবে আট বছর ধরে একসাথে থাকা লোকেরা এভাবেই যোগাযোগ করে! তারা

এমনভাবে আচরণ করে যে তারা কখনোই কোনো সম্পর্কে ছিল না! তারা আমাকে ইমোশনালি ক্লান্ত করার চেষ্টা করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিল। যাতে আমার উত্তর পাল্টে যায়। তারা মানবে না যে, আমি কিছুই জানি না। তবুও তারা আমার অনলাইন ক্যালেন্ডারটি আমার সামনে প্রিন্ট করে। আশা করেছিলাম সরকারি লোকরা বুঝতে পারবে যে এড তার কাজ গোপন রাখত। আর আমিও তা সম্মান করতাম। কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করল না।

কিছুক্ষণ পরে, আমি যখন কান্নায় ভেঙে পড়লাম তখন সেশন শেষ হয়েছিল। এজেন্ট মাইক এবং এজেন্ট লেল্যান্ড আমাকে এইলিনের বাসায় যাওয়ার প্রস্তাব দিল। আমি চলে যাওয়ার আগে জেরি আমাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলল এফবিআই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে হচ্ছে। বিশেষত মাইক। সে যাত্রাপথে আমাকে সতর্ক থাকতে বলেছিল। 'তাদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেবে না।'

আমরা যাওয়ার মুহূর্তে মাইক বলেছিল, 'আমি নিশ্চিত যে জেরি কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিতে বলেছে। তবে আমার কিছু কথা আছে।' মাইক বলল সান দিয়েগোতে এফবিআই অফিসে তাদের একটি বাজি ছিল। এজেন্টদের বাজি ছিল মিডিয়া আমার অবস্থান আবিষ্কার করতে কতটা দীর্ঘ সময় লাগবে। যিনি বিজয়ী হবেন তিনি একটি বিনামূল্যে মার্টিনি পাবেন।

পরবর্তীতে, সান্ড্রা বলল তার সন্দেহ হচ্ছে।

বাজিটি অন্য কিছু সম্পর্কে ছিল। সে পুরুষদের ভালো করেই জানত।

১৯-০৬-২০১৩ থেকে ২০-০৬-২০১৩

সারা দেশ যখন তাদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করা হচ্ছে এ বিষয়টি নিয়ে দুঃখ করছিল, তখন আমার দুঃখ সম্পূর্ণ নতুন স্তরে। উভয় জিনিসের জন্য এডকে ধন্যবাদ। আমি চাককে আমার আপডেট পাঠানো অপছন্দ করতাম। তারপরে নিজেকে ঘৃণা করতাম কারণ সেগুলো না পাঠানোর মতো সাহস আমার নেই। সবচেয়ে খারাপ বিষয় ছিল এই এক রাতে আপডেট পাঠাই যে আমি সান্ড্রার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। তারপর পথ হারিয়ে ফেলি কিন্তু থামতে চাইনি এবং আমার অনুসরণকারী এজেন্টদের সাহায্যের জন্য বলি। গাড়িতে জোরে কথা বলতে শুরু করলাম, ভেবেছিলাম তারা হয়তো আমাকে শুনতে পারে। আমি কথা বলছিলাম না, আমি তাদের অভিশাপ দিচ্ছিলাম। আমাকে জেরির ফিস দিতে হচ্ছিল। আইনজীবীর অফিস এবং জিমেই আমার সমস্ত ট্যাক্সের টাকা নষ্ট হয়ে যায়। প্রথম দুদিনের মিটিংয়ের পরে আমি মেসিতে গেলাম ভালো কিছু পোশাক কেনার জন্য। এজেন্টরা মহিলা বিভাগের চারপাশে আমাকে অনুসরণ করেছিল। আমার মনে হচ্ছিল তারা ফিটিং রুমে এসে বলবে, এটা ভালো দেখাচ্ছে না, সবুজ আপনাকে মানায় না। ফিটিংরুমের প্রবেশ দরজায় একটি টিভি ছিল। খবরে যখন 'এডওয়ার্ড স্নোডেনের বান্ধবী' বলা হলো তখন

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি স্ক্রিনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমার ফটো ফাঁস হলো। আমার ফোনটিতে গুগলিং করে ভুল করেছি। অনেকে আমাকে স্ট্রিপার বা বেশ্যা বলছিল। এসব কিছুই আমি নই। ফেডারেলের মতো তারাও ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আমি কে।

২২-০৬-২০১৩ থেকে ২৪-০৬-২০১৩

জিজ্ঞাসাবাদ আপাতত শেষ। কিন্তু লেজ এখনও অনুসরণ করে। আমি স্থানীয় এক স্টুডিওতে গেলাম। খুব খুশি লাগল বাসার বাইরে আসতে পেরে। স্টুডিওতে গিয়ে রাস্তার পার্কিং খুঁজে পেলাম না, তবে আমার লেজ জায়গা পেয়ে গেল। আমি যখন সীমার বাইরে চলে যাই তখন তার স্পট ছেড়ে দেয়। তখন আমি দ্বিগুণ গতিতে এসে তার পার্কিংয়ের জায়গা চুরি করলাম। ওয়েন্ডির সাথে ফোনে কথা বললাম। আমরা দুজনেই বলেছিলাম এড আমাদের খারাপভাবে আঘাত করেছে। তবে সে চলে যাবার আগে চেয়েছিল আমি এবং ওয়েন্ডি একসাথে থাকি। এজন্যই সে তাকে আসতে বলে। যাতে আমরা একে অপরকে সাহস ও শক্তি দিতে পারি। ভালোবাসার মানুষের ওপর রাগ করা খুব কঠিন। এর চেয়েও এমন কারো ওপর রাগ করা যাকে আপনি পছন্দ করেন এবং সঠিক কাজটি করার জন্য সম্মান করেন। ওয়েন্ডি এবং আমি দুজনেই কান্না করছিলাম। তারপরে আমরা দুজনেই শান্ত হয়ে গেলাম। আমাদের সব কলের ওপর যদি নজরদারি থাকে তখন আমরা কীভাবে সাধারণ মানুষের মতো কথা বলতে পারি?

২৫-০৬-২০১৩

লস এঞ্জেলস থেকে হনুলুলু। সুরক্ষার জন্য পুরো ফ্লাইট জুড়ে বিমানবন্দরে তামার রঙের উইগ পরেছিলাম। সান্ড্রা সাথে এলো। আমরা ফুড কোর্টে ফ্লাইটের আগে লাঞ্চ করলাম। সিএনএন-এ এখনো এডকে দেখাচ্ছে। এজেন্ট মাইক থেকে একটি টেক্সট পেলাম, আমাকে এবং সান্ড্রাকে গেট ৭৩ যেতে বলেছে। সত্যি? সে সান দিয়েগো থেকে লস এঞ্জেলস এসেছে? গেট ৭৩ বন্ধ এবং খালি করা হয়েছে। মাইক আমাদের জন্য চেয়ারের এক সারিতে বসে অপেক্ষা করছিল। সে পা ক্রস করে আমাদেরকে তার পায়ের গোড়ালিতে থাকা পিস্তল দেখাল।

আমার কাছে হাওয়াইতে এডের গাড়ির চাবি এফবিআই ফেরত দেওয়ার জন্য কিছু কাগজপত্র নিয়ে এলো সাইন করার জন্য। সে বলল দুজন এজেন্ট চাবি নিয়ে হনুলুলুতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। অন্যান্য এজেন্ট ফ্লাইটে আমাদের সঙ্গে থাকবে। সে ক্ষমা চাইল যে সে ব্যক্তিগতভাবে আসতে পারছে না। উফ।

২৯-০৬-২০১৩
এফবিআইয়ের সামান্য বাধাবিপত্তির সাথে কয়েক দিন বাড়ির জিনিসপত্র প্যাকিং করলাম। আরো কাগজপত্র সই করতে হলো। তার কথা মনে করিয়ে দেয় এমন সব ছোট ছোট জিনিসপত্র খুঁজছিলাম। পাগলের মতো সব পরিষ্কার করছিলাম। তারপরে বিছানায় সে যে পাশটায় ঘুমাত ওই পাশে শুয়ে থাকতাম। প্রায়ই খুঁজতাম কী কী এফবিআই নিয়ে গেছে। প্রযুক্তি, হ্যাঁ। তবে বইও। তারা রেখে গেছে পায়ের ছাপ, দেয়ালে স্কাফ চিহ্ন এবং ধূলোবালি।

৩০ ০৬-২০১৩
ওয়াইপাহুর বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রয়। তিন জন লোক স্যান্ড্রার 'সব নিয়ে নিন, সেরা অফার' ক্র্যাগলিস্টিংয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। তারা এডের জীবন, তার পিয়ানো, গিটার এবং ওজন সেট সবকিছু উল্টেপাল্টে দেখল। লোকগুলো তাদের পিকআপটি যথাসম্ভব পূর্ণ করে নিয়ে গেল। তারপরে দ্বিতীয়বার বোঝাই করে নেয়ার জন্য ফিরে এলো। আমি এবং সান্ড্রা অবাক হয়ে গেলাম তাদের পাগলের মতো উলটপালট করা দেখে। কিন্তু তারা চলে যাওয়ার মুহূর্তটিতে, দ্বিতীয়বারের মতো, আমি সব হারিয়ে ফেললাম।

০২-০৭-২০১৩
সোফা আর বিছানা বাদে সবকিছুই আজ পাঠানো হয়েছে। এফআইবিআই বাসায় অভিযান চালানোর পর এডের কিছু জিনিস রয়ে গিয়েছিল। এগুলো একটি ছোট কার্ডবোর্ড বাক্সে ভরে নিলাম। এর মধ্যে ছিল কিছু ফটো এবং তার জামাকাপড়, প্রচুর জোড়াহীন মোজা আদালতে প্রমাণ হিসেবে যেগুলো ব্যবহার করা যাবে না। এগুলো একসাথে আমাদের জীবন কাটানোর প্রমাণ। সান্ড্রা বারান্দার পাশে আবর্জনার ক্যান নিয়ে এলো আর কিছুটা হালকা তরল জ্বালানি নিয়ে এলো। আমি এডের সকল জিনিসপত্র, ফটো এবং জামাকাপড় এর ভিতরে দিয়ে দিলাম। তারপর ম্যাচ জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলাম। এগুলো পুড়ে আকাশে ধোঁয়া উঠছিল। আমি ও সান্ড্রা বসে ছিলাম। এই লাল আভা এবং ধোঁয়া আমাকে ওয়েন্ডির সাথে বিগ আইল্যান্ডের আগ্নেয়গিরি কিলাউইয়া ভ্রমণের কথা মনে করিয়ে দেয়। এটি ঠিক এক মাস আগের কথা। এক বছরের মতো মনে হচ্ছে।

কীভাবে আমরা জানব আমাদের জীবনের বিস্ফোরণ সম্পর্কে যে, এড আগ্নেয়গিরি সব ধ্বংস করতে যাচ্ছিল? তবে আমি কিলাউইয়ায় গাইডের কথা মনে রেখেছিলাম। আগ্নেয়গিরি স্বল্পমেয়াদে কেবল ধ্বংসাত্মক। দীর্ঘমেয়াদে, তারা ভূমিকে সরাতে থাকে। তারা দ্বীপ তৈরি করে, গ্রহকে শীতল করে এবং মাটিকে উর্বর করে। তাদের অনিয়ন্ত্রিত লাভা একসময় শীতল হয়ে শক্ত হয়ে

যায়। তারা যে ছাই বাতাসে ছুঁড়ে তা খনিজ হিসেবে ছিটকে পড়ে যা পৃথিবীকে উর্বর করে এবং নতুন জীবন গড়ে তোলে।

ভালোবাসা ও নির্বাসন

এই বই পড়ার সময় কৌতূহলী হয়ে আপনি হয়তো কোনো শব্দের ব্যাপারে জানতে এক মুহূর্তের জন্য বিরতি দিয়ে সার্চ ইঞ্জিনে টাইপ করেছিলেন। যদি সেই শব্দটি হয়ে থাকে XKEYSCORE-এর মতো শব্দ তাহলে অভিনন্দন। আপনি নিজের কৌতূহলের শিকার হয়েছেন।

অনলাইনে কোনো কিছু অনুসন্ধান না করেও, আপনি এই বইটি পড়ছেন তা খুঁজে পেতে সরকারের খুব বেশি সময় লাগবে না। আপনি এটি অবৈধভাবে ডাউনলোড করেছেন বা অনলাইনে হার্ড কপি কিনেছেন বা ক্রেডিট কার্ড দিয়ে একটি দোকান থেকে কিনেছেন তা খুঁজে বের করতে খুব বেশি সময় সরকারের প্রয়োজন হবে না।

আপনি যা করতে চেয়েছিলেন তা ছিল শুধু বইটি পড়া। এটি একটি মানবিক কাজ। আপনি ভাষার সাথে মনের সংযোগ ঘটাতে চেয়েছিলেন। আপনি ইমেইল, আপনার ফোন এবং আপনার কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে বিশ্বের সাথে সংযোগ স্থাপন করেন। বৈদ্যুতিক যোগাযোগের প্রতিটি চ্যানেল জুড়ে এদেরকে ট্র্যাক করার বিশ্বব্যাপী সিস্টেম তৈরি করে আমেরিকান গোয়েন্দা এজেন্সি নিজেকে আপনার জীবনের ডাটা চিরকালের জন্য রেকর্ড এবং সংগ্রহ করার ক্ষমতা দিয়েছে।

আমেরিকার গোয়েন্দা এজেন্সিগুলো আপনার সমস্ত যোগাযোগ পরোক্ষভাবে সংগ্রহ করার সাথে, এতে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ শুরু করেছে। তারা আপনার শব্দের চেয়ে বেশি কিছুতে অধিকার করার দক্ষতা অর্জন করেছে। এখন তারা আপনার ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোনসহ পুরো ডিভাইসটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম। যদি এখন স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটের মতো কোনো আধুনিক মেশিনে এ বাক্যটি পড়েন তবে তারা আপনাকে অনুসরণ করতে এবং পড়তে পারে। আপনি পৃষ্ঠাগুলো কত দ্রুত বা ধীরে ধীরে ঘুরিয়েছেন তারা বলতে পারে। আপনি অধ্যায়গুলো ধারাবাহিকভাবে পড়েছেন বা কিছু এড়িয়ে গেছেন তাও তারা বলতে পারে।

তারা আনন্দের সাথে আপনার নাকের ছিদ্র সন্ধান করবে এবং পড়তে পড়তে আপনার ঠোঁট সরাতে দেখবে, যতক্ষণ না তারা তাদের পছন্দসই ডাটা পেয়ে যায়।

এটি দুই দশক ধরে চেক না করা উদ্ভাবনের ফলাফল। এটা একটি রাজনৈতিক এবং পেশাদার শ্রেণির চূড়ান্ত পণ্য যা নিজেকে আপনার মালিক রূপে কল্পনা করে। আপনি যেখানেই থাকুন আর আপনি যা কিছু করুন না কেন, আপনার জীবন এখন একটি উন্মুক্ত বইতে পরিণত হয়েছে।

গণনজরদারি হয়ে গিয়েছিল প্রতিদিনের জীবনে একটি উপস্থিতি তাই আমি চেয়েছিলাম এটি যে বিপদগুলো ঘটিয়েছে এবং যে ক্ষতি করেছে তাও একটি ধ্রুব সত্য হিসেবে উপস্থিত থাকুক।

সংবাদমাধ্যমের কাছে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে, আমি এই ব্যবস্থাটি পরিচিত করতে চেয়েছি। এর অস্তিত্বকে আমার দেশ এবং বিশ্ব উপেক্ষা করতে পারে না। ২০১৩ সাল থেকে এ ব্যাপারে তাই সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমাদের সর্বদা নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, একাকি সচেতনতা যথেষ্ট নয়।

আমেরিকাতে, প্রেসিডেন্ট ওবামা নিজেই স্বীকার করেন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যগুলো 'জাতীয় আলোচনায়' পরিণত হয়েছিল। এটি জাতীয় এ কারণেই প্রথমবারের মতো আমেরিকান জনসাধারণ তাদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরে।

২০১৩ সালের তথ্য ফাঁস কংগ্রেসকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। এর উভয় কক্ষই এনএসএ'র সীমা লঙ্ঘনের বিষয়ে একাধিক তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তগুলোতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এজেন্সি তার গণনজরদারি কর্মসূচির প্রকৃতি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে বারবার মিথ্যা বলেছিল এমনকি তাদের আইন প্রণেতাদের থেকেও।

২০১৫ সালে, একটি ফেডারেল আপিলের আদালত ACLU বনাম ক্ল্যাপারের বিষয়ে রায় দেয়। এনএসএ'র ফোন রেকর্ড সংগ্রহ কর্মসূচির বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলার ব্যাপারে আদালত রায় দিয়েছে যে, এনএসএ'র কর্মসূচি প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের লঙ্ঘন করেছে এবং এটা অসাংবিধানিক। এ রায়টি প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের ধারা ২১৫-এর ব্যাপারে এনএসএ'র ব্যাখ্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যা সরকারকে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে 'কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়' দাবি করার অনুমতি দেয়। আদালতের মতে, সরকারের 'প্রাসঙ্গিক' সংজ্ঞাটি কার্যত অর্থহীন ছিল।

কিছু সংগৃহীত তথ্যকে 'প্রাসঙ্গিক' বলা কারণ ভবিষ্যতে তা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে এমন ভাবনা ছিল নজিরবিহীন এবং অযৌক্তিক। অনেক আইনবিশারদই মনে করেন এই রায় ভবিষ্যতে প্রাসঙ্গিকভাবে সরকারের সমস্ত সরকারি তথ্যসংগ্রহ কর্মসূচির বৈধতাকে নাকচ করে। এই মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস মার্কিন স্বাধীনতা আইন পাস করেছে, যা আমেরিকানদের ফোন রেকর্ড সংগ্রহ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য ২১৫ ধারা সংশোধন করেছে। এই রেকর্ডগুলো টেলিকম কোম্পানির ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সরকার

এফআইএসসি ওয়ারেন্ট হাতে নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করতে পারে যদি সেগুলো একসেস করতে চায়।

ACLU বনাম ক্ল্যাপার একটি উল্লেখযোগ্য বিজয় ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করেছিল। আদালত ঘোষণা করে, আমেরিকান নাগরিকদের আদালতে দাঁড়িয়ে সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে গোপন গণনজরদারি ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করার অধিকার আছে। তবে তথ্যফাঁসের ফলে অসংখ্য মামলার কাজ আদালতে ধীরগতিতে চলছিল।

তথ্য ফাঁসের পর টেকনো ক্যাপিটালিস্টদের প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক এবং বলপূর্বক ছিল। ডকুমেন্টগুলো প্রমাণ করে এনএসএ সব তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে সংরক্ষণ করত। ইন্টারনেটের বেসিক এনক্রিপশন প্রোটোকলগুলোকে উপেক্ষা করত। উদাহরণস্বরূপ–নাগরিকদের আর্থিক এবং মেডিকেল রেকর্ড রাখে এমন ব্যবসার ক্ষতি করত। তাদেরকে কাস্টমাররা বিশ্বাস করে সংবেদনশীল ডাটা দিত।

প্রতিক্রিয়া হিসেবে, অ্যাপল তার আইফোন এবং আইপ্যাডগুলোর জন্য শক্তিশালী ডিফল্ট এনক্রিপশন গ্রহণ করে এবং গুগল তার অ্যান্ড্রয়েড পণ্য এবং ক্রোমবুকের জন্য মামলা অনুসরণ করে। তবে সম্ভবত বেসরকারি সেক্টরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যখন বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়ীরা তাদের ওয়েবসাইট প্ল্যাটফর্ম সুইচ করা শুরু করে। HTTP (হাইপারটেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল)-এর পরিবর্তে এনক্রিপ্ট করা https (এস সুরক্ষা নির্দেশ করে) দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়, যা ওয়েব ট্র্যাফিকে তৃতীয় পক্ষের বাধা রোধ করতে সহায়তা করে।

২০১৬ সালটি প্রযুক্তি ইতিহাসের একটি যুগান্তকারী সাল ছিল। ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর প্রথম বছর যাতে এনক্রিপ্ট না থাকা অনেক ওয়েব ট্র্যাফিক এনক্রিপ্ট করা হয়েছিল।

ইন্টারনেট ২০১৩ সালের চেয়ে এখন বেশি সুরক্ষিত। বিশেষত এনক্রিপ্ট হওয়া সরঞ্জাম এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলোর প্রয়োজনীয়তা বোধের কারণে।

আমি নিজেও কয়েকটি ডিজাইন তৈরি করেছি ফ্রিডম অব দ্য প্রেস ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যেখানে আমি কাজ করি। এটি একটি অলাভজনক সংস্থা। এটি এই যুগে জনস্বার্থে সাংবাদিকতা পরিচালনা ও নিরাপত্তার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। সংস্থার একটি বড় উদ্দেশ্য হলো এনক্রিপশন প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে প্রথম এবং চতুর্থ সংশোধনীর অধিকার সংরক্ষণ এবং জোরদার করা।

এ লক্ষ্যে, এফপিএফ সিগন্যালকে আর্থিকভাবে সমর্থন করে সিগন্যাল ওপেন হুইপার সিস্টেম দ্বারা নির্মিত একটি এনক্রিপ্টেড টেক্সটিং এবং কলিং প্ল্যাটফর্ম। এটি সিকিউরড্রপ (প্রয়াত অ্যারন স্কার্টজ কর্তৃক দেয়া কোড) তৈরি করে. এটি একটি ওপেনসোর্স সাবমিশন সিস্টেম যা মিডিয়াকে নিরাপদে

বেনামি হুইসেল ব্লোয়ারদের থেকে ও অন্যান্য উৎস থেকে নথি গ্রহণ করতে দেয়।

বর্তমানে সিকিউরড্রপ দশটি ভাষায় পাওয়া যায়। নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, দ্য গার্ডিয়ান এবং নিউইয়র্কসহ বিশ্বের সত্তর শতাধিক মিডিয়া সংস্থা এটি ব্যবহার করে।

একটি নিখুঁত পৃথিবী বলতে কিছু নেই। প্রযুক্তিগত মান পরিবর্তনের চেয়ে আইনের পরিবর্তন করা আরো কঠিন। যতক্ষণ আইনি উদ্ভাবন প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন সংস্থার চেয়ে পিছিয়ে থাকে ততক্ষণ কর্তৃপক্ষ তাদের স্বার্থের অগ্রগতিতে এই বৈষম্যকে অপব্যবহার করার চেষ্টা করবে। স্বাধীন, ওপেন-সোর্স হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার বিকাশকারীরা নাগরিক স্বাধীনতা সুরক্ষার উপকরণ সরবরাহ করে এই ফাঁকটি বন্ধ করে দেয়। যা হয়তো আইন করতে পারে না বা করতে অনিচ্ছুক।

আমার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি বুঝতে পারছি আইন হলো দেশ-সুনির্দিষ্ট। প্রযুক্তি নয়। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব আইনি কোড আছে। তবে সবার একই কম্পিউটার কোড রয়েছে। প্রযুক্তি প্রতিটি সীমানা অতিক্রম করে এবং প্রতিটি পাসপোর্ট বহন করে। বিগত বছরগুলোতে ধীরে ধীরে আমার কাছে এটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আমার জন্মভূমিতে নজরদারি শাসনব্যবস্থার আইনি সংস্কার করা রাশিয়ার কোনো সাংবাদিককে সহায়তা করবে না। তবে একটি এনক্রিপ্টেড স্মার্টফোন করতে পারে।

আন্তর্জাতিকভাবে, তথ্য ফাঁসের ফলে নজরদারি ক্ষমতার অপব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস আছে এমন সব দেশে নজরদারি সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়। যে দেশগুলোর নাগরিক আমেরিকান গণনজরদারির সর্বাধিক বিরোধিতা করেছিল, তারা হলো ফাইভ আই'স দেশগুলো (বিশেষত যুক্তরাজ্য, যাদের জিসিএইচকিউ এনএসএ'র প্রাথমিক অংশীদার হিসেবে রয়েছে) থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো। জার্মানির নাগরিক এবং নীতি প্রণেতারা জানতে পেরে হতবাক হয়েছিলেন যে এনএসএ জার্মান যোগাযোগ জরিপ করছে। এমনকি চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের স্মার্টফোনকেও লক্ষ্যবস্তু করে রেখেছে। একই সময়ে, জার্মানির প্রিমিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা বিএনডি এনএসএ'র সাথে অসংখ্য অপারেশনে সহযোগিতা করেছিল। এমনকি এনএসএ নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহণে অক্ষম বা অনিচ্ছুক এমন কিছু প্রক্সি নজরদারি উদ্যোগও তারা চালিয়েছিল।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে। কোনো নির্বাচিত সরকার কোনো নাগরিকের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য নজরদারির উপর নির্ভর করে। যদি নজরদারিকে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বলে বিবেচনা করে তবে তারা কার্যকরভাবে গণতন্ত্র হতে পারেনি। ভূ-রাজনৈতিকভাবে এই বিচ্ছিন্নতা মানবাধিকারের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে আন্তর্জাতিক সংলাপে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে প্রথমবারের মতো, বিশ্বজুড়ে উদার গণতান্ত্রিক সরকারগুলো গোপনীয়তাকে প্রতিটি পুরুষ, মহিলা এবং শিশুর স্বাভাবিক, জন্মগত অধিকার হিসেবে আলোচনা করছিল। এটি করার ফলে তারা মানবাধিকার নিয়ে ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের দিকে ঝুঁকছিল। যার অনুচ্ছেদ ১২তে বলা হয়েছে, 'কাউকেই তার পরিবার, বাড়ি বা চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা নির্বিচারে হস্তক্ষেপ করা হবে না বা তার সম্মান ও খ্যাতিতে আক্রমণ করা হবে না। এ জাতীয় হস্তক্ষেপ বা হামলার বিরুদ্ধে আইনের সুরক্ষার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।' জাতিসংঘের সমস্ত ঘোষণার মতো এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দলিলটি কখনোই প্রয়োগযোগ্য ছিল না, তবে নাগরিক স্বাধীনতার জন্য একটি নতুন ভিত্তি গড়ে তোলা এর উদ্দেশ্য ছিল।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এই নীতিগুলো বাস্তবায়িত করার জন্য এখন ট্রান্সন্যাশনাল সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এটি একটি নতুন নির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করেছে যা গোপনীয়তা সুরক্ষার জন্য একটি আইনি কাঠামোর পাশাপাশি তার সদস্য দেশগুলোতে হুইসেলব্লোয়ার সুরক্ষা করার চেষ্টা করে।

২০১৬ সালে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সংসদ জেনারেল ডাটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (জিডিপিআর) পাস করেছে। জিডিপিআর ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদেরকে 'ডাটা সাবজেক্টস' হিসেবে বিবেচনা করে। এর মানে হলো সেই ব্যক্তিরা যারা সনাক্তযোগ্য ডাটা তৈরি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ডাটা সাধারণত যে ব্যক্তি সংগ্রহ করে তার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডাটাকে ব্যক্তির সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। এটি আমাদের ডাটা সাবজেক্টহুডকে নাগরিক স্বাধীনতার মতো সুরক্ষার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করে।

নিঃসন্দেহে জিডিপিআর একটি বড় আইনি অগ্রগতি, তবে এর ট্রান্সন্যাশনালিজম খুব পুরুষতান্ত্রিক। আর ইন্টারনেট বিশ্বব্যাপী। আমাদের প্রাকৃতিক ব্যক্তিত্ব কখনোই আমাদের ডাটা সাবজেক্টহুডের সাথে বৈধভাবে সমার্থক হতে পারে না। কারণ প্রথমটা একই সাথে এক জায়গায় থাকে এবং দ্বিতীয়টি একসাথে বহু জায়গায় বসবাস করে।

আপনি কে, কোথায় থাকেন এগুলো কোনো ব্যাপার না। আপনার বিভিন্ন অস্তিত্ব একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন দেশে সিগন্যাল পথের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। এসব কোনো দেশ আপনার না। তবু আপনি যে দেশ দিয়েই যাবেন এসব দেশের আইনের দ্বারা বাধিত থাকবেন।

জেনেভার একটি জীবনের রেকর্ড বেল্টওয়েতে পাওয়া যাবে। টোকিওতে একটি বিয়ের ছবি সিডনিতে হানিমুন করতে পাওয়া যাবে। বানারসির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ছবি অ্যাপল আই ক্লাউডে পাওয়া যাবে।

এসব আমার রাজ্য উত্তর ক্যারোলিনাতে আংশিকভাবে অবস্থিত এবং পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান

এবং চীন জুড়ে অ্যামাজন, গুগল, মাইক্রোসফট এবং ওরাকল এর অংশীদার সার্ভারগুলোতে আংশিকভাবে ছড়িয়ে আছে।

আমাদের তথ্য আছে দিগদিগন্তে। আমাদের তথ্য সীমাহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের জন্মের আগে থেকে এই ডাটা তৈরি হওয়া শুরু হয় যখন প্রযুক্তি আমাদেরকে জরায়ুতে সনাক্ত করে এবং আমাদের মৃত্যুর পরেও আমাদের ডাটা প্রসারিত হতে থাকবে। অবশ্যই, আমাদের সচেতনভাবে তৈরি করা স্মৃতি, রেকর্ড যা আমরা ধরে রাখতে বেছে নিই, সেগুলো আমাদের জীবন থেকে সব ছড়িয়ে পড়েছে। যার বেশিরভাগই অজ্ঞানতার কারণে। এসব ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সম্মতি ছাড়াই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি নজরদারি দ্বারা।

আমরা গ্রহের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি, যারা ডাটা অমরত্বের বোঝায় চাপা পড়েছি। আমাদের সংগৃহীত রেকর্ডগুলোর চিরস্থায়ী অস্তিত্ব থাকতে পারে। এ কারণেই আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের পোস্টগুলোর এই রেকর্ড আমাদের বিরুদ্ধে বা আমাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবহার করা না যায়।

৯/১১-তে যারা জন্মগ্রহণ করেনি, তারা এই সর্বব্যাপী নজরদারির মধ্য দিয়ে পুরো জীবন অতিবাহিত করেছে। এই যুবক-যুবতীরা যারা অন্য কোনো জগৎকে চেনে না, তারা কল্পনার জগতে থাকে। তবে তাদের রাজনৈতিক সৃজনশীলতা এবং প্রযুক্তিগত চৌর্যতা আমাকে আশা দেয়।

আমরা যদি এখনই আমাদের ডাটার দাবি জানিয়ে কাজ না করি তবে আমাদের শিশুরা, তারপরে তাদের সন্তানরাও এতে আটকা পড়বে। প্রতিটি ধারাবাহিক প্রজন্ম পূর্ববর্তী তথ্য উপাত্তের অধীনে বাস করতে বাধ্য হবে।

আমাদের মধ্যে কেউ ভবিষ্যতের পূর্বাভাস দিতে পারব? কে সাহস করবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তর আসলেই কেউই নয়। দ্বিতীয়টির উত্তর, সবাই। বিশেষত এ গ্রহের প্রতিটি সরকার ডাটা ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠিত আচরণ বিশ্লেষণ করে। এটা একধরনের ডিজিটাল ভবিষ্যদ্বাণী যা অ্যানালগ পদ্ধতির চেয়ে সামান্য বেশি নির্ভুল।

অনুমান করা আসলে তথ্যের হেরফের। একটি ওয়েবসাইট আপনাকে যদি বলে যে, আপনি অমুক বইটি পছন্দ করেছেন তাই আপনি জেমস ক্ল্যাপার বা মাইকেল হেইডেনের বইগুলোও পছন্দ করতে পারেন। এটি খুব সূক্ষ্ম জবরদস্তিমূলক প্রক্রিয়া।

আমরা নজরদারিকে এভাবে ভবিষ্যতে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারি না। আমরা আমাদের তথ্য বিক্রি করতে পারি না। নাগরিকত্বের স্কোর 'গণনা' করতে বা আমাদের অপরাধমূলক কাজের পূর্বাভাস দিতে ব্যবহার করতে পারি না। আমাদের শিক্ষা কী হবে, কাজ কী করব তা নির্ধারণ করতে দিতে পারি না। আমাদের পড়াশোনা বা চাকরি ও আমাদের

আর্থিক, আইনি এবং চিকিৎসা ইতিহাসের ভিত্তিতে আমাদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে দিতে পারি না। আমাদের জাতি বা বর্ণ নির্ধারণ করতে দিতে পারি না, যা প্রায়শই অনুমান করে চাপিয়ে দেয়া হয়। এবং আমাদের জিনগত তথ্যকে যদি আমাদের শনাক্ত করতে ব্যবহার করতে দিই তবে তা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। এমনকি আমাদের সংশোধন করতেও ব্যবহার করা হবে। আমাদের মানবতার মূল উপাদানটির ওপর প্রযুক্তি তার নিয়ন্ত্রণ চায়।

অবশ্যই, উপরের সব ইতোমধ্যে ঘটেছে।

নির্বাসন

১ আগস্ট, ২০১৩ এর পরে এমন একটি দিনও কাটেনি, যেখানে আমার মনে হয়নি যে 'নির্বাসন'কে আমার কিশোর জীবনে ইন্টারনেট থেকে অফলাইনে চলে যাওয়ার সাথে তুলনা করতাম। ওয়াইফাই নেই? নির্বাসন। সিগন্যাল রেঞ্জের বাইরে আছি? নির্বাসন। সেই সময়ের নিজেকে এত তরুণ বলে মনে হয়। তাকে খুব দূরের মনে হয়।

লোকেরা যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার এখনকার জীবন কেমন, তখন আমি উত্তর দিই এটি অনেকটা তাদের মতোই। কম্পিউটারের সামনে পড়া, লেখা, ইন্টারঅ্যাক্ট করতে অনেক সময় ব্যয় করি। মস্কোতে আমি ভাড়া করা দুটি বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। সংবাদমাধ্যমের কাছে এটি একটি 'অপ্রকাশিত স্থান'। আর ডিজিটাল জমানায় নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা শিক্ষার্থী, পণ্ডিত, আইনপ্রণেতা এবং প্রযুক্তিবিদদের কাছে।

কোনোদিন আমি ফ্রিডম অফ প্রেস ফাউন্ডেশনে আমার সহকর্মী বোর্ডের সদস্যদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক করি বা সাংবিধানিক ও মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপীয় সেন্টারে উলফগাং ক্যালেকের নেতৃত্বে আমার ইউরোপীয় আইনী দলের সাথে কথা বলি। কোনোদিন, বার্গার কিং কিনি। গেমস খেলি। আমার আমেরিকান আইনজীবী এসিএলইউ (ACLU)-এর উপদেষ্টা বেন উইজনারের সাথে আমার প্রতিদিন চেক-ইন হয়, যিনি বিশ্বের কাছে আমার গাইড হিসেবে আমার মতামতকে তুলে ধরছেন।

এটাই আমার জীবন। ২০১৪ সালের শীতকাল থেকে আমার জীবনে আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই শীতকালে লিন্ডসি আমার কাছে চলে আসে। হাওয়াই থেকে আসার পর আমি তাকে এই প্রথম দেখলাম। আমি খুব বেশি প্রত্যাশা করলাম না। কারণ আমি জানতাম আমি সুযোগের যোগ্য নই। আমি মুখে থাপ্পড়ের যোগ্য। কিন্তু দরজা খুলতেই সে আমার গালে হাত রাখল। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি তাকে ভালোবাসি।

'চুপ,' সে বলল। 'আমি জানি।'

আমরা নীরবতার সাথে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। প্রতিটি নিশ্বাসে যেন ছিল হারিয়ে যাওয়া সময় ফিরে পাবার আবেদন।

সেই মুহূর্ত থেকে, আমার পুরোটা দুনিয়া লিন্ডসির হয়ে গেল। আমি বাড়ির ভেতরে থাকতেই পছন্দ করতাম। রাশিয়ায় আসার আগেও এটিই আমার পছন্দ ছিল। তবে লিন্ডসি ছিল জেদি। সে বলল সে আগে কখনো রাশিয়া আসেনি। তাই এখন আমরা একসাথে পর্যটক হয়ে ঘুরে বেড়াই।

আমার রাশিয়ান আইনজীবী আনাতোলি কুচেরেনা। যিনি আমাকে সেদেশে আশ্রয় পেতে সহায়তা করেছিলেন। তিনিই একমাত্র আইনজীবী, যিনি একজন অনুবাদককে বিমানবন্দরে নিয়ে আসার দূরদর্শিতা করেছিলেন। তিনি একজন সংস্কৃতমনা মানুষ। তিনি আমার আর লিন্ডসির জন্য অপেরা টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি বলশয় থিয়েটারে দুটি বক্স আসন ব্যবস্থা করে দেন। লিন্ডসি এবং আমি সেখানে গেলাম। আমি ছিলাম বেশ সতর্ক। হলে প্রচুর লোক ছিল। লিন্ডসি আমার ক্রমবর্ধমান অস্বস্তি বুঝতে পারে। আলো কমে যাওয়ার সাথে সাথে পর্দা ওঠে যায়। লিন্ডসি আমার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, 'এই লোকদের কেউই এখানে তোমার জন্য আসেনি। তারা অপেরার জন্য এখানে এসেছে '

লিন্ডসি এবং আমি মস্কোর জাদুঘরে কিছু সময় কাটিয়েছি। ট্র্যাটিয়াকভ গ্যালারিতে রাশিয়ান অর্থোডক্স আইকন পেইন্টিংগুলির বিশ্বের অন্যতম বড় সংগ্রহ রয়েছে। চার্চের জন্য এসব চিত্রকর্ম যে শিল্পীরা তৈরি করেছিলেন তারা মূলত ঠিকাদার ছিলেন। তাই সাধারণত তাদের হাতের কাজগুলোতে তাদের নাম স্বাক্ষর করার অনুমতি দেওয়া হতো না বা পছন্দ করা হতো না। এই কাজগুলোকে উৎসাহিত করা এবং ব্যক্তিগত কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য খুব বেশি কিছু করা হয়নি।

আমি আইকনগুলোর একটির সামনে দাঁড়ালাম। হঠাৎ এক পর্যটক, একটি কিশোরী মেয়ে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এইবারই প্রথম আমি জনসম্মুখে ধরা পড়িনি। তবে লিন্ডসির উপস্থিতির কারণে এটি অবশ্যই শিরোনাম হওয়ার ভয় ছিল। জার্মান উচ্চারণের সাথে ইংরেজিতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করছিল সে আমাদের সাথে সেলফি তুলতে পারে কি না। আমার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা বুঝতে পারলাম না। এই জার্মান মেয়েটি নম্রভাবে বলার কারণে আর সম্ভবত লিন্ডসির হাসিখুশি, স্বাভাবিক থাকার শিক্ষার কারণেই কোনো দ্বিধা ছাড়াই আমি সম্মত হই। মেয়েটি আমাদের মাঝে ছবি তুলল তারপরে আমার সমর্থনে কয়েকটি মিষ্টি কথাবার্তা বলে চলে গেল।

একমুহূর্ত পরেই লিন্ডসিকে জাদুঘর থেকে টেনে আনলাম। আমি ভয় পাচ্ছিলাম মেয়েটি যদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট করে তবে আমাদের উপর অযাচিত মনোযোগ এসে যাবে। এটা ভেবে আমি এখন নিজেকে বোকা বোধ করি। আমি নার্ভাস হয়ে অনলাইনে চেক করলাম, তবে ছবিটি দেয়া হয়নি। সেই দিন নয় এবং পর দিনও না। আমি যতদূর বলতে পারি, এটি কখনোই শেয়ার করা হয়নি–কেবল ব্যক্তিগত মুহূর্তের স্মৃতি হিসেবে রাখা হয়েছিল।

আমি বাইরে গেলে, আমার চেহারা একটু পরিবর্তন করার চেষ্টা করি আমি দাড়ি ছেটে ফেলি বা বিভিন্ন রকম চশমা পরি। একটি টুপি এবং স্কার্ফ সবচেয়ে সুবিধাজনক ও নিরাপদ বলে মনে হয়। আমি আমার হাঁটার ছন্দ এবং

গতি পরিবর্তন করেছি। আমার মায়ের পরামর্শমতো রাস্তা পারাপারের সময় আমি ট্র্যাফিক থেকে দূরে সরে যাই, এ কারণেই আমি এখানে কোনো গাড়ির ড্যাশক্যামের মুখোমুখি হইনি। সিসিটিভি দিয়ে সজ্জিত বিল্ডিং পাস করার সময় মাথা নিচু করে রাখি।

বাস এবং মেট্রো নিয়ে আগে বেশ চিন্তিত থাকতাম। তবে আজকাল কারো আমার দিকে দ্বিতীয়বার নজর দেওয়ার সময় নেই। তাদের ফোনের দিকে তাকাতেই তারা খুব ব্যস্ত। ক্যাব নিলে বাস স্টপ বা মেট্রো স্টপ থেকে নিয়ে যাই। আবার ফেরার সময় যেখানে আমি থাকি সেখান থেকে কয়েক ব্লক দূরে রাখি।

আজ, এই বিশাল বিচিত্র শহরটির চারপাশে দীর্ঘ পথ ধরে চলছি। কিছু গোলাপ ফুল খোঁজার চেষ্টা করছি। লাল গোলাপ, সাদা গোলাপ, নীল গোলাপ, বেগুনি গোলাপ। যেকোনোটা পেলেই হবে। আমি এদের কারোরই রাশিয়ান নাম জানি না। আমি শুধু দেখি আর ইশারা করি।

লিন্ডসির রাশিয়ান আমার চেয়ে ভালো। সে খুব সহজেই হাসতে পারে। সে অনেক ধৈর্যশীল, উদার এবং সহানুভূতিশীল।

আজ রাতে, আমরা আমাদের বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করছি। লিন্ডসি তিন বছর আগে এখানে চলে আসে এবং আজ থেকে দুইবছর আগে, আমরা বিয়ে করেছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০১৩ সালের মে মাসে হংকংয়ের একটি হোটেল রুমে বসে ভাবছিলাম সাংবাদিকরা আমার সাথে দেখা করতে আসবে কী না। আমি এত একাকিত্ব কখনোই অনুভব করিনি। এর ছয় বছর পর নিজেকে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় পেলাম। নিজেকে আবিষ্কার করলাম অসাধারণ সব সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রযুক্তিবিদ, মানবাধিকার কর্মীদের ভিড়ে। যাদের কাছে আমি চিরঋণী।

বইয়ের উপসংহারে লেখকরা তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানায় যারা বই প্রকাশে সাহায্য করেছে। আমিও এই কাজটাই করব। তবে যারা আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছে, যারা রাতদিন স্বার্থহীনভাবে কাজ করেছে মুক্ত সমাজ ও প্রযুক্তিকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ হারাতে চাই না।

এই নয় মাসে জশুয়া কোহেন আমাকে রাইটিং স্কুলে নিয়ে গেছে আমার এলোমেলো স্মৃতিকে বইয়ে রূপান্তরিত করার জন্য। আশা করি সে এই বই পড়ে গর্ববোধ করবে।

ক্রিস প্যারিস-ল্যাম্ব নিজেকে একজন বুদ্ধিমান এবং ধৈর্যশীল এজেন্ট হিসেবে প্রমাণ করেছেন। স্যাম নিকোলসন, গিলিয়ান ব্লেক থেকে শুরু করে সারা বার্স্টেল, রিভা হোচারম্যান এবং গ্রিগোরি তোবভিসসহ মেট্রোপলিটনের পুরো দল চমৎকার ও সুস্পষ্ট সম্পাদনা করেছেন।

এ দলের সাফল্যের পেছনে আছে এর সদস্যদের প্রতিভা এবং সেই ব্যক্তির প্রতিভা যিনি সবাইকে একত্রিত করেছেন। তিনি আমার আইনজীবী বেন উইজনার। তাকে আমি আমার বন্ধু বলতে সম্মানিত বোধ করব।

একইভাবে আমি আমার আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাকে মুক্ত রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি ACLU পরিচালক অ্যান্টনি রোমেরোর প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি সংগঠনের জন্য যথেষ্ট রাজনৈতিক ঝুঁকির এই সময়ে আমার কেইসটি গ্রহণ করেছিলেন। বেনেট স্টেইন, নিকোলা মোড়, নোয়া ইয়াকোট এবং ড্যানিয়েল কান গিলমোরসহ অন্যান্য ACLU কর্মী যারা আমাকে বছরের পর বছর ধরে সাহায্য করেছে তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

আমি আমেরিকান প্রোগ্রাম ব্যুরোর বব ওয়াকার, জ্যান তাভিটিস এবং তাদের দলের কাজকে স্বীকৃতি জানাতে চাই। তারা আমার বার্তাকে বিশ্বজুড়ে নতুন শ্রোতাদের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে আমাকে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দিয়েছেন।

ট্র্যাভর টিম এবং ফ্রিডম অব দ্য প্রেস ফাউন্ডেশনে আমার সহকর্মীরা আমার ভালোবাসার জায়গা 'সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রকৌশল'-এ ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা এবং উপকরণ সরবরাহ করেছেন।

বিশেষ করে আমাদের CTO মাইকা লি, সাবেক এফপিএফ অপারেশন ম্যানেজার ইমানুয়েল মোরালেস এবং বর্তমান এফপিএফ বোর্ডের সদস্য ড্যানিয়েল এলসবার্গের প্রতি কৃতজ্ঞ। এলসবার্গ বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতা এবং আমাকে তার বন্ধুত্বের উষ্ণতা উপহার দিয়েছেন।

এই বই ফ্রি এবং ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে লেখা হয়েছিল। আমি কিউবেস প্রকল্প, টর প্রকল্প এবং ফ্রি সফটওয়্যার ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কৃতজ্ঞতা জানাই গ্লেন গ্রিনওয়াল্ড, লরা পোয়েত্রাস, ইউয়েন ম্যাকস্কিল এবং বার্ট জেলম্যানকে, যাদের পেশাদারিত্ব সততা দ্বারা পরিপূর্ণ।

আমি তাদের সম্পাদকদের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা ভয় অস্বীকার করে ঝুঁকি নিয়েছিল যা তাদের নীতিগুলোকে অর্থবহ করেছে। গভীরতম কৃতজ্ঞতা রইল সারাহ হ্যারিসনের জন্য। আমার অন্তরের ভালোবাসা রইল আমার বাবা লন, আমার মা ওয়েন্ডি এবং আমার মেধাবী বোন জেসিকার প্রতি।

এ বইটি আমি শেষ করব ঠিক যেভাবে বইটি শুরু করেছিলাম লিন্ডসির প্রতি উৎসর্গের সাথে। যার ভালোবাসা নির্বাসনে প্রাণসঞ্চার করেছে।

বকৌশল'-এ ফিরে
রছেন।
পিএফ অপারেশন
ক বোর্ডের সদস্য
আধ্যাত্মিকতা এবং

র লেখা হয়েছিল।
ন্ডেশনকে ধন্যবাদ
ায়েত্রাস, ইউয়েন
রারা পরিপূর্ণ।
ীকার করে ঝুঁকি
কৃতজ্ঞতা রইল
আমার বাবা লন,

রছিলাম লিন্ডসির
রছে।
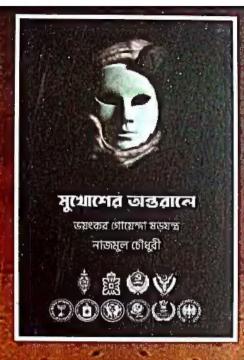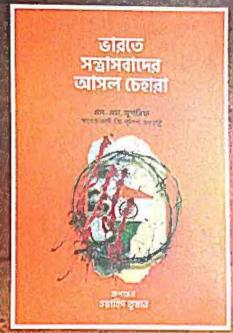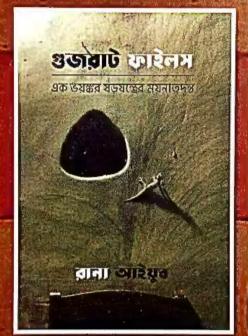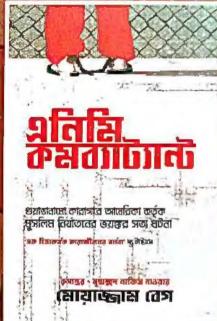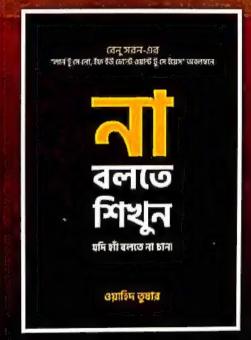
পার্মানেন্ট রেকর্ড। এ যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপনে চালিয়ে যাওয়া বৈশ্বিক নজরদারির এক উপাখ্যান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা- সিআইএ এবং এনএসএ'র সাবেক অফিসার এডওয়ার্ড স্নোডেন ২০১৩ সালে মার্কিন ইন্টারনেট নজরদারির উপর থেকে পর্দা উন্মোচন করেছিলেন। মার্কিন এই হুইসেলব্লোয়ারের কাছ থেকে বিশ্ব জানতে পারে PRISM, STELLARWIND, XKEY-SCORE সহ বেশ কিছু নজরদারি ব্যবস্থার কথা।

স্নোডেনের সেই তথ্যফাঁসের কারণেই মানুষ জানতে পারে তাদের প্রতিটি অনলাইন কমিউনিকেশনের রেকর্ড রাখা হচ্ছে। পার্মানেন্ট রেকর্ড। যখন ইচ্ছা তখন কাউকে বলির পাঠা বানানোর জন্য মার্কিন সরকার সেই রেকর্ড ব্যবহার করতে পারবে।

এডওয়ার্ড স্নোডেন, একজন কম্পিউটার জিনিয়াস, তিনি একজন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি আইসিতে মার্কিন সরকারের চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন আবার সরকারি কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করেছেন। বর্তমানে নির্বাসিত জীবনে গণমানুষের অনলাইন-অফলাইন জীবনসহ ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। মার্কিন সরকারের এক গোপন সত্য উন্মোচনকারী এই ব্যক্তিটি অনেকের কাছে নায়ক।

সাংবিধানিক ও ব্যক্তিগত নীতি-নৈতিকতা ও সত্যের সমর্থন করতে গিয়ে নিজের দেশের সরকারের কাছেই তিনি পেয়েছেন দেশদ্রোহী খেতাব।

তিনি নায়ক নাকি দেশদ্রোহী? এই প্রশ্নের উত্তর এডওয়ার্ড স্নোডেনের জীবনী 'পার্মানেন্ট রেকর্ড' বইটিতে খুঁজে পাবেন।

প্রজন্ম | মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

BDT ৳ 350
USD $ 21

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-94393-0-1